প্রকাশক
শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, বিবেকানন্দ সংঘ
বজবজ পোঃ, ২৪ পরগণা জেলা

গ্রন্থকার প্রণীত

১। চৈনিক ঋষি লাউৎজে (সচিত্র)

চীনের শ্রেষ্ঠ ঋষি লাউৎজের অলৌকিক জীবনী ও বাণী, চীনের সাধনা, চৈনিক ঋষি চুয়াংজুর জীবনী প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বিষয় বর্ণিত। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে ইহাই প্রথম পুস্তক।

২। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ৩

বিশটী যৌগিক ব্যায়ামেব সুন্দর চিত্র ও বিস্তৃত বিবরণ ও উপকারিতা, মন ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় সরল ভাষায় লিখিত। বইব সাহায্যেই সকলে ব্যায়ামগুলি অনায়াসে শিখিতে পারিবেন।

মুদ্রাকর—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেন
সবিতা প্রেস
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

ইংরাজ কবি লং ফেলো সত্যই বলিয়াছেন, মহাপুরুষগণের জীবনী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমরাও আমাদের জীবনকে সুমহৎ করিতে পারি।

বাল্যকাল হইতেই আমি দেশবিদেশের মহাপুরুষগণের জীবনী অধ্যয়নে ও অনুধ্যানে অনুরক্ত। ছাত্র জীবনে যখনই কোন মহাপুরুষের জীবনী পাইতাম তখনই তাহা সযত্নে পড়িতাম। সন্ন্যাসী হইবার পর উক্ত আগ্রহ চরিতার্থ করিবার আরও সুযোগ পাইলাম। ঐ সকল জীবনী উত্তমরূপে পাঠান্তর লিখিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিতাম। এই ভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই সংগৃহীত হইয়া বর্তমান পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইল। কোন্ পত্রিকায় কোন্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত। কয়েকটীমাত্র প্রবন্ধ ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। জীবনীগুলির মধ্যে কোন ক্রম বা পারম্পর্য্য রক্ষার প্রয়োজন বোধ করি নাই। ইহার দ্বারা পাঠকপাঠিকাগণের এই সুবিধা হইল যে, তাঁহারা ইচ্ছামত যে কোন জীবনী স্বতন্ত্রভাবে পড়িতে পারিবেন। অনেকগুলি জীবনী দুষ্প্রাপ্য এবং বাংলায় প্রথম প্রকাশিত। মহামানবগণের জীবনীর সহিত তাঁহাদের বাণী এমন অচ্ছেদ্য ভাবে সংবদ্ধ যে, জীবনী ও বাণী উভয়ই সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ছাব্বিশটী জীবনী প্রথম ভাগে প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। প্রথম ভাগ পাঠকপাঠিকাগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলে দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বাংলার তরুণতরুণীগণ দেশবিদেশের মহামানবগণের জীবনী যতই শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে পাঠ করিবেন ততই তাহাদের জীবন সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল হইবে। মহাপুরুষগণের জীবনী অনুধ্যান ও অনুসরণ ব্যতীত জীবনকে উচ্চতর ও মহত্তর করিবার উপায়ান্তর নাই।

কলিকাতার বিখ্যাত কাগজব্যবসায়ী মেসার্স পি. সি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড সন্সের শ্রীগোপালচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বাঁধা দামে এই পুস্তকের জন্য কাগজ সরবরাহ করিয়াছেন। শ্রীনীলরতন ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণ বন্ধুগণ এই পুস্তক প্রকাশের কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের আন্তরিক সহযোগ ব্যতীত এই দুর্দিনে আমার পক্ষে পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইত না। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী — জগদীশ্বরানন্দ
ভাদ্র, ১৩৫৫ — বেলুড় মঠ

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

দেশবিদেশের মহামানব

এক

আখনাটন*

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরে রাজর্ষি আখনাটনের আবির্ভাব হয়। ঐতিহাসিক যুগে তিনিই সর্বপ্রথম একটা ধর্মমত প্রচারে প্রয়াসী হন। সেইজন্য ব্রেষ্টেড সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[১] তাঁহাকে প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক মিশরের তমসাবৃত আকাশে তিনি ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া অনতিদীর্ঘকাল পরে অদৃশ্য হন। প্রায় তিন হাজার বৎসর জগৎ মিশরীয় রাজর্ষির কথা বিস্মৃত হয়। হঠাৎ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহাকে আবিষ্কার করেন। মিঃ বাইকি তাঁহার পুস্তকে[২] বলেন, "প্রাচ্যের প্রাচীন রাজগণের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত লিখিত হইয়াছে, এক আখনাটনের সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক গত চল্লিশ বৎসরে লিখিত হইয়াছে। এই মহামানবের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যদিও ইহা অভ্রান্ত প্রমাণ নহে, তথাপি ইহার দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তি।" প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে আখনাটনের মামীকৃত দেহ, পত্রাবলী, প্রতিকৃতি ও প্রস্তর-মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। স্বীয় রাজপ্রাসাদে যে মেজেতে তিনি পায়চারি করিতেন উহার প্রস্তরখণ্ডগুলি পর্যন্ত অদ্যাপি বর্তমান।

* উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৫২।

১। Religion and Thought in Ancient Egypt (p 339) by Breasted রাজর্ষির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য চার্লস ফ্রান্সিস্ পটার কৃত The Story of Religion গ্রন্থে আখনাটন শীর্ষক অধ্যায় এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্য সাবিত্রী দেবী রচিত Joy of the Sun পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২। The Amarna Age by Baikie (p. 234)

মিশরের রাজধানী কাইরো শহরের দুই শতাধিক মাইল দক্ষিণে নাইল নদীর তীরে যে প্রাচীন ধ্বংসস্তুপরাশি আছে, তথায় এক কৃষক নারী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাটী খুঁড়িতেছিল। পুরাণ কাঁচা ইট পচিয়া যে সার উৎপন্ন হয়, তাহা মিশরীয় কৃষকের শস্যোৎপাদনের জন্য বিশেষ আবশ্যক। এই সার খুঁড়িয়া বাহির করাই ছিল উক্ত নারীর উদ্দেশ্য। কিন্তু সে খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভূমিগর্ভে একটী গৃহে কয়েক শত কাঁচা ইট পাইল। ইটগুলির উপর কি ছাপ মারা ছিল। অল্প মূল্যে সে এইগুলি প্রতিবেশীর নিকট বিক্রয় করে। প্রতিবেশী ব্যবসায়ীকে দেখাইলে সে উহাদের নমুনা ফ্রান্সে পাঠায়। ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষান্তে জানিলেন—মিশরীয় দুই রাজা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রবিষয়ক যে পত্রব্যবহার হইয়াছিল এই ইষ্টকফলকগুলি তাহার রেকর্ড (ট্যাবলেট)। এই রাজা দুইজনের নাম আখনাটন এবং তাঁহার পিতা তৃতীয় আমেনহোটেপ। এইগুলির মধ্যে মাত্র ৩৫০ টী ট্যাবলেট রক্ষিত হইয়াছে—বাকীগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সিরিয়া, সাইপ্রাশ, ব্যাবলন, হিটাইট, মিটানি রাজাদের সহিত মিশরীয় রাজদ্বয়ের পত্রব্যবহার এই ট্যাবলেটসমূহে ছাপা আছে। ইষ্টকগুলি টেলেল-অমর্না (Tellel Amarna) নামক জেলায় পাওয়া যায় বলিয়া এইগুলি টেলেল অমর্না পত্রাবলী নামে বিখ্যাত। পত্রগুলি ব্যাবিলোনিয়ান ভাষায় লিখিত। ইহা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় রাজ্যসমূহে ব্যাবিলোনীয় ভাষা ছিল রাষ্ট্রভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যুগকে ঐতিহাসিকগণ অমর্না যুগ বলেন।

১৯০৩ খ্রীঃ আখনাটনের পিতামহ ৪র্থ থুটমোসের (Thutmose) সমাধি থীবিসের (Thebes) এবং দুই বৎসর পরে ইউয়া (Yuaa) এবং তুয়াউ (Tuau) নামক তাঁহার মাতার মাতা-পিতার সমাধিদ্বয় আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ আখনাটনের মাতা রাণী তিয় (Tiy) এর সমাধিও পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আখনাটনের মামী (সংরক্ষিত মৃতদেহ) ছিল। ১৯২২ খ্রীঃ আখনাটনের জামাতা টুটানখামেন (Tutan khamen) এর সমাধি আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে মিশরের প্রসিদ্ধ অষ্টাদশ রাজবংশের অনেক রেকর্ড ছিল। ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নার্থীর নিকট উক্ত আবিষ্কার বিশেষ মূল্যবান। আখনাটন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক

উপন্যাস রচিত হইয়াছে। ঈশা, মুসা, ও মহম্মদপ্রমুখ যে সকল ধর্মগুরু পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের আকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আখনাটন প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবির্ভূত হইলেও তাঁহার আকৃতি বিষয়ে স্পষ্টভাবে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহার বৃহৎ মস্তক, দীর্ঘ গলা, লম্বা উদর, মোটা জানু প্রভৃতি হইতে বোঝা যায়, ফারাওদিগের (Pharaoh) মধ্যে তাঁহার চেহারা অদ্ভুত প্রকারের ছিল। শিল্পিগণকে তিনি বলিতেন, 'আমি দেখতে যেমন, ঠিক তেমনি ভাবে আমার চেহারা অঙ্কিত বা খোদিত কর।' সেই জন্যই বোধ হয় আখনাটনের এত মূর্তি, চিত্র ও বাষ্ট তৈয়ার হইয়াছিল। রাণী নেফারতিতি (Nefertiti) এবং রাজকুমারীগণের প্রাপ্ত চিত্রাদি অপেক্ষাকৃত সুন্দর। নেফারতিতি ছিলেন আখনাটনের সহোদরা ভগ্নী। মিশরের অষ্টাদশ রাজ-বংশে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে বিবাহ চলিত। আখনাটন রাজা হইলেও ধর্মজগতের আকাশে তাঁহাকে প্রথম জ্যোতিষ্ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন আখনাটন আবির্ভূত হন, তখন মিশর সামরিক শক্তিতে জাতিগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাঁহার জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে পিরামিডসকল নির্মিত হয়। আবার তাঁহার জন্মের দুই শত বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ রাজবংশের উদ্ভব হয়। এই রাজবংশের আবির্ভাবের সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দী মিশর জ্ঞানগরিমায় জগতের অধিনায়ক ছিল। মিশরের এই গৌরবময় যুগেই আখনাটন জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভায় জাতীয় গৌরব সমৃদ্ধ করেন।

অষ্টাদশ রাজবংশের যখন উদ্ভব হয়, তখন রাজা আহমোস (Ahmose) হাইক্সস্ (Hyksos) অর্থাৎ মেষপালক রাজাগণকে বিতাড়িত করিয়া প্যালেষ্টাইন ও ফিনিসিয়া অধিকার করেন। থুতমোসিস (Thutmosis) প্রমুখ অন্যান্য মিশরীয় রাজারাও যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। থুতমোসিস্ মিশরের সাম্রাজ্য-স্থাপকরূপে কথিত। এই সকল যুদ্ধে বহু দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া মিশর সমৃদ্ধ হয়। তন্মধ্যে মেগিড্ডো (Megiddo) যুদ্ধের কথা বাইবেলে আছে। রাজা তৃতীয় আমেনহোটেপের সময় মিশরের সম্পদ অতুলনীয় ছিল। তখন

রাজপরিবার অত্যন্ত বিলাসে থাকিতেন। আমেনহোটেপকে সেইজন্য লোকে বিলাসী সম্রাট বলিত এবং থীবিসে তাঁহার দরবার ঐশ্বর্যে ও গৌরবে সলোমনের রাজধানীকেও পরাস্ত করিয়াছিল। মিশর তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রাজ্য, এবং ইহার রাজধানী থীবিস নগরে বিভিন্ন দেশের রাজদূত, বণিক ও শিল্পিগণ বাস করিতেন। আর্থার ওয়াইগাল তাঁহার গ্রন্থে[১] লিখিয়াছেন; "প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া তখন মিশরের করদ রাজ্য ছিল। সমুদ্রতীরবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সুবক ফারাও আমেনহোটেপকে উপহার প্রেরণ করিত। সাইপ্রাস, ক্রীট ও গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ মিশরীয় ভাবাপন্ন হয়। সোমালিল্যাণ্ড পর্যন্ত লোহিত সাগরের সমগ্র উপকূল এবং সিনাই দেশ ফারাওর রাজ্যভুক্ত ছিল। সুদানের নিগ্রোজাত মিশরে দাসরূপে ব্যবহৃত হইত। মিশরের রাজধানীতে যে প্রাসাদরাজি শোভা পাইত এবং যে ভোগবিলাস ছিল তাহা অন্য দেশে, এমন কি ব্যাবিলনেও, অজ্ঞাত ছিল। মিশরের সম্পদ এত অপরিমিত ছিল যে, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণের টেবিলে এবং ধর্ম্মমন্দিরসমূহে বহুপ্রকার মূল্যবান অসংখ্য স্বর্ণপাত্র দৃষ্ট হইত। থীবিসের মহিমা, আনন্দোৎসব, জলক্রীড়া, মৃগয়া ও রাজভোজ প্রভৃতির বর্ণনা পড়িলে আরব্যোপন্যাসের গল্পের কথা মনে হয়।"

যখন তৃতীয় আমেনহোটেপ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষের বালক ছিলেন তখন তিনি তদপেক্ষা অল্পবয়স্কা বালিকা টি'র পাণিগ্রহণ করেন। টিয়'র পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত; তবে তিনি সমধিক বিচক্ষণ ও চরিত্রবতী ছিলেন। বিবাহের দশ বৎসর পরে রাজা ও রাণীর জন্য যে সুন্দর সৌধ থীবিসের নিকটবর্তী নাইল নদীতীরে নির্মিত হয়, উহার মেজে, ও দেওয়ালগাত্রে বন্য পশু ও পক্ষী এবং পালিত পায়রা ও মৎস্য প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত ছিল। উক্ত রাজপ্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার চিত্রাবলী এখনও দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করে। পর বৎসর রাজা রাণীকে একটী কৃত্রিম হ্রদ উপহার দেন। ইহার স্মারকলিপি হইতে জানা যায়, রাজদম্পতী যে নৌকায় এই হ্রদে বিহার করিতেন তাহার নাম

১। Akhnaton, Pharaoh of Egypt by Arthur Weigall নামক পুস্তকের ২৯-৩০ পৃষ্ঠা দেখুন।

তেহেন আতেন (Tehen-Aten)। তেহেন আতেন শব্দের অর্থ উজ্জ্বল সূর্য্য-মণ্ডল। রাজা সূর্যোপাসক ছিলেন। এক মাইল দীর্ঘ এই হ্রদটী এক পক্ষের মধ্যেই খোদিত হয় এবং উহার মৃত্তিকারাশি দূরে ফেলিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিণত করা হয়। পাহাড়গুলি ফলফুলের বাগানে আবৃত করা হইলে এইগুলি ব্যাবিলনের দোদুল্যমান বাগানের ন্যায় রমণীয় হইয়াছিল। রাণী তিয়'র গর্ভে রাজার চারিটী কুমারী ও একটী কুমার জন্মে। পুত্রটী খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রাখা হয় আমেনহোটেপ। পুত্র চতুর্থ আমেনহোটেপরূপে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হইবার কয়েক বৎসর পরে তিনি নিজের নাম রাখিলেন আখনাটেন। পুত্রলাভের কিছুকাল পরে রাজা অসুস্থ হন এবং পুত্র যখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করেন তখন মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পরে আখনাটন মিশরের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজা আমেন-হোটেপের মৃত্যুতে মিট্টানি রাজা তুষরাট্টু আখনাটনকে যে পত্র দেন তাহা হইতে জানা যায়, তুষরাট্টু রাজার মৃত্যুশোকে অভিভূত হইয়া এক রাত্রি উপবাস ও ক্রন্দন করিয়া কাটান। তুষরাট্টের পত্রে লেখা আছে—মিশরে স্বর্ণ মৃত্তিকাতুল্য সুলভ।

প্রথমে আখনাটন বিধবা বিমাতা টাডুখিপাকে (Tadukhipa) বিবাহ করেন। এই প্রকার অদ্ভুত প্রথার অভাব প্রাচীন মিশরে ছিল না। পরে তিনি স্বীয় ভগ্নী নেফারতিতির সহিত পরিণীত হন। বিধবা বিমাতার পাণিগ্রহণ ইহুদী ও অন্যান্য প্রাচীন জাতির অন্যতম প্রথা। যে সল (Saul) খ্রীষ্টান জগতে পল নামে প্রসিদ্ধ, সেই সলের প্রভু কাপ্তেন আবনার সলের মৃত্যুর পরে তাঁহার উপপত্নীকে গ্রহণ করেন। বাইবেলে ডেভিড্ সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাতে এই প্রথার স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজা ডেভিডের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার সিংহাসন লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। আবসালম (Absalom) সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের সমক্ষে পিতার দশটী উপপত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। আবসালোম আহিথোফেল নামক রাজপরামর্শ দাতার পরামর্শেই উক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন। আহিথোফেলের পরামর্শ তখন ইসরেল দেশে দেবাদেশরূপে গৃহীত হইত। কিন্তু পিতা

ডেভিডের মৃত্যুর পূর্বেই আবসালোমের মৃত্যু হওয়ায় রাজা দ্বিতীয় পুত্র সলোমনকে ভাবী রাজারূপে মনোনীত করেন। ইহা কেবলমাত্র ইহুদী প্রথা নহে। গ্রীস, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও তখন এই প্রথা নীতিবিরুদ্ধ ছিল না। ফ্রেজার তাঁহার গ্রন্থে[১] এই প্রথার বহু উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। থীবিসের রাজা লাইয়াসকে হত্যা করিয়া পুত্র ইডিপাস বিমাতাকে বিবাহ করেন। সুতরাং আখনাটন কোন অনৈতিক আচরণ করেন নাই, প্রচলিত প্রথারই অনুগমন করিয়াছিলেন মাত্র।

আখনাটন রাজকার্যে তত মনযোগী ছিলেন না। প্রাচীন কুপ্রথা অবসানকল্পে তিনি নব ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি স্বীয় ভগ্নী নেফার্তিতিকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে রথে চড়িয়া রাজপথে বিচরণ করিতেন। নেফার্তিতি খুব সুন্দরী ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন। বার্লিনে রক্ষিত তাহার সুচিত্রিত মূর্তি দেখিলে প্রাচীন মিশরের নারীমূর্তির বেশ ধারণা করা যায়। আখনাটনের আমলে মিশরে নব জাগরণ আসে। আতেন (Aten) ধর্মের প্রবর্তকরূপেই আখনাটন অমর। তখন মিশরের ধর্ম অত্যন্ত জটিল ছিল। ধর্মমত নানা প্রকার কুসংস্কারে বিজড়িত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছিল। আমেন (Amen) ছিলেন তদানীন্তন মিশরের প্রধান দেবতা। আমেনের পুরোহিতগণই ছিল মিশরের ধর্মধ্বজী। আমেনধর্ম ছিল রাজধর্ম। মিশরে তখন বহুদেবতার পূজা হইত এবং প্রত্যেক দেবতার এক একটী বিশেষ উপাসনা-মন্দির ছিল। ইহা সত্ত্বেও দেশের সর্ব্বত্র রা (Ra) নামক সূর্যদেবতার পূজা হইত। ভূমধ্যসাগর ও মেসোপো-টেমিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে তখন রা-দেবতা পূজা পাইতেন। সম্রাট তৃতীয় থুত্মোসের সময় রা-দেবের উপাসনা সমধিকভাবে মিশরে প্রচারিত হয়। আমেন দেবতার পুরোহিতগণ দেশে ধর্মভাব সংরক্ষণের জন্য রা-দেবকে গ্রহণপূর্ব্বক আমেন-রা নামক নূতন দেবতার সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই দেবতা জনপ্রিয় হইলেন না। তখন রাজা আখনাটন আতেন দেবতার উপাসনা প্রবর্তন করেন।

১। Golden Bough by Frazer

আটেন শব্দের অর্থ সূর্যমণ্ডল। থীবিস মহানগরীতে আতেনদেবের বিশাল মন্দির ছিল। আতেনদেবের স্থূল মূর্তি নাই ; তিনি রশ্মিময়, তেজোময়। তাঁহার স্থূল মূর্তি প্রস্তুত করা রাজার নিষেধ ছিল। সূর্যের মূর্তি উপাসনা করিতে হইবে না.; সূর্যের মধ্যে যে শক্তি বা তেজ জগতে পতিত হইয়া সকল প্রাণীকে সঞ্জীবিত করে তাহারই ধারণা ও ধ্যান করিতে হইবে। ইহাই আখনাটনের উপদেশ।

প্রাচীন মিশরে জীবন-প্রতীককে আংখ (Ankh) বলিত। ইংরাজি টি অক্ষরের উপর ডিম্বাকৃতি চিহ্ন দিলে যাহা হয়, আংখ তদ্রূপ। তখন মন্দির প্রাসাদাদির গাত্রে যে সকল চিত্র অংকিত হইত তাহাতে আতেন বা সূর্যমণ্ডল আঁকা থাকিত। সূর্যমণ্ডল হইতে রশ্মিরাশি নিসৃত হইয়া পৃথিবীর সকল ব্যক্তি ও বস্তুর অঙ্গে নিপতিত হইতেছে। প্রত্যেক রশ্মি সমাপ্ত হইত আংখ-শোভিত ক্ষুদ্র হস্তে। মিশর হইতে আংখ-প্রতীক নানা ধর্মে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টান ধর্মে যে 'হস্তধৃত ক্রশ' চিহ্ন দেখা যায়, তাহা আংখের নব সংস্করণ মাত্র। আতেন বা আংখ প্রতীকের সারতত্ত্ব এই যে, সূর্যতেজ হইতে সকল প্রকার জীবনী শক্তি আগত হয়। সম্রাটের সহায়তায় নবীন ধর্ম দ্রুত বেগে চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। আমেন দেবতার পুরোহিতগণ প্রাচীন ধর্ম সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণ করিলেন। আখনাটন আমেন নগরীতে আতেন দেবতার মন্দির নির্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি থীবিস নগরীর নূতন নামকরণ করিলেন 'আতেন জ্যোতি' বা 'সূর্যতেজ'। দেশে ধর্ম-বিপ্লব দেখা দিল। তাঁহার রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে তিনি পূর্ব্ব নাম ত্যাগ করিয়া নূতন নাম, আখনাটন গ্রহণ করেন। আখনাটন নামের অর্থ যাঁহার উপর আতেনদেব সন্তুষ্ট। আতেন দেবতা আমেনকে পরাভূত করিয়া দেশময় প্রচারিত হইলেন। যে বৎসর সম্রাট আখনাটন নাম গ্রহণ করেন, সেই বৎসর তিনি ঊনবিংশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। স্বপ্রবর্তিত আতেন ধর্মের বহুল প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্বত্র আমেনদেবের পূজা ও আমেনমন্দির বন্ধ করিয়া দিলেন। গোঁড়ামির আতিশয্যে তিনি আমেন নামটী পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন। যেখানে যেখানে আমেন নাম লিখিত বা খোদিত ছিল তাঁহার অলঙ্ঘ্য আদেশে সেই সকল নিশ্চিহ্ন করা হইল। স্বীয় পিতার নাম এবং অন্যান্য দেবতাকেও তিনি দেশ হইতে নির্বাসিত

করিলেন। থীবিস নগরবাসিগণ পুরোহিতগণের দ্বারা তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। আখনাটন তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিলেন, কিন্তু তাহাতে ধর্মবিদ্রোহের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি থীবিস হইতে রাজধানী অন্যত্র লইয়া গেলেন। তৎপরিবর্তে সিরিয়া, ইথিওপিয়া এবং নাইল নদীর তীরে বহুদূরে তিনটী ধর্মরাজধানী স্থাপিত হইল। সিরিয়াস্থ রাজধানীর কোন খবর জানা যায় নাই। ইথিওপিয়াস্থ রাজধানীর নাম ছিল, 'আতেন রত্ন' এবং তৃতীয় রাজধানীর নাম আতেন-জগৎ বা আখিতাতেন।

তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে আখনাটন থীবিস নগরী পরিত্যাগ করিয়া নব রাজধানীতে গমন করেন। সঙ্গে ছিল নেফারতিতি ও তাঁহার তিন কন্যা— মেরীতাতেন, মাকিতাতেন এবং আংখসেনতাতেন। অদ্যাপিও তেলেল আমর্না সহরের গৌরব বিদ্যমান। কিন্তু যখন উহা আখিতাতেন ছিল তখন নিশ্চয়ই কবি ও শিল্পিগণের চিত্তাকর্ষণ করিত। প্রাচীন ধর্মের বিরোধিতা হইতে মুক্ত হইয়া নবধর্ম সর্বত্র বিস্তৃত হইল। আখিতাতেন নগরে রাজারাণী বাস করিতে লাগিলেন। ইহাকে 'মিশরের স্বর্গ' বলা হইত। রোম, কাশী প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ধর্মনগরীর ন্যায় আখিতাতেন মিশরের শ্রেষ্ঠ দেবস্থান ছিল। ধর্মজ্যোতিতে আখনাটনের জীবন উজ্জ্বল হইয়াছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি অভিনব আদর্শ প্রচার করিলেন। সুদূর অতীতে জীবন ও ধর্মের এই অদ্ভুত সমন্বয় আখনাটন কিরূপে করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি রাজা হইয়াও নবধর্ম সংস্থাপক ঋষি। তাঁহার ধর্মশিক্ষা কি ছিল তাহাও আমরা জানিতে পারি। অন্যান্য ধর্মগুরুদিগের বাণী নকলকারী সম্পাদক বা ব্যাখ্যাকারের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু মিশরের এই রাজর্ষির মৌলিক বাণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুরাণ বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি দশম শতাব্দীর, নূতন বাইবেলের প্রাচীনতম নকল চতুর্থ শতাব্দীর, কিন্তু আখনাটনের বাণীর লিপি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর। আখনাটনের জীবনকালে তাঁহার সমসাময়িকগণের স্মৃতি-সৌধ গাত্রে তাঁহার বাণীর অবিকৃত লিপি পাওয়া গিয়াছে। আতেন ধর্ম খুব উদার ছিল। যে

কোন ধর্মের সহিত উহার মূলসূত্রগুলিকে তুলনা করিলে এই ধর্মের অভিনবত্ব বোঝা যায়। আতেনদেবের উপাসনার জন্য আখনাটন যে স্তবগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা লিপিতে রক্ষিত আছে। এই স্তবগুলিতে আতেন ধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। অধিকাংশ স্তবগুলিই ক্ষুদ্র। কিন্তু সম্রাটের প্রধান সহচর আয় (Ay)-এর স্মৃতিমন্দিরে একটী দীর্ঘ স্তব লিখিত হয়। এই স্তবটী ধর্ম-সাহিত্যের একটী রত্ন। অধ্যাপক ব্রেষ্টেড্ তাঁহার গ্রন্থে[১] উক্ত স্তবের একটী সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ দিয়াছেন। ইহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে সূর্যদেব, প্রাতঃকালে তোমার উদয় কি মনোহর! হে প্রাণময় আতেন, পূর্বদিগন্তে উদিত হইয়া যখন তুমি পৃথিবীকে তোমার আলোকে প্লাবিত কর, তখন তোমার তেজে সকল ভূত প্রাণবান হয়। হে জীবনদেবতা, তুমি এত দূরে, এত উর্দ্ধে থাকিলেও নিত্য আমরা তোমার পূত স্পর্শ পাই। তোমার পদচিহ্নই দিবস। আবার যখন তুমি সন্ধ্যায় অস্তগমন কর, জগৎ শ্মশানবৎ তমসাবৃত হয়, মানুষ নিদ্রিত হয়। তোমার তিরোভাবে মর্ত্যধাম মৃতলোকবৎ নীরব নিষ্কর্ম হয়। পুনরায় তোমার আবির্ভাবে জগৎ জাগ্রত ও কর্মরত হয়, অন্ধকার তিরোহিত হয়, মানবের অলস অঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, মিশরময় উৎসব আরম্ভ হয়, মিশরবাসিগণ করযোড়ে তোমার উপাসনা করে। তোমার উপস্থিতিতে গৃহপালিত ও বন্য পশুপক্ষিসমূহ যাতায়াত ও আহারান্বেষণ করে। নাইল নদীতে নৌকাদি জলযানের গমনাগমন হয়, সমুদ্রে মৎস্যগুলি জলোপরি লম্ফপ্রদানাদি দ্বারা তোমাকে প্রণাম নিবেদন করে। তোমার তেজে মাতৃগর্ভে শিশু সৃষ্ট হয়, প্রসূত শিশু ক্রন্দন ও স্তন্যপান করে, মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়, ডিম্বের মধ্যে পক্ষীশাবক জীবিত থাকে এবং ডিম্ব ভগ্ন হইলে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। হে আতেন, তোমার কর্মাবলী অসংখ্য। তুমিই একমাত্র দেবতা, তুমিই ধরা সৃষ্টি করিয়াছ। বিশ্বসৃজনের পূর্ব্বে তুমি একাকী অসীমশূন্যে বিদ্যমান ছিলে। তোমার আকর্ষণে নাইল নদী স্বর্গ হইতে মর্ত্যে সমাগত। হে বিশ্বনিয়ন্তা, হে অনন্তদেব, তোমার তেজে আমার উদ্যানবাটিতে ফুল ফোটে, ফল পাকে।

১। A History of Egypt By Prof. Breasted পুস্তকের ৩৭১-৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তুমি স্বর্গেরও স্রষ্টা এবং ষড় ঋতুর কর্তা। তুমি আমার হৃদয়-কন্দরে বিরাজিত। হে দেব, তুমি বিশ্বব্যাপী। তোমার সন্তান আখনাটন ব্যতিত অন্য কেহ তোমার স্বরূপ অবগত নহে। তুমিই আমাকে শক্তিমান ও জ্ঞানবান করিয়াছ। তোমার শক্তিতেই আমি শক্তিশালী এবং প্রাণিগণ জীবিত। আমিও নেফারতিতি উভয়েই তোমার দেহ হইতেই সমাগত হইয়াছি।"

রাজা ডেভিড রচিত ইহুদী সঙ্গীতের (Psalm) সহিত এই মিশরীয় স্তোত্রের নিকট সাদৃশ্য আছে। আখনাটনের এই সূর্যস্তব ধর্মসাহিত্যের এক আদিম রচনা।

রাজর্ষি আখনাটন তাঁহার জীবনের শেষ একাদশ বৎসর ধর্মনগরী আখিতাতেনে বাস করিয়াছিলেন। এই রাজধানীর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইল না। রাজ্যের আয় হ্রাস হওয়ায় রাজর্ষি আর পূর্ব্ববৎ বিলাসে থাকিতে পারেন নাই। আতেন ধর্মে ভগবৎভক্তি ও মানবপ্রেম প্রচারিত হয়। আখনাটন তাহা সাধ্যমত পালন করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। তিনি সূর্য্যোপাসক। সূর্যকিরণ যে দেশে পতিত হয়, তাহা সুর্যক্ষেত্র, দেবস্থান। ইহার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন কিরূপে? সুতরাং পার্শ্ববর্তী করদ রাজ্যগুলি এই সুযোগে কর প্রদান প্রথমে হ্রাস ও পরে বন্ধ করিয়া শেষে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। আখনাটন শান্তিবাদী ও অহিংসনীতি পরায়ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যকাল অল্প হইল। সিমিয়ন ষ্ট্রান্স্কি তাঁহার গ্রন্থে[১] লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগের খ্রীষ্টান রাজা ও দেশশাসকগণের নীতি ও আচরণ কোন অংশে আখনাটন অপেক্ষা ভাল নহে। আখনাটনের উদাহরণ তাঁহাদের অনুকরণীয়।" আখনাটনের রাজনীতিতে সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ দেখিয়া মিশরবাসিগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিল; দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। আমেন পুরোহিতগণ সুযোগ বুঝিয়া ষড়যন্ত্র করিল। রাজর্ষি এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পথ হারাইলেন। তিনি ত্রিশ বা একত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

১। King Akhnaton by Simeon Strunsky গ্রন্থ দেখুন।

শেষ বৎসর তিনি তাঁহার জুবিলি উৎসব করিলেন। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না, সাতটী কন্যা ছিল। প্রথম কন্যা মেরীতাতেন এবং তৃতীয় কন্যা আংখসেনতাতেন যথাক্রমে স্মেংকার (Smenkhkar) এবং তুতানখামেনের সহিত পরিণীতা হন। জামাতা স্মেঙ্কার যুবরাজরূপে মনোনীত হইলেন। মহারাজ আখনাটনের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার প্রিয় রাজধানীর পশ্চাদ্বর্তী পাহাড়ে মহাসমারোহে কবর দেওয়া হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকাল মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হইল। তাঁহার পরে রাজজামাতা তুতানখামেন সম্রাট হন। তিনি আতেনদেবকে বিসর্জ্জন দিয়া আমেনদেবের পূজা প্রচার-পূর্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন। সম্রাট তুতানখামেন প্রায় নয় বৎসর আমেন পূজা প্রচারপূর্বক দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। সম্রাট তুতানখামেন প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার দ্বারা থীবিস নগরীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপিত হইল। তুতানখামেনের কবরস্থান ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আতেনধর্ম্মের উন্নতি ও পতন ধর্মেতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। প্রচলিত বহুদেববাদের পরিবর্তে সমগ্র মিশরকে একদেববাদে এক দশকের মধ্যে দীক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এই ক্ষিপ্রকারিতার জন্য আখনাটন নিরাশ হইলেন। প্রাচীন মিশরের ধর্মে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন তাহাদের অনেকে পশুমস্তকবিশিষ্ট। গজেন্দ্রমস্তক গণেশাদি দেবতা হইতে প্রতীত হয়, প্রাচীন ভারতেও এইরূপ দেবতা ছিল।

বহুদেববাদের স্থানে একদেববাদ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষাসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। আখনাটন প্রবর্তিত আতেনধর্ম দার্শনিক তত্ত্বোপরি স্থাপিত এবং আতেনদেব নিরাকার ভাবময় দেবতা। এই ধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিশরবাসিগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। আতেন ধর্ম প্রধানতঃ রাজপরিবার এবং রাজকর্মচারিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিলেই হয়। মিশরের শিক্ষা ও সভ্যতা তখন এইরূপ উদার ধর্মমত গ্রহণের উপযুক্ত হয় নাই। মিশরীয় সমাজ তখন উদার মতাবলম্বনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেইজন্য আতেন ধর্মের এত শীঘ্র পতন হইল। আতেন

ধর্মের পতনের পরে আমেন ধর্ম এত কুসংস্কারাবৃত হইল যে, মিশরীয় ধর্ম অদ্যাপিও সেই কুসংস্কারমুক্ত হইয়া আতেন ধর্মের উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। অবশ্য আতেন ধর্মের নৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না। এই-জন্যই বোধ হয়, ইহা দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু উহার উদার ভাব মিশরে আবার সম্বুদ্ধ হইবে। যাহা একবার হইয়াছে, তাহা আবার হইবেই, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। দিব্যজ্যোতি এক এক মহাপুরুষের মধ্য দিয়া এক এক দেশে পতিত হয়, কিন্তু মানুষের অজ্ঞানান্ধকার এত প্রগাঢ় যে, তাহাতে স্বর্গীয় আলোক অচিরে নির্বাপিত হয়। আর্থার ওয়াইগাল তাহার গ্রন্থে[১] লিখিয়াছেন, "আখনাটন মহামানব ছিলেন। স্মরণাতীত কালের এই রাজর্ষি যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা বর্তমান যুগেও অনুকরণ-যোগ্য। অন্যান্য ধর্মগুরুদের ন্যায় তিনিও ধর্মের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। যতদিন রাজহংস কালবর্ণ না হয়, যতদিন কাক শ্বেতবর্ণ না হয়, যতদিন হিমাচল চলমান না হয় এবং যতদিন সমুদ্র নদীতে লীন না হয় ততদিন আখনাটনের ধর্মমতের মূল্য থাকিবে।"

১৯০৭ খ্রীঃ মিশরীয় রাজাদের কবরস্থান হইতে আখনাটনের মমীকৃত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহের পদতলে স্বর্ণ পত্রে লিখিত একটী প্রার্থনা পাওয়া গিয়াছে। আতেনদেবের উদ্দেশ্যে এই স্তব রাজর্ষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ডাঃ অ্যালান গার্ডিনারের (Dr. Alan Gardiner) ইংরাজি অনুবাদ হইতে ইহার সারাংশ এখানে দেওয়া হইল—"হে আতেনদেব, তোমার মুখনিঃসৃত পবিত্র বায়ুই আমি নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করি। হে সূর্যদেব, নিত্য তোমার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি পুলকিত হই। তোমার মধুর স্বর শুনিতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তোমার আলোকে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ হউক। আমার দিকে তোমার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত কর। আমি উহা ধারণ করিয়া তোমার পদানুগ হই। হে দেব, অনন্তের সুরে আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাকে ধন্য কর।"

১। Akhnaton, Pharaoh of Egypt by Arthur Weigall পুস্তকের ২৫১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

দুই

সক্রেটিশ*

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সক্রেটিশ গ্রীস দেশের রাজধানী এথেন্‌স্ নগরে আবির্ভূত হন। তিনি ভারতে বুদ্ধদেবের ও চীনে কনফুশিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার সময়ে গ্রীসে এস্‌কাইলাশ, শফোকল্‌শ, পেরিকিল্‌স প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ জন্ম গ্রহণ করেন। ডেল্‌ফি মন্দির হইতে অ্যাপোলোর দৈববাণী হইয়াছিল যে, সক্রেটিশ গ্রীস দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তাঁহার জীবন ও বাণী অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, তিনি সর্বদেশের ও সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব ছিলেন।

সক্রেটিশের পিতা একজন ভাস্কর এবং মাতা একজন ধাত্রী ছিলেন। বাল্য-কালে তিনি সঙ্গীত, গণিত, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীক সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ তাঁহার কথোপ-কথনে হোমার প্রভৃতির উক্তি পাওয়া যায়। জীবনে তিনি তিন বার যোদ্ধারূপে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। একবার তিনি সিনেটস্থ পাঁচ শত সভ্যের অন্যতম সিনেটরও হইয়াছিলেন। প্লেটো ও জেনোফোন (Xenophon) তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। তবে উভয় লেখকের নিকট তাঁহার বিস্তৃত জীবনী কিছু পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণ বলেন—সক্রেটিশ ও বুদ্ধের কথোপকথন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, Socratic dialogues are Plato all over. অন্যান্য পণ্ডিতগণও বলেন যে, প্লেটোর কথোপকথনগুলিতে সক্রেটিশের চেয়ে তাঁহার নিজের মন অধিক পরিস্ফুট।

সক্রেটিশের দুইটী পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যান্থিপির নাম অনেকে জানেন। কারণ জ্যান্থিপি (Xanthippe) উগ্র প্রকৃতির নারী ছিলেন। একবার তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া মহাজ্ঞানী পতির মস্তকে এক গামলা ময়লা জল ঢালিয়া

---

* উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৪৩।

দেন। তাহাতে সক্রেটিশ জ্ঞানীসুলভ ধৈর্যের সহিত বলেন যে, এত মেঘ-গর্জনের পর এইরূপ বৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য এবং এথেন্সের যুবকগণকে বিপথে চালিত করিবার অপরাধে তিনি প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে রাজ-দ্বারে অভিযুক্ত এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার তিনটী সন্তান ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ কর্তৃক রচিত সক্রেটিশ নামক তিন খণ্ড সুবৃহৎ গ্রন্থে তাঁহার বিস্তৃত বিবরণী অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাইবেন। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসগুলিতে সক্রেটিশের যে চিত্র আমরা পাই তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ। ভারতীয় চিন্তার আলোকে প্লেটোর Apology, Phaedo প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার বিচার ও মৃত্যুর বিবরণ পাঠ করিলে তাঁহাকে একজন সত্যদ্রষ্টা মহামানবরূপে দেখা যায়। এডিনবার্গ ইউনি-ভার্সিটির ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল স্যার আলেকজাণ্ডার গ্রান্ট এল এল ডি সাহেব তাঁহার Xenophon নামক গ্রন্থে সক্রেটিশকে হিন্দু ঋষির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রতন টাটা বিভাগের (Ratan Tata Department of Social Science and Administration) প্রধান অধ্যাপক এডওয়ার্ড জে. আরউইক্ (Edward J Urwick) সাহেব তাঁহার Message of Plato নামক চিত্তাকর্ষক পুস্তকে বিশদ আলোচনান্তে দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চিন্তার সহিত সক্রেটিশের বাণীর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। আরউইক্ সাহেব নরওয়ে-প্রবাসী বাঙ্গালী বেদান্তী সন্ন্যাসী আনন্দাচার্য্যের (ওরফে অধ্যাপক এস. এন. বড়াল) নিকট এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে হিন্দুদর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সক্রেটিশ প্রকৃত বেদান্তী এবং আত্মার অজরত্বে ও অমরত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।

ডেল্‌ফি মন্দিরের "Know thyself" (আত্মানম্ বিদ্ধি বা নিজেকে জান)—এই দৈব বাণীই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি জীবন পণ করিয়াছিলেন। Apologyতে তিনি বলেন—"আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আত্মজ্ঞানই সত্যজ্ঞান, অন্য সর্বপ্রকার জ্ঞান মূল্য-হীন ও মিথ্যা। ঈশ্বরের পক্ষ হইতে আমি সকলকে তাহা জানিয়ে দিই যে, ঈশ্বরই

প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁকে জানাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। মানবের জ্ঞান কিছুই নহে। সমগ্র জীবন আমি এই কার্য্যে এত ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকি বলিয়া সামাজিক ও সাংসারিক জীবনে আদৌ যোগ দিতে পারি না। আমি ঈশ্বর লাভের জন্য ভীষণ দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছি।" ইউথিফ্রন (Euthyphron) হইতে জানা যায় কবি, রাজনৈতিক, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া তিনি দেখাইতেছেন যে, তাঁহাদের জ্ঞান অর্থহীন। জাগতিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ বলিয়া উহাকে আত্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। সক্রেটিশ গ্রীস দেশে এক অভিনব চিন্তার ধারা প্রবর্তিত করেন। তাই তাহাকে Thinking shop বলা হইত। অর্থাৎ তিনি ছিলেন এক "চলমান বিপণি," যেখানে বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা বিনামূল্যে বিক্রয় হয়। তাঁহাকে এথেন্সবাসিগণ 'চলন্ত প্রতিষ্ঠান' (moving institution) বলিতেন। কারণ, প্রকৃত পক্ষে তিনি একাকীই একটী প্রতিষ্ঠানের কাজ করিতেন এবং একাকীই এক শত ছিল। রাস্তায়, বাজারে, দোকানে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে গিয়া বিনা পারিশ্রমিকে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া তিনি এথেন্স নগরীর চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্তন করিয়া দেন।

সক্রেটিশ শঙ্করের ন্যায় আত্মজ্ঞানী ও ভগবৎ-দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি বলেন, 'ডেলফির অশরীরী বাণী আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরূপে প্রচার করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, আমি জানি যে, আমি কিছুই জানি না।' অপর লোকের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই যে, তিনি স্বীয় অজ্ঞানতা সম্যক্‌ভাবে অবগত ছিলেন, আর অন্যে তাহা জানে না। কনফুসিয়াস্‌ও এইভাবে বলিয়াছেন—যিনি নিজেকে অজ্ঞানী বলিয়া মনে করেন তিনিই মহাজ্ঞানী। পোপ বলিতেন—'মানুষই মানবজাতির অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ বস্তু'। জার্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টও বলিতেন যে, উর্দ্ধে নীলাকাশ আর নিম্নে মানব-মনকে জানা অতিশয় শক্ত। সক্রেটিশের জীবন এই মানবাত্মাকে জানিবার জন্যই উৎসর্গীকৃত ছিল। লোকে সেইজন্য তাঁহাকে 'midwife of men's minds' বলিতেন। তিনি নিজেকে সত্যসত্যই জানিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল এবং তিনি দৃষ্টিমাত্রেই অপরের মন বুঝিতে পারিতেন। দৈব ইঙ্গিত তাঁহার চিন্তা ও কার্য্যের নিয়ামক

ছিল। তিনি বলেন, এই দৈব ইঙ্গিত আকাশ-বাণীরূপে তাঁহার নিকট শিশুকাল হইতেই উপস্থিত হইত এবং মৃত্যুকাল অবধি এই দৈববাণী তিনি শ্রবণ করিতেন। সমগ্র জীবন তিনি দৈবাদেশেই পরিচালিত করিতেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য প্লেটো বলেন—সক্রেটিশ প্রায় প্রত্যহই বহুক্ষণ যাবৎ এক প্রকার উদাসীন, অন্যমনস্ক ও অন্তর্মুখী ভাবে নিমগ্ন থাকিতেন। তখন তাঁহার আদৌ বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। প্লেটো সক্রেটিশের অবস্থাকে সমাধি (trance) নামে অভিহিত করেন।

যে জুরি সক্রেটিশকে দণ্ডাদেশ দেন তাঁহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল ৫৫৭ জন। সকলেই ছিলেন এথেন্সনগরবাসী। ইঁহাদের মধ্যে ২৮১ জন তাঁহার বিরুদ্ধে এবং ২৭৬ জন তাঁহার স্বপক্ষে ভোট দেন। মৃত্যুর আদেশ শ্রবণে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তাই জেনোফোন বলেন, সক্রেটিশের মত অম্লান বদনে বোধ হয় জগতে আর কেহই মৃত্যু আলিঙ্গন করেন নাই। একমাত্র যিশুখ্রীষ্টের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। সক্রেটিশের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হইলে তাঁহার জনৈক প্রিয়শিষ্য এ্যাপোলোডোরাশ দুঃখিত হৃদয়ে তাহার গুরুকে বলিলেন– "সক্রেটিশ, সর্বাপেক্ষা আমার অধিক দুঃখের কারণ এই যে, আপনি বিনা দোষে মৃত্যু-বরণ করিতেছেন।" সক্রেটিশ তখন মৃত্যুঞ্জয়ী বেদান্তী আত্মজ্ঞানীর মত স্মিত বদনে শিষ্যের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন—"এ্যাপোলোডোরাশ, তুমি কি ইচ্ছা কর, আমি অপরাধী হইয়াই মৃত্যুলাভ করি? সেইরূপ মৃত্যু ত সাধারণ লোকের ভাগ্যেই উপস্থিত হয়।" সক্রেটিশ ইহা সত্যই বলিয়াছেন। কারণ, মহামানবগণ যুগে যুগে জগতের শিক্ষার জন্য, মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিবার জন্য নির্দোষ হইয়াও মৃত্যু আলিঙ্গন করেন। সক্রেটিশ হিন্দু ঋষির ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, আত্মা অজর ও অমর এবং মৃত্যু কেবলমাত্র দেহ নাশ করিতে পারে। যখন তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহাকে কারাগার হইতে পলায়নের পরামর্শ দিলেন, তিনি তাহাদের বলিলেন—"আমি তোমাদের কথামত পলাইতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাকে এমন একটী স্থানের নাম কর যথায় আমার জন্য বা অন্য কাহারো জন্য মৃত্যু নাই। যখন মৃত্যু কিছুকাল পূর্বে বা পরে আসিবেই তখন কাপুরুষের মত মৃত্যুভয়ে পলায়ন করিয়া কী লাভ?" মৃত্যুর পর তাঁহার শরীরের কিরূপ সংকার

করা হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—"তোমরা আমার মৃতদেহের সংকার ইচ্ছামত করিতে পার। কিন্তু কদাপি কল্পনাও করিও না যে, সক্রেটিশ এই দেহ"। সক্রেটিশ নিশ্চয়ই আত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন।

এ্যান্টিস্থিনিশের কথোপকথন সময়ে সক্রেটিশ একদা এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুর্বল হইলেও স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি পুরুষের বুদ্ধির চেয়ে কোন অংশে হীনতর নহে। ইহাতে এ্যান্টি-স্থিনিশ সক্রেটিশকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি ইহাই সত্য হয় তবে তিনি তাঁহার স্ত্রী জ্যান্থিপিকে শিক্ষার দ্বারা উন্নত না করিয়া এইরূপ মন্দস্বভাবা করিয়া রাখিয়াছেন কেন? সক্রেটিশ এই উক্তিতে ক্রুদ্ধ হইলেন না; কারণ তিনি জীবনে কখনও ক্রোধের বশবর্তী হন নাই। তিনি শান্ত অথচ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—"যাহারা অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে চায় তাহারা প্রথম দুষ্টাশ্ব মনোনীত করে। কারণ দুষ্টাশ্বে চড়িতে শিখিলে অন্য সব ঘোড়াতে অতি সহজে আরোহণ করা যায়। আমিও তদ্রূপ মানুষের সহিত মিশিতে ও আলাপ করিতে চাই। ঈশ্বরাদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইহা আমার পক্ষে আবশ্যক। সুতরাং দুষ্ট-স্বভাব ব্যক্তির সঙ্গ যদি আমি সহ্য করিতে পারি তাহা হইলে অন্য লোকের সহিত সহজে মিশিতে পারিব। সেইজন্য এইরূপ একটী দুষ্ট-স্বভাবা পত্নী আমি গ্রহণ করিয়াছি।"

মৃত্যু-সংবাদে সাধারণতঃ মানুষ মুহ্যমান হয়। জগতের ইতিহাসে এমন উদাহরণ অতি বিরল, যিনি মহাযাত্রা করিবার জন্য উৎফুল্ল হইয়াছেন। শুনা যায়, বিদ্রোহী বীর কানাইলাল দত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাইবার পর আনন্দে এত প্রফুল্ল হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর সময় দেখা গেল তিনি ওজনে কয়েক পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিলেন। সক্রেটিশের চিত্ত মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত অবধি অবিচলিত ছিল। হেমলকবিষ আনীত হইলে তিনি স্থিরভাবে স্নানাদি কার্য্য পূর্ববৎ সমাপন করিলেন। তিনি যেন কোন পরিচিত স্থানে, আনন্দ-লোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইহলোক ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এই চিন্তায় তিনি অভিভূত বা উদ্বিগ্ন হন নাই। বিষপাত্র তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইলে তাঁহাকে বলা হইল যে, তিনি বিষপান করিবার পর যতক্ষণ তাঁহার পদদ্বয় ভারিবোধ না করিতেছেন,

ততক্ষণ তিনি ধীরে ধীরে পায়চারি করিবেন এবং তারপর তিনি স্থিরভাবে শুইয়া পড়িবেন। সক্রেটিশ গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিলেন। প্রাকৃত লোকের মত তাঁহার মুখে আদৌ কালিমা দেখা দিল না। তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু আসিল না, সম্পূর্ণ শান্ত এবং প্রফুল্ল চিত্তে তিনি মহানিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিষপানান্তে বেড়াইবার সময়ও তাঁহার পদদ্বয়ে দুর্বলতাসূচক কম্পন দেখা দেয় নাই। বিষপানের পূর্বে তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ছিল। তাই তিনি তাঁহাকে কোন শিষ্যের সহিত গৃহে প্রেরণ করিলেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি যখন শায়িত, তখন তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে ক্রন্দন হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—"নীরবতার মধ্যে মানুষের মৃত্যু আলিঙ্গন করা উচিত। তোমরা বৃথা ক্রন্দন করিও না।" শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি সজ্ঞান ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিষ দিয়াছিল সে তাঁহার পা'দুটী টিপিতে আরম্ভ করিল। তিনি বলিলেন—হাঁটু অবধি অসাড় হইয়াছে; পরে বলিলেন—কোমর অবধি। তৎপর তিনি ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন যে, এই অসাড়তা হৃদয় অধিকার করিলেই তাঁহার আত্মা এই দেহ ত্যাগ করিবে। ক্রমে তাঁহার বাক্য বন্ধ, চক্ষু স্থির ও পলকহীন হইল। শেষে মহামানব মহাজ্ঞানী সক্রেটিশ মৃত্যু জয় করিয়া পরমপদে লীন হইলেন।

যখন সক্রেটিশের কোমর অবধি অসাড় হইয়া গেল তখন তিনি জীবনের শেষ বাক্য উচ্চারণ করেন। তিনি তৎশিষ্য ক্রীটোকে বলেন—'এ্যাস্‌কিলাপিয়াসকে একটী মুর্গীর দাম দেওয়া হয় নাই। উহা তাহাকে তুমি দিও।' 'তাহা নিশ্চয়ই দেওয়া হইবে। আর কোন প্রকার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার থাকিলে আদেশ করুন'—ক্রীটো বলিল। সক্রেটিশ এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না। প্লেটোর ন্যায় ক্রীটোও তাঁহার অতিশয় প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অসংখ্য শিষ্য ও বন্ধুর সম্মুখে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। হেমলক-বিষ পান করিবার পূর্বে ক্রীটো সক্রেটিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাঁহার বন্ধু ও শিষ্যগণ কীভাবে তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান করিতে পারে।' সক্রেটিশ বলিলেন—"আমি সর্বদা যাহা করিতে তোমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছি আজও তাহাই

বলিব। তোমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। তাহা হইলে আমার এবং আমাদের সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য তোমরা পালন করিবে। অন্য কিছু করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে না। আত্মজ্ঞান লাভের যে পথ আমি তোমাদের প্রদর্শন করিয়াছি, সেই পথে চলিতে যদি তোমরা যত্নবান হও, তবে কোন প্রতিজ্ঞাপালন না করিলেও আমাদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদিত হইবে, অন্য কোন প্রকারে নহে।" সক্রেটিসের উক্ত বাক্যে ভগবান বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের কথা মনে হয়। তথাগত যখন মহানির্বাণ লাভ করিতে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়তম সেবক-শিষ্য আনন্দ অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি সমবেত শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া আনন্দকে বলিলেন—'আত্মমুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হও। নিজেই নিজের উদ্ধারকর্তা ও পথপ্রদর্শক হও। আত্ম-মুক্তি লাভের জন্য জগতে অন্য কাহারো বা কিছুর উপর নির্ভর করিও না।' ইহাই বুদ্ধদেবের আনন্দপ্রমুখ শিষ্যের প্রতি এবং জগতের প্রতি শেষ বাণী।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত ধর্ম ও দর্শন আলোচনা করিয়াছিলেন, একথা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব তাহা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর মহাপুরুষের জীবনেও প্রমাণিত হয়। রোমের সম্রাট মার্কাশ অরেলিয়াস যে যুদ্ধে নিহত হন, সেই যুদ্ধে যাইবার পূর্বে তিনি স্বীয় রাজপ্রাসাদে রাজধানীস্থ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সহিত দীর্ঘ তিন দিবস দর্শনালোচনায় অতিবাহিত করেন। "Meditations of Marcus Aurelius" নামক পুস্তকে আমরা এই আলোচনার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। সক্রেটিসও অন্তিম সময়ে কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকিয়া শিষ্যগণের সহিত দর্শনের নানা জটিল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহাদের সান্ত্বনা দেন। 'ফিইডো' (Phaedo)তে এই কথোপকথনের সার মর্ম পাওয়া যায়। 'ফিইডো' হইতে জানা যায়, সক্রেটিস হিন্দুর ন্যায় জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। পুণ্য কর্ম দ্বারা মানুষের ঊর্দ্ধগতি হইলে সে যেমন দেবযোনি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পাপকর্ম দ্বারা তাহার অধোগতি হইলে সে পশুযোনি লাভ করে। তাঁহার মতে মৃত্যুর দ্বারা মানুষের নশ্বর শরীর মাত্রই ধ্বংস হয়, মৃত্যু অনন্ত অমর আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শুদ্ধ-

স্বভাব আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর অতীত। তিনি আদর্শ জ্ঞানী এবং দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলেন যে, সুখদুঃখের অতীত হওয়া দার্শনিকের লক্ষ্য, কারণ প্রত্যেক সুখ বা দুঃখ আত্মাকে এক একটী পেরেকের মত দেহে আবদ্ধ করে। আত্মা যখন স্বস্বরূপে অবস্থান করে, তখনই তাঁহার মতে প্রকৃত জ্ঞান হয়। বেদান্তের সহিত সক্রেটিশের বাণীর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য না বলিয়া উহাকে ঐক্য বলাই উচিত। কারণ, তাঁহার জীবনী ও বাণী পাঠে তাঁহাকে একজন বৈদান্তিক জ্ঞানী বলিয়াই মনে হয়। সক্রেটিশ তাঁহাব শিষ্যদের প্রায়ই বলিতেন, তাঁহার আত্মা, অন্য সকলের আত্মাব ন্যায়, বহুবাব শবীব ধাবণ কবিয়াছে। বাসনার প্রদীপ নির্বাপিত না হইলে সক্রেটিশের মতে আত্মাব দেহধারণ বন্ধ হয় না। সক্রেটিশ ও শঙ্করের জ্ঞানসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রায় একই প্রকাব। সক্রেটিশ ইহাকে Doctrine of Reminiscence or Recollection বলিয়াছেন। তাঁহাব মতে আত্মা সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং জ্ঞানলাভ অর্থে হৃদয়াস্থিত অনন্ত জ্ঞানের পুনঃস্মরণ মাত্র। অজ্ঞানের আববণ ভেদ করিলে অন্তর্নিহিত আত্মা আবিষ্কৃত হয়। জ্ঞানলাভের অর্থ আবিষ্কাব। সক্রেটিশ বলেন, বহু জীবনের সাধনায় আত্মাব এই অজ্ঞানপটল বিনষ্ট হয়।

অতি সংক্ষেপে প্রাচীন গ্রীসেব মহামানব সক্রেটিশেব বাণী ও জীবনী আলোচনা করা হইল। সক্রেটিশের দর্শন বেদান্তের আলোকে আলোচনা করিলে মনে হয়, তাঁহার বাণী বেদান্তেব প্রতিধ্বনি মাত্র। কেহ কেহ বলেন, গ্রীস transplanted India. অধ্যাপক আরউইক্ ও অন্যান্য মনীষীগণ এই মতের পক্ষপাতী। স্বামী পরমানন্দের "Plato and Vedic Idealism" পুস্তকে দেখা যায়, প্লেটোর অনেকগুলি উপাখ্যান ভাবতের উপাখ্যানের মত। সে যাহা হউক, বেদান্তের আলোকে পাশ্চাত্যের দর্শন বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ধর্ম ও দর্শনের জগতে নবালোক পতিত হইবে। বর্তমান যুগে দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন অধিকতর উপকারী ও আবশ্যক। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে বেদান্ত যেন একটা পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুম, অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের কোনটী অর্দ্ধ, কোনটী বা আংশিক বিকাশিত। অখণ্ড পরমার্থ সত্য যদি কাম্য হয়, তাহা হইলে বেদান্তের সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে সর্বধর্ম ও সর্ব দর্শনকে উপনীত হইতেই হইবে।

তিন

গৌড়পাদ *

শঙ্করাচার্যের পূর্বে যে সকল বেদান্তাচার্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, গৌড়পাদ তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। গৌড়পাদ শঙ্করের পরমগুরু; শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ, গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদ। মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর গৌড়পাদের যে কারিকা আছে, তাহা উপনিষদাবলীর পরেই আদি বেদান্তগ্রন্থ। মাণ্ডুক্য-কারিকাকাররূপেই গৌড়পাদ সুপরিচিত। তাঁহার দার্শনিক মতকে অজাতবাদ বলা হয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে শঙ্কর-বেদান্ত বা বিবর্তবাদের সহিত অজাতবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

গৌড়পাদের প্রকৃত নাম কী ছিল, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। সাধারণতঃ তিনি গৌড়পাদ নামেই পরিচিত। মাণ্ডুক্য-কারিকার চারিটী প্রকরণের অন্তে এই নামই দৃষ্ট হয়। সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র তাঁহার 'জগৎগুরু-রত্নমালাস্তবে' [১] এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তদ্রচিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্যে তাঁহাকে গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন। বিদ্যারণ্যকৃত 'পঞ্চদশী' (২-২৩) এবং সায়ণ-রচিত তৈত্তিরীয়-আরণ্যক-ভাষ্যে (৭-২) গৌড়াচার্য নাম পাওয়া যায়। সুরেশ্বরাচার্যের 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'তে তিনি শুধু গৌড়নামেই উল্লিখিত। ইহা হইতে মনে হয়, তাঁহার প্রকৃত নাম গৌড় এবং পাদ, পদ, চরণ বা আচার্য তাঁহার সম্মানসূচক উপাধি মাত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'শারীরক মীমাংসাভাষ্যবার্তিকে' গৌড়পাদকে কেবল গৌড় নামেই অভিহিত করিয়াছেন। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র চন্দ্রিকা-নামক টীকাকার জ্ঞানোত্তম উক্ত নাম সমর্থন করেন।

---

* উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫২

১। এই স্তবের উপর আত্মবোধেন্দ্র সরস্বতীর একটী টীকা আছে। সটীক স্তবটী কুম্ভকোনম্ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে বেদান্তপঞ্চপ্রকরণী গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাণ্ডুক্যকারিকার যে ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপক্রমণিকায় মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, আচার্য গৌড়পাদ বাঙ্গালী ছিলেন। এই শুভ সংবাদ বাঙ্গালীর নিকট অশেষ আনন্দদায়ক, সন্দেহ নাই। পূর্বে গৌড়পাদের মত বৈদান্তিক বাংলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তী কালে এই দেশে মধুসূদন সরস্বতীর মত বৈদান্তিকের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। বর্তমান মালদহের অদূরে অবস্থিত গৌড় ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। মৎস্যপুরাণ (১২-৩০), কূর্মপুরাণ (১-২০-৯) এবং লিঙ্গপুরাণ (১-১-৬৫) অনুসারে উত্তর বঙ্গ এবং তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলিই গৌড়দেশ। আধুনিক গবেষণা হইতেও ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে[১] ইহার অনুকূল বহু যুক্তি দিয়াছেন। গৌড়দেশীয়গণকে গৌড় বলার প্রথা অদ্যাপি বর্তমান। এখনও উত্তরাখণ্ডে কোন কোন বাঙ্গালী সাধুর নামের সঙ্গে গৌড়শব্দ সংযুক্ত দেখা যায়। পূর্বে বিদ্যাচর্চার জন্য গৌড়দেশের এত প্রখ্যাতি ছিল যে, উহার অধিবাসী বা উহা হইতে প্রত্যাগত বা এমন কি উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিকেও গৌড় বলা হইত। যোগবাশিষ্ঠসার বা লঘুযোগবাশিষ্ঠের রচয়িতা অভীনন্দ কাশ্মীরী হইলেও গৌড় নামে অভিহিত হইতেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্যের সহপাঠী এবং অদ্বৈতসিদ্ধির লঘুচন্দ্রিকা নামক টীকাকার ব্রহ্মানন্দ গৌড়দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই গৌড়দেশীয় না হইয়াও গৌড়াখ্যা প্রাপ্ত হন। গৌড়ের সহিত অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ থাকিলেও তখন উক্ত আখ্যা লাভ হইত। এইরূপ প্রথার উল্লেখ সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে। মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যে (১-৩-২৩) আছে—"মথুরায়াম্ অভিপ্রস্থিতো মাথুর ইতি ; মথুরায়াং বসন্ মথুরায়াঃ নির্গতশ্চ" অর্থাৎ মথুরা হইতে আগত, বা মথুরাপ্রবাসী বা মথুরাযাত্রীকেও মাথুর বলে। বালকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থে (৯-১২) গৌড়পাদ সম্বন্ধে যে

১। পুণা হইতে প্রকাশিত Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute (Vol, III, Part I, p 43) পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"গৌড়চরণাঃ কুরুক্ষেত্রদেশগত-হিরবাবতীনদীতীরভব-গৌড়জাতি-শ্রেষ্ঠাঃ দেশবিশেষ-ভবজাতিনাম্নৈব প্রসিদ্ধাঃ। দ্বাপরযুগমারভ্যৈব সমাধিনিষ্ঠত্বেন আধুনিকজনৈঃ অপরিজ্ঞাত-বিশেষ-অভিধানাঃ সামান্যনাম্নৈব লোকবিখ্যাতাঃ।" অর্থাৎ "কুরুক্ষেত্র দেশে হিররাবতী নামে এক নদী ছিল। এই নদীতীরে যে সকল গৌড়দেশীয় ব্যক্তি বাস করিতেন গৌড়পাদ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আচার্য দ্বাপরযুগ হইতে সমাধিনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আধুনিক ব্যক্তিগণ তাঁহার বিশেষ নাম জানেন না। সেইজন্য তিনি সাধারণ নামেই বিখ্যাত।" ওয়ালেশার (Wallesar) সাহেবের মতে গৌড়পাদ নামক কোন ব্যক্তি ছিলেন না; মাণ্ডুক্যকারিকা প্রাচীন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র মাত্র। পণ্ডিত বিধুশেখর উক্ত মত বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না।

গৌড়পাদের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে গবেষকগণের মতে বিশেষ মতানৈক্য আছে। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তও কিছুই পাওয়া যায় না। কাশী অচ্যুত প্রেস হইতে ব্রহ্মসূত্রের যে সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত একটী হিন্দী ভূমিকা আছে। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়পাদের সম্বন্ধে কিছু কথা আছে উক্ত ভূমিকাতে পণ্ডিত গোপীনাথ তাঁহাদের তালিকা দিয়াছেন। উক্ত বইগুলির নাম যথা—(১) মাধবাচার্যের শঙ্করদিগ্বিজয়, (২) আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়, (৩) রাজচূড়ামণিকৃত শঙ্করাভ্যুদয়, (৪) চিদ্বিলাসকৃত শঙ্করবিজয়, (৫) সদানন্দ-রচিত শঙ্করবিজয়, (৬) সর্বজ্ঞ সদাশিববোধ কৃত পুণ্যশ্লোকমঞ্জরী, (৭) আত্মবোধ প্রণীত পুণ্যশ্লোক-মঞ্জরী-পরিশিষ্ট, এবং (৮) সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রকৃত গুরুরত্নমালা ও তদুপরি আত্মবোধেন্দ্রকৃত সুষমা নামক টীকা। কথিত আছে, গৌড়পাদের সহিত তাঁহার সুযোগ্য প্রশিষ্য শঙ্করের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গুরুরত্নমালার দশম শ্লোকটী এই—"অভিযুঞ্জদ্-আর্য্যার্চা-পূজ্যপাদান্ অপলূন্যাদিনিষাকসিদ্ধনেতৃন্ অথ গৌড়পাদান্ ফণীশভাষ্য-প্রথমাচার্যকপণ্ডিতান্ প্রপদ্যে।" অর্থাৎ গৌড়পাদ অপলূন্য প্রভৃতি নিষাক সিদ্ধ সাধকগণের গুরু। তাঁহার শ্রীচরণ আর্য্যার্চ্য কর্তৃক

পূজিত ইত্যাদি। এই অংশের টীকায় আত্মবোধেন্দ্র হরিমিশ্রের 'গৌড়পাদোল্লাস' এবং রামভদ্র দীক্ষিতের 'পতঞ্জলিবিলাস' এই দুই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুই পুস্তকেও গৌড়পাদের কিঞ্চিৎ তথ্য আছে। আত্মবোধেন্দ্রের মতে গৌড়পাদ শুকদেবের শিষ্য এবং তিনি হিমালয়-শিখরে গুরুর আদেশে আত্মজ্ঞান-লাভার্থ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। হিমালয়ে গৌড়পাদের তপস্যা সম্বন্ধে মাণ্ডুক্য উপনিষদের নারায়ণকৃত টীকাতে আছে—"গৌড়পাদ দ্বাপর যুগের শেষে আবির্ভূত হন। তিনি শুকদেবের শিষ্য এবং শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু। তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদের চারিটী অংশের চারি প্রকরণে বিভক্ত কারিকাবলী রচনা করিয়াছেন। বদরিকা আশ্রমে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া নারায়ণদেব তাঁহাকে দর্শনদানান্তে বর প্রদান করেন। এই বরপ্রভাবে এক পর্বতগুহায় তিনি প্রবেশপূর্বক ধ্যানমগ্ন হন, যাহাতে কলিযুগে জাত মানবের সহিত তাঁহার আদৌ সাক্ষাৎ না হয়। এই অবস্থায় শঙ্কর তাঁহার সমীপে যাইয়া লোককল্যাণার্থ বাহিরে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গৌড়পাদ প্রশিষ্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তালমাটীতে বটপত্রে মাণ্ডুক্যকারিকাবলী লিখিয়া শঙ্করকে প্রদান করেন।"[১]

আত্মবোধেন্দ্র আরও লিখিয়াছেন—"গৌড়পাদের প্রভাবে আয়ার্চাপ্রমুখ অনেকের বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত বিনষ্ট হয়। তক্ষশীলাধীশ শাক্যপ্রভৃতি এবং অপলুস্থ-দামীশাদি অপবাস্তযোগিগণ আয়ার্চ্যের সেবা করিতেন। ওসমণ্ড্ ডি বঁভয়ার প্রিউল্ক্স্ কৃত "এপোলোনিয়াসের ভারত ভ্রমণ" গ্রন্থ[২] হইতে জানা যায়—উক্ত অপলুস্থ টায়ানার পাইথাগোরাসমতাবলম্বী দার্শনিক এপোলোনিয়াস ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। এপোলোনিয়াস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি ভারতে আগমনপূর্বক তক্ষশীলাধীশ প্রাবৃতির দরবারে অবস্থান করেন। দামীশ ছিলেন এপোলোনিয়াসের মিত্র ও সহযাত্রী। আয়ার্চ্য ছিলেন জনৈক

১। এই প্রকার অন্যান্য প্রবাদের জন্য ই হুলশ্চ (E. Hultzsch) কৃত Report of Sanskrit Manuscripts in South India দ্রষ্টব্য।

২। The Indian Travels of Apollonius of Tyana by Osmond de Beauvoir Priaulx নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গ্রীক রাজা। 'গুরুরত্নমালার' মতেও গৌড়পাদের সহিত কয়েকজন গ্রীকের যোগাযোগ ছিল।

ভাববিবেক (৫০০-৫৫০ খ্রীঃ), শান্তরক্ষিত (৭০৫-৭৬২ খ্রীঃ) এবং তৎশিষ্য কমলশীল এই বৌদ্ধ দার্শনিকত্রয় গৌড়পাদের কারিকার বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। মাধ্যমকহৃদয়-কারিকা এবং উহার টীকা তর্কজ্বালা ভাববিবেক কর্তৃক রচিত। তর্কজ্বালা টীকার অষ্টম অধ্যায়ের দশম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত চারিটী শ্লোক গৌড়পাদকারিকা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যমকালংকারকারিকা এবং উহার টীকার রচয়িতা ছিলেন শান্তরক্ষিত। শান্তরক্ষিতের কারিকার উপর কমলশীলের পঞ্জিকা আছে। শান্তরক্ষিত তাঁহার কারিকায় গৌড়পাদের যে দশটী কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন কমলশীল তাঁহার পঞ্জিকায় তাহা স্বীকার করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, ভাববিবেক, শান্তরক্ষিত এবং কমলশীল গৌড়পাদকারিকার সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং গৌড়পাদের আবির্ভাবকালকে ভাববিবেকের পূর্বে স্থির করিতে হয়। এই প্রমাণের দ্বারা পণ্ডিত বিধুশেখর ৫০০ খ্রীষ্টাব্দকে গৌড়পাদের আবির্ভাব কাল রূপে নির্দেশ করেন।

অন্যদিকে গৌড়পাদ নাগার্জুন (২০০ খ্রীঃ), তৎশিষ্য আচার্যদেব এবং মৈত্রেয়নাথ (৪০০ খ্রীঃ) প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়পাদের আবির্ভাব নির্দেশ করা অযৌক্তিক। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ' নামে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। যশোমিত্র ইহার উপর যে টীকা রচনা করিয়াছেন তাহার নাম অভিধর্মকোষব্যাখ্যা। যশোমিত্রের টীকা হইতে জানা যায়, অভিধর্মকোষের উপর গুণমতি ও বসুমিত্রের দুইটী টীকা ছিল। গুণমতির আবির্ভাব কাল ৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যশোমিত্র পঞ্চম শতাব্দীর লোক। গৌড়পাদের একটী কারিকা (৪-১৩) অভিধর্মকোষব্যাখ্যার একটী শ্লোকের উপর স্থাপিত বলিয়া পণ্ডিত বিধুশেখর অনুমান করেন গৌড়পাদ নিশ্চয়ই পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

আদিশেষকৃত "পরমার্থসার" নামে একটী বেদান্তগ্রন্থ আছে। পরমার্থসারের অন্য নাম 'আর্য্যপঞ্চাশীতি'। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আদিশেষ মহাভাষ্যকার

পাণিনি ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। এই গ্রন্থের অভিনবগুপ্তকৃত একটী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ আছে। পরমার্থসারের কয়েকটী শ্লোকের সহিত গৌড়পাদের কয়েকটী কারিকার সাদৃশ্য-দর্শনে পণ্ডিত বিধুশেখর মনে করেন, গৌড়পাদ আদিশেষ বা পাণিনির পূর্ববর্তী। বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করের পরবর্তী ও বেদান্তদর্শনের বিখ্যাত টীকাকার এবং ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত। বাচস্পতি তাঁহার ভামতীতে (৩-৩-২৯) ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ভাস্করকে সমালোচনা করিয়াছেন। আদিশেষের গ্রন্থে মনুসংহিতার সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ভাস্কর-দর্শনের সংমিশ্রণ আছে। সুতরাং আদিশেষ নিশ্চয়ই ভাস্কর-দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং আদিশেষ গৌড়পাদের পরবর্তী। অধ্যাপক বি এল আত্রেয় তাঁহার গ্রন্থে[১] নিশ্চয় করিয়াছেন যে, গৌড়পাদকারিকা যোগবাশিষ্ঠের পরবর্তী। কিন্তু পণ্ডিত বিধুশেখর অকাট্য যুক্তি দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দীকে গৌড়পাদের আবির্ভাব কালরূপে নির্ণয়করা যুক্তিসঙ্গত।

মাণ্ডুক্য-কারিকা ব্যতীত গৌড়পাদের অন্যান্য গ্রন্থ আছে। যথা—প্রথমতঃ ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর ভাষ্য। দ্বিতীয়তঃ উত্তরগীতার ভাষ্য। তৃতীয়তঃ নৃসিংহোত্তরতাপনী উপনিষদের উপরও গৌড়পাদের একটী টীকা আছে। চতুর্থতঃ এবং পঞ্চমতঃ সুভগোদয় এবং শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র নামক দুইটী তন্ত্রগ্রন্থ। ষষ্ঠতঃ দুর্গাসপ্তশতীর টীকা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী নামক যে টীকা আছে তাহাতে গৌড়পাদ রচিত দুর্গাসপ্তশতীটীকার উল্লেখ আছে। উক্ত টীকার একটী পাণ্ডুলিপি তাঞ্জোরস্থিত গ্রন্থাগারে ছিল। কিন্তু উহার অধিকাংশ অপহৃত হইয়াছে। গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদী হইয়াও কিরূপে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত বিধুশেখর বলেন যে, উহা অসম্ভব নহে। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তবাদী হইয়াও অনেক দেবীস্তোত্র রচনা করিয়াছেন। প্রগল্‌ভাচার্য্যকৃত শ্রীবিদ্যার্ণব গ্রন্থে আছে, শঙ্করাচার্য্য একটী তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার লিখিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থও আছে।

১। Yogavasistha and its Philosophy by B L Atreya দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য গ্রন্থ সত্ত্বেও মাণ্ডুক্যকারিকাই গৌড়পাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের টীকামাত্র। গৌড়পাদকারিকার উপর শঙ্করাচার্য্যের একটি ভাষ্য ও তদুপরি আনন্দগিরির টীকা আছে। গৌড়পাদকারিকার বাংলা এবং বহু ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। গৌড়পাদী, আগমশাস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য নামেও মাণ্ডুক্য-কারিকা অভিহিত। গৌড়পাদীতে মাত্র চারিটী প্রকরণ আছে। প্রথমটীর নাম আগমপ্রকরণ; উহাতে ২৮টী শ্লোক আছে। দ্বিতীয়টীর নাম বৈতথ্যপ্রকরণ, উহাতে ৩৮টী শ্লোক। তৃতীয়টীর নাম অদ্বৈতপ্রকরণ, উহাতে ৪৮টী শ্লোক। চতুর্থটীর নাম অলাতশান্তিপ্রকরণ; উহাতে এক শত শ্লোক। অতএব গৌড়পাদকারিকা ২১৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

গৌড়পাদের দার্শনিক মতের নাম অজাতবাদ। অপরপক্ষে তৎপ্রশিষ্য শঙ্করের দর্শনকে বিবর্তবাদ বলা হয়। বিবর্ত অর্থে মিথ্যা প্রতীতি। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, বিশ্বপ্রপঞ্চ অধ্যস্ত। অজাতবাদ ও বিবর্তবাদের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই। আমার মতে বিদেহ মুক্তি ও জীবন্মুক্তির অবস্থাদ্বয়ের দৃষ্টিতে এই মতবাদদ্বয় প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানী শিষ্য স্বামী শিবানন্দ বলিতেন—"গৃহের মধ্যে উন্মুক্ত দরজার কাছে দাঁড়ান এবং তাহার বাহিরে অবস্থান যেমন, এই দুই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্যও তেমনি বা ততটুকু।" অজাতবাদিগণ সৃষ্টি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জগৎ সৃষ্ট বা জাত হয় নাই।

মাণ্ডুক্যকারিকার অদ্বৈতপ্রকরণের বিংশ শ্লোকটী এই—

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি॥

অর্থাৎ সৃষ্টিচিন্তকগণ বা দ্বৈতবাদিগণ অজাত বস্তুর জন্ম ইচ্ছা করেন। অজাত অমৃত ব্রহ্মবস্তুর জন্ম বা মৃত্যু কিরূপে সম্ভব? অলাতশান্তিপ্রকরণের দ্বিতীয় কারিকাতে আছে—সর্ব্বসত্ত্বসুখ অস্পর্শযোগের কথা। গৌড়পাদ উক্ত যোগের আচার্য্যকে প্রণতি জানাইতেছেন। অজাতবাদকে অস্পর্শযোগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শঙ্করের মতে অস্পর্শযোগ উপনিষদে প্রসিদ্ধ। কোন কোন উপনিষদে এইরূপে যোগের বর্ণনা থাকিলেও উক্ত শব্দের ব্যবহার কোনও উপনিষদে নাই।

একটী কারিকাতে (৩-৩৭) গৌড়পাদ অস্পর্শযোগকে সকৃজ্জ্যোতি, অচল, অভয় ও সুপ্রশান্ত সমাধি নাম দিয়াছেন। উহা অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা বলিয়াই মনে হয়। অভিসময়ালঙ্কারালোক নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে উক্ত অবস্থার নাম 'অস্পর্শবিহার'। উক্ত যোগে ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়বস্তুনিচয়ের সম্বন্ধ সংছিন্ন হয়, মনোনাশ হয় এবং ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহাকে ভূমানন্দ বলা হইয়াছে। এই অবস্থাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু শ্রুত, দৃষ্ট বা জ্ঞাত হয় না। ইহাই গীতাতে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নামে বর্ণিত।

চার

প্লেটো*

"Plato is philosophy and philosophy is Plato."

প্লেটো জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং সক্রেটিশের প্রধান শিষ্য। সক্রেটিশের মতই তিনি প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁহার জীবনও ছিল হিন্দু ঋষিদিগের ন্যায় উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ। প্লেটো ও ক্যাণ্ট অধ্যয়ন করিলেই পাশ্চাত্য দর্শনের মর্ম গ্রহণ করা যায়। প্লেটোর জীবন ও দর্শন অভেদ ছিল। সক্রেটিশ ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা মহামানব, সুতরাং তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের জীবন যে সত্যানুভূতিতে উদ্ভাসিত হইবে উহা আশ্চর্য্য নহে। ডেলফির দৈববাণী সক্রেটিশকে গ্রীসের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমিত্বশূন্য জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, "কেবলমাত্র আমি এইটী জানি যে, আমি কিছুই জানি না।" "আত্মানং বিদ্ধি" এই বেদ-বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া সক্রেটিশ বলিলেন, "Gnothi Seanton" (Know thyself), নিজেকে জান। কারণ তাঁহার মতে নিজেকে

* উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৪৪

জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। প্লেটো সক্রেটিশের নিকট এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে, বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব হইলেও মানুষের আত্মজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। আলশিবাইডিস্ (Alsibiades) বলেন, একবার সক্রেটিশ চব্বিশ ঘণ্টা আত্মানুভূতিতে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সক্রেটিশের মন অধিকাংশ সময় উচ্চ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিত।

সক্রেটিশের মত ঋষির সংস্পর্শে আসিয়া প্লেটোব জীবনে মহাপরিবর্তন উপস্থিত হইল। প্লেটোর বয়স যখন মাত্র আটাশ বৎসর তখন তাঁহাব গুরু দেহত্যাগ করেন। কিন্তু সক্রেটিশের প্রভাব প্লেটোর জীবনে গভীরভাবে পতিত হইয়াছিল। প্লেটো সক্রেটিশের এত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি অসভ্য না হইয়া গ্রীক, পরাধীন না হইয়া স্বাধীন, এবং স্ত্রীলোক না হইয়া পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কবিয়াছি। সর্বোপরি আমি যে সক্রেটিশের সময়ে জন্মিযাছি, সেইজন্য আমি ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ।" প্লেটো তাঁহার গুরুর চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়াছেন। সক্রেটিশ ও প্লেটোকে একই মুদ্রার উভয় পার্শ্ব বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না। প্লেটোর 'রিপাব্লিক্' (Republic), ফিডো (Phaedo) প্রভৃতি পুস্তক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর মধ্যে পরিগণিত। কোরাণ সম্বন্ধে ওমর যাহা বলিয়াছেন, "রিপাব্লিক্" সম্বন্ধে এমার্সনও তাহাই বলিয়াছেন। ওমর কোরাণ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'দুনিয়ার গ্রন্থাগারসমূহ দগ্ধ কর, তাহাদের মূল্য এই একটী পুস্তকের (কোরাণের) মধ্যে নিহিত।' কবি শেলির মতে প্লেটোর লেখার মধ্যে ন্যায়, কবিতা, দর্শন ও নীতির অপূর্ব সমাবেশ সঙ্গীতের ঝঙ্কারের ন্যায় ধ্বনিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে প্লেটো এথেন্সে কোন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং অশীতিবর্ষ বয়সে ৩৪৭ অব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জ্ঞান-বৃদ্ধ প্লেটোর মৃত্যু-বিবরণ অতিশয় অদ্ভুত। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে তাঁহার বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্লেটো শিষ্যগৃহে উপস্থিত হইয়া আমোদপ্রমোদকারীদের সহিত মিলিত হইলেন। রাত্রিতে সকলে যখন আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল, তখন বয়োবৃদ্ধ দার্শনিক গৃহের একটী

নির্জন প্রকোষ্ঠে বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলেন। তিনি একটী চেয়ারে নিদ্রিত হইলেন। প্রাতে বন্ধুগণ তাঁহাকে জাগাইতে আসিয়া দেখেন, প্লেটো মহানিদ্রাভিভূত হইয়াছেন! নীরব নিশীথে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। এথেন্সবাসীগণ তাঁহার মৃত দেহের অনুগমন করিয়া যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল ছিল বলিয়া তিনি দীর্ঘজিবী হইয়াছিলেন। ক্যাণ্টের মত তিনি বোধ হয় চিরকুমারছিলেন, কারণ তাঁহার বিবাহ বা দারাপুত্রের উল্লেখ কোথাও নাই। তাঁহার সবল প্রসারিত স্কন্ধদ্বয়ের জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল প্লেটো। তিনি যোদ্ধারূপে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দুইবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় তিনি পুরস্কার লাভ করেন। প্লেটো ঐশ্বর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হন। তিনি একজন শক্তিশালী ও সুদর্শন যুবা ছিলেন। সক্রেটিশকে মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দেশের গণতান্ত্রিক নেতৃগণের কুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয় মনে করিয়া বন্ধুগণ তাঁহাকে বিদেশ ভ্রমণে যাইতে পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী প্লেটো খ্রী: পূ: ৩৯৯ অব্দে বিদেশযাত্রা করেন। তিনি প্রথমে মিশর ও পরে সিসিলী ও ইটালী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি প্যালেষ্টাইন এবং ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কাল ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। কথিত আছে, তিনি গঙ্গাতীরে হিন্দু সাধুদের নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। প্লেটোর মতবাদ ও উপাখ্যানগুলির সহিত হিন্দু দর্শন ও পুরাণের সাদৃশ্য দর্শনে প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ সার উইলিয়াম জোন্স বলেন, বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রপাঠে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না যে, গ্রীসদেশীয় পিথাগোরাস ও প্লেটো এবং ভারতীয় ঋষিগণ একই উৎস হইতে তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দর্শনের ইতিহাস লেখকগণের মতে 'ভাববাদ' (Doctrine of Ideas) চিন্তাজগতে প্লেটোর প্রধান অবদান। মাতা শিশুর জন্য প্রাণদান করে, যোদ্ধা দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করে এবং দার্শনিকও স্বীয় মতবাদ প্রচার ও প্রমাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। মাতা, যোদ্ধা

ও দার্শনিক এই তিন জনের যে একটী সাধারণ ভাব আছে তাহা সদ্‌ভাব (Idea of the Good)। এই ভাবই সকলের অনুপ্রেরণার উৎস। সদ্‌বস্তু বা সদ্‌ব্যক্তির সদ্ভাব বিদ্যমান। সদ্‌বস্তু বা সদ্‌ব্যক্তি বিনাশশীল, কিন্তু সদ্‌ভাবটী নিত্য। সুন্দর ফুল, সুন্দর মুখ ও সুন্দর আকাশের অন্তরে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা অধিকতর সত্য ও স্থায়ী। ভাব হইতেই বস্তুর উৎপত্তি। সত্য, শিব ও সুন্দরের ভাবময় সত্তার সন্ধান প্লেটো মানুষকে দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত প্লেটো আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্লেটোর মতবাদ (Platonism) হইতেই খ্রীষ্টান 'মিষ্টিসিজ্‌ম' এবং 'নিও প্লেটোনিজ্‌মের' জন্ম। সুতরাং প্লেটোর প্রভাব পাশ্চাত্যের ধর্ম ও দর্শনের উপর গভীর ভাবেই রেখাপাত করিয়াছে। রাজনীতি বিষয়েও প্লেটোর চিন্তারাশি সম্পূর্ণ অভিনব। আমরা যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখি, তিনি এইরূপ এক 'উটোপিয়া'র (Utopia) কথা বলিতেন। গণতন্ত্রে তাঁহার আস্থা ছিল না। জনসাধারণ চিন্তাশীলতাবর্জ্জিত। তাহারা শাসকগণের পথানুসরণ করে মাত্র। তাই তিনি বলিতেন যে, যতদিন জ্ঞানী ও দার্শনিক রাজা দেশ শাসন না করিবে, সমাজ বা শহর হইতে ততদিন অসৎ ও অন্যায় দূরীভূত হইবে না। মানুষের প্রকৃত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ তাঁহারাই অবগত হইতে সমর্থ। রাজা বা নেতার জীবনে রাজনীতি ও তত্ত্বজ্ঞান সম্মিলিত না হইলে সমাজেও শান্তি বিরাজ করিবে না। যে রাজা রাজ্য অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান বেশী ভালবাসিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে সমর্থ। প্লেটোর রামরাজ্যের স্বপ্ন অসম্ভব হইলেও উহা অলীক নহে। শুনা যায়, রোমসম্রাট মার্কাশ অরেলিয়াস্ এইরূপ একজন দার্শনিক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যসম্পদ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞান এত অধিক ভালবাসিতেন যে, যে যুদ্ধে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হন, সেই যুদ্ধে গমন করিবার পূর্বে তিনি স্বীয় প্রাসাদে রোমস্থ প্রধান পণ্ডিতগণের সঙ্গে তিন দিন যাবৎ ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন। সংকল্পিত 'উটোপিয়া' গঠনের সুযোগ পাইয়া প্লেটো একবার নিজেকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৭ অব্দে সিসিলির রাজা ডাইওনিসিয়াস সিসিলিকে 'উটোপিয়া'তে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্লেটোকে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু ডাইওনিসিয়াস

প্লেটোর উপস্থিতিতে প্রমাদ গণিলেন। তিনি দেখিলেন, প্লেটোর পরামর্শমত চলিলে হয় তাঁহাকে দার্শনিক হইতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ ঘটিল। রাজ্যহানির ভয়ে রাজা প্লেটোকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় কবিলেন। প্লেটোর বন্ধু ও শিষ্য আন্নিসেরিশ শেষে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। সে যাহাই হউক, প্লেটোর আদর্শ কিয়ৎপরিমাণেও অন্ততঃ কার্যে পরিণত না কবিলে রাষ্ট্রের কল্যাণ অসম্ভব, এই বিষয়ে মনীষিগণ একমত। শাসকের দৃষ্টি কেবল মাত্র জড়-জগতের উপর নিবদ্ধ থাকিলে তিনি শাসিতেব কেবল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতেই সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু মানুষ ত কেবল শরীর নহে, তাহাব একটা মন এবং সর্বোপরি তাহার একটা আত্মাও আছে। অন্নচিন্তা না থাকিলে যদি মানুষ শান্তির অধিকাবী হইত, তবে আমেবিকা, জাপান, জার্মেনি ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এত অশান্তি কেন? প্রাচীন ভাবতেব রাজা বা দেশ-শাসকগণ সকলেই প্লেটোকথিত জ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। বাজা অশোক, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির এবং বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী প্লেটোর রাজনৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজার জীবন আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞানালোকে উচ্ছ্বসিত না হইলে প্রজাব সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে। হিট্লার, মুসোলিনি, লেনিন, ষ্টালিন, ডিভ্যালেরা প্রভৃতি দেশনায়কগণেব জীবনে বাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার প্রাচুর্য, অথচ তত্ত্বজ্ঞানের একেবারে অভাব বলিয়া তাঁহাদের শাসিত দেশে অন্যায়, অসাম্য, অত্যাচার ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

'বিপাবলিক' পুস্তকের পঞ্চম ভাগে প্লেটো 'মতম্' (opinion) এবং 'তত্ত্বম্' (science) এর মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে অপরা বিদ্যা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহাই 'মতম্'। আর 'তত্ত্বম্' হইতেছে পরা বিদ্যা বা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান। উক্ত গ্রন্থের সপ্তম ভাগে প্লেটো উভয় প্রকার জ্ঞানের বিষয় নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনে করুন, ভূগর্ভে একটী গুহা আছে। গুহার যে গভীর প্রদেশে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, তথায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অগ্নির পার্শ্বে একটী নিম্ন প্রাচীর। এই প্রাচীরের উপর

মানুষ ও পশুর মূর্তি যাতায়াত করিতেছে। মূর্তিগুলির ছায়া অগ্নির আলোকে প্রস্তরময় গুহার প্রান্তে পতিত হইতেছে। পশ্চাতে মুখ ফিরাইতে অক্ষম কতকগুলি কারারুদ্ধ ব্যক্তি দিনের পর দিন এইগুলি দেখিয়া মনে করে যে, ইহারা বাস্তব। প্রাকৃত জনের নিকট এইরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। উহাদের মধ্যে একজন কয়েদী মুক্ত হইয়া যখন জ্বলন্ত অগ্নি দর্শন করে, তখন তাহার ভ্রান্তি দূর হয়। যখন সে গুহার উপরে উঠিয়া সূর্য্যালোকে পৃথিবীর সব কিছু দেখে, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যেন মানুষকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সত্যেব অনুভূতি ও আলোক আসিয়া যখন মানুষকে অসীম জ্ঞান-সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তখন সে বিস্ময়াপ্লুত হয়।" প্লেটো বলেন, এই উচ্চতম জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাভ করা যায় না। পঞ্চেন্দ্রিয় যখন ধীর, স্থির ও নিষ্ক্রিয় থাকে এবং মন ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিযুক্ত হইয়া একাকী পারমাথিক সত্তার অন্বেষণ করে, তখনই এই জ্ঞান উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, আত্মার বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তর্মুখী করাই শিক্ষা ও সাধনার চরম উদ্দেশ্য।

'রিপাব্লিক' গ্রন্থে প্লেটো জীবাত্মার তিনটী ভিন্ন অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু দার্শনিকগণের মত তিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য তাঁহার দর্শনের সহিত বেদান্তের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। প্লেটোর মতে আত্মার তিনটী অংশেব নাম, the wisdom-loving, the honour-loving and the gain-loving. এই গুলিকে হিন্দু দর্শনের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গীতায় যেমন দেহ ও দেহীর মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ প্লেটো দেহকে জড় ও নশ্বর এবং আত্মাকে চৈতন্য ও চিরস্থায়ী বলিয়াছেন। 'ফিডোতে' (Phaedo) প্লেটো দেহসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "আহার ব্যতীত শরীর স্থায়ী হয় না, আবার আহারগ্রহণের জন্য শরীরে নানা রোগ জন্মে। সেইজন্য সত্যান্বেষণে বিঘ্ন হয়। শরীরের প্রতি আসক্তিবশতঃ ভয়, দুঃখ ও দৈন্য প্রভৃতি নির্বুদ্ধিতায় মন পূর্ণ হয়। শরীর ধারণের জন্যই বাসনার উৎপত্তি ও অর্থোপার্জনের প্রয়াস। আর অর্থের অন্বেষণ করিতে গিয়াই জীবনে ও সমাজে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। কাজেই ইহজীবনে দেহজ্ঞান বিমুক্ত না

হইলে আত্মার সাক্ষাৎলাভ হয় না। দেহের প্রতি অনুরাগ যতই কম হইবে ততই সত্যের দিব্য কিরণে জীবন জ্যোতির্ময় হইবে।" প্লেটোর কথাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি একজন হিন্দু ঋষি ছিলেন। যোগীদের ন্যায় প্লেটো সত্যলাভের জন্য মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া একাগ্রতা সাধন করিতে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। প্লেটো বলেন, "তখনই শ্রেষ্ঠ চিন্তা মনে জাগ্রত হয়, যখন দর্শন ও শ্রবণ এবং সুখ ও দুঃখ মনে স্থান পায় না। শরীরেব চিন্তা মনে যখন একেবারেই উদিত হয় না, তখনই মানুষ সত্যের সম্মুখীন হয়। দেহের চিন্তাই আমাদের আত্মচিন্তা ভুলাইয়া দেয়। দেহের দ্বারাই মন জগতের সহিত যুক্ত হয়। সুতরাং দেহ ভুলিতে পারিলেই জগৎ-সম্বিৎ তিরোহিত হইবে। চিত্তশুদ্ধি অর্থে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করা। দেহ-বন্ধনই আত্মাকে অশুদ্ধিসংযুক্ত করে। দেহ-কারাগারে আত্মা বন্দী। বিদেহাবস্থায় আত্মা স্বীয় মহিমায় মগ্ন।" মৃত্যু সম্বন্ধেও প্লেটোব বাণী বেদান্তবাণীর ন্যায় সহজ ও সরল। প্লেটো বলেন, "মৃত্যুর সময় মানুষের নশ্বরাংশ বা শরীরই বিনষ্ট হয়। কিন্তু অবিনশ্বর আত্মা নিরাপদে অন্য লোকে গমন করে। দেহগ্রহণের পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল, সুতরাং দেহত্যাগেব পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে।" আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হইলে ইহজীবনের পূর্বজন্ম ও পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করিতে হয়। যাহা আদ্যন্তহীন তাহা অগ্রেও পশ্চাতে সমান ভাবেই সীমাহীন। প্লেটো আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ বা শরীর ধারণে বিশ্বাস করিতেন। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হইলে মানব জীবনের অধৈর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। সম্মুখে যখন অনন্ত জীবন বিস্তৃত রহিয়াছে, তখন ইহজীবনে যাহা লাভ হইল না তাহা পরজীবনে লাভ করা সম্ভব, সুতরাং অস্থিরতা অনাবশ্যক। প্লেটো বলেন, যে মানুষ বা জাতি আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, তাহার মঙ্গল ও মুক্তির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ। প্লেটোর মতে মৃত্যুর দ্বারাই মানবের জ্ঞান পরীক্ষিত হয়। মৃত্যুর আগমনে মানুষ যদি শোকমগ্ন হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি জ্ঞানী নন, তিনি দেহে আসক্ত। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিশ্চয়ই সম্পদ এবং সম্মানেও অনুরক্ত। ইহা ব্যতীত শোকের কারণ আর কি হইতে পারে? তাই সক্রেটিশ ও প্লেটো উভয়েই জীবিতাবস্থায় মৃত্যু অভ্যাস করাকেই ধ্যান বলিতেন।

জার্মান বেদবিৎ মোক্ষমূলার তাঁহার "Chips from a German Workshop" নামক পুস্তকে বলেন, তুলনামূলক পৌরাণিক উপাখ্যান অধ্যয়নের পক্ষে বেদের মূল্য অসীম। বেদ ব্যতীত এই বিদ্যা কল্পনায় পর্য্যবসিত হইত। বিভিন্ন দেশের উপকথা পাঠে দেখা যায়, উহাদের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিরাজমান। এই সাদৃশ্য দর্শনে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, একই উপাখ্যান যেন সামান্য বিকৃতভাবে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকায় আয়ারলণ্ডের উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন। তাহা পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে, রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই ঐসকল গৃহীত হইয়াছে। 'ইসপস্ ফেবল' গুলি আজ ইংরাজি ভাষায় এত জনপ্রিয় হইলেও এইগুলি ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। প্লেটোর উপাখ্যানগুলিতে ভারতীয় ভাব পরিস্ফুট। প্লেটোর 'রিপাবলিক" গ্রন্থে মৃত্যুর পর আত্মার গতি বিষয়ে এই উপাখ্যান আছে। পাম্ফিলিয়ান আর্মিনিয়াসের পুত্র আর (Er) কোন যুদ্ধে নিহত হয়। কয়েক দিন পর তাহার মৃত দেহ ভস্মীভূত করার জন্য চিতার উপর রক্ষিত হইলে যেন আরের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। তখন সে প্রেত লোকের বিবরণ দিতে আরম্ভ করিল। সৎকর্ম ও সৎচিন্তা দ্বারা মানুষ কিরূপে স্বর্গে গমন করিয়া শান্তিতে থাকে এবং পাপ ও অন্যায়াচরণ দ্বারা লোকে কিরূপে দুঃখে ও কষ্টে পতিত হয়, তাহা বিশদরূপে উক্ত উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে। প্লেটো হিন্দুদের ন্যায় কর্মবাদ এবং পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করিতেন, ইহা উক্ত উপাখ্যান হইতে জানা যায়। গল্পের শেষে প্লেটো গ্লোকনকে (Glaucon) লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন, "যিনি বিশ্বাস করেন, আত্মা অমর, জীবনের ভাল মন্দ সবই তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারেন। আমরা যদি ইহলোকে উন্নত জীবন যাপন করি, পরলোকে আমরা সুখ ও শান্তির অধিকারী হইব।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সময় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, পতি পত্নীকে, পিতা পুত্রকে এবং মানুষ মানুষকে যে এত ভালবাসে তাহা কামজনিত দৈহিক আকর্ষণ নহে। সর্বভূতে একই আত্মা অবস্থিত আছেন। আত্মার এই সর্বব্যাপিত্ব ও ঐক্য দেহমনের দ্বারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি পুনর্মিলিত

হইতে চাহেন। প্রেম মিলন চাহে, কিন্তু তাহা শরীরের বা মনের মিলন নহে। আত্মার মিলনই প্রেমের উদ্দেশ্য। প্লেটো তাঁহার 'সিম্পোসিয়াম' (Symposium) গ্রন্থে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রেম দৈহিক ক্ষুধা বা ইন্দ্রিয়লালসা নহে। উহা আত্মার একীভূত হইবার ইচ্ছা মাত্র। প্রেমের এই আধ্যাত্মিক অর্থ অবগত হইলে প্রেমের প্রকাশ অন্য আকার ধারণ করিবে। প্রেম পশুত্ব নহে, উহা দেবত্বের বিকাশ।" প্লেটো বলেন, "আমরা এক ছিলাম, কর্মদোষে বহু হইয়াছি। বহুত্ব হইতে একত্বে যাইবার আত্মার যে অভিলাষ তাহাই প্রেম নামে অভিহিত।"

'সিম্পোসিয়ামে' প্লেটো পারমার্থিক সত্য অন্বেষণের কথা বলিয়াছেন। বস্তুর অন্তরে যে ভাব বা 'আইডিয়া' বিদ্যমান, তাহা উপলব্ধি করাই সাধনার লক্ষ্য। ধর্মজীবনে গুরুর আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সাধনার প্রারম্ভে সৌন্দর্য্যানুরাগ বিঘ্নরূপে দেখা দেয়। প্লেটোর মতে এই বিঘ্ন দূর করিতে হইলে একটী সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ সকল সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। প্রেমের পরিধি যতই বৃহৎ হয়, ততই মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু উহার পরিধি ক্ষুদ্র হইলে উহা বন্ধনের কারণ হয়। প্লেটো বলেন, "ধীরে ধীরে মনকে আত্মার সৌন্দর্য্যের অভিমুখে লইয়া যাইতে হইবে। দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আত্মার সৌন্দর্য্য যে অধিক উহা হৃদয়ঙ্গম করিলে সৌন্দর্য্যঘন ঈশ্বরের দিকে মন আকৃষ্ট হইবে। যদি আমরা সত্যসত্যই সৌন্দর্য্যপ্রিয় হই তবে কুৎসিত দেহস্থ সদ্‌গুণরাজির প্রতিও আমাদের অনুরাগ হইবে। সর্বব্যাপী আত্মা বা ঈশ্বরকে সাধকের প্রথমাবস্থায় ভালবাসা সম্ভব নহে বলিয়া প্রথমে সদ্‌গুণরাজিকে ভালবাসা আবশ্যক। মানুষ কুশ্রী হউক বা সুশ্রী হউক, তাহাতে যদি সদ্ভাব বা সদ্‌গুণ থাকে তাহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত।"

প্লেটো বলেন, "সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে হইবে। তাহাই আমাদের গম্য স্থান। কারণ, সৌন্দর্য্য বস্তু বা ব্যক্তিতে, স্বর্গে বা মর্ত্তে থাকে না। উহা আত্মার গভীরতম প্রদেশে শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনের অগম্য স্থানে অবস্থিত।" প্লেটোর সংজ্ঞা "Beauty is in Itself,"

বেদান্তের শিবসুন্দরের সংজ্ঞার মতই। আকৃতি পরিবর্তিত এবং দেহ বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য্যের হ্রাস, বৃদ্ধি বা নাশ নাই। মান্টিনার স্ত্রীলোকের মুখে প্লেটো সক্রেটিশকে বলিতেছেন, নিরাকার, নির্বিশেষ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শনই মানুষের শ্রেয়ঃ। উহা ব্যতীত জীবন অর্থহীন ও মূল্যহীন। এইরূপ দর্শকই অমৃতত্ব লাভ করেন। প্লেটোর নিকট সত্য, সুন্দর ও শিব একে তিন, তিনে এক।

প্লেটোর শেষ জীবন শান্তিপূর্ণ ছিল। তখন তাঁহার শিষ্যগণ গ্রীসের সর্বত্র সমাদৃত। তাঁহাব প্রধান শিষ্য এরিষ্টটল দীর্ঘ পনের বৎসর তাঁহার নিকট দর্শন-শিক্ষা করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল ম্যাসিডোনিয়ার সম্রাট আলেকজাণ্ডাব দি গ্রেটের গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্লেটো তাঁহার 'একাডেমি' নামক বিদ্যালয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। বীর একাডেমাসের নামানুসাবে প্লেটোর স্কুলের নাম রাখা হইয়াছিল 'একাডেমি'। এথেন্সেব পশ্চিম প্রান্তে বৃক্ষলতা, প্রস্তরমূর্তি ও মন্দিরাদি পরিশোভিত সুবৃহৎ উদ্যানে উক্ত 'একাডেমি' অবস্থিত ছিল। বহু শতাব্দী যাবৎ উক্ত 'একাডেমি' প্লেটোনিক স্কুলের অধীন ছিল। এরিষ্টটলও প্লেটোর মত 'লিসিয়াম' নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'এপেলো-লিসিয়াসের' মন্দিরের নিকটে এই শিক্ষালয় স্থাপিত হওয়ায় উহার নাম 'লিসিয়াম' হইয়াছিল। উদ্যানের শীতল ছায়ায় এরিষ্টটল বেডাইতে বেড়াইতে শিষ্যদিগকে দর্শনের উপদেশ দিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে ভ্রমণশীল শিক্ষক (Peripatetic teacher) বলিত। এজন্য তাঁহার দর্শনকেও লোকে 'পরিপেটেটিক দর্শন' বলে। প্লেটোর শিষ্য হইলেও এরিষ্টটল গুরুর দর্শন হুবহু গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য লজিক বা ন্যায়দর্শনের স্রষ্টা ছিলেন এরিষ্টটল। ইহার দুই শতাব্দী পূর্বে ভারতে গৌতমের ন্যায় দর্শন প্রচলিত হয়। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এরিষ্টটল স্বীয় ছাত্র আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সহিত ভারতাগমন করিয়া ভারতীয় ন্যায় ও দর্শন অধ্যয়ন করেন।

গ্রীসে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শোলনের বংশধর ছিলেন প্লেটো। উইল ডুরান্ট (Will Durant) তাঁহার "Story of Philosophy" পুস্তকে প্লেটোর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি শোলনের মত শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং সক্রেটিশের মত শিক্ষা দিতেন। বিদেশ ভ্রমণকালে ইটালিতে তিনি পিথাগোরাসের এক

নিরামিষভোজী শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া তাঁহাদের সংযম ও ত্যাগের জীবনের সহিত পরিচিত হন। পিথাগোরাসের প্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই। দুর্বলের প্রতি দয়া প্রদর্শন ছিল যীশু খ্রীষ্টের নীতি। নীটশের মতে বলবানের সাহসিকতাই নীতি। কিন্তু প্লেটো বলেন, সমষ্টির সাম্য বিধানই নৈতিক আদর্শ। প্লেটোর 'রিপাব্লিক্' গ্রন্থের দশটী অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বর্ণিত আছে, উহাদের সহিত হিন্দুদর্শনের কিরূপ নিকট সাদৃশ্য আছে তাহা আরউইক সাহেব তাঁহার "Message of Plato" নামক পুস্তকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রীসদেশের অন্যান্য দার্শনিকগণের সহিত হিন্দুদর্শনেরও অদ্ভুত ঐক্য আছে। বেদান্তের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়নে আমাদের দর্শনজ্ঞান আরও পরিপক্ক হইবে। দর্শনরাজ্যের শেষ কথা বেদান্ত বলিয়া দিলেও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনার ক্রম ও বিচারপদ্ধতি দ্বারা বেদান্তের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইবে; পশ্চিমদেশীয় দর্শনও বেদান্তের দ্বারা পরিপুষ্ট হইবে এবং তাহাদের যে সকল অভাব আছে, তাহাও দূরীভূত হইবে। একমাত্র বেদান্তই পূর্ণ প্রস্ফুটিত দর্শনকুসুম। অন্যান্য দর্শন যেন উহার আংশিক বিকাশ মাত্র। অবশ্য অন্যান্য দেশের দর্শনগুলির গম্য স্থানও এক। কিন্তু উদারতার অভাবে উহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে অক্ষম। 'আইডিয়া'বাদকে প্লেটোর প্রকৃত দর্শন বলিলে প্লেটোকে ভুল বুঝা হইবে। প্লেটোর অন্তরের খবর পাইতে হইলে তাঁহার বর্ণিত আত্মার অস্তিত্ব ও অমরত্ব, কর্মবাদ, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতিকে 'আইডিয়ার' উপরে স্থান দিতে হইবে।

———

পাঁচ

লাল্লেশ্বরী *

১৯৪৩ সালে তুষারতীর্থ অমরনাথ দর্শনে যাইয়া আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কাশ্মীরে থাকিবার সুযোগ হয়। এই সময় কাশ্মীরের সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাসাদির বিষয় কিছু অধ্যয়ন করি। কাশ্মীরের ইতিহাস ভারতেতিহাসের একটী গৌরবময় অধ্যায়। কাশ্মীরী ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল এবং কঠিন। এই ভাষায় কোন সাহিত্য নাই। ইহা আজ কেবলমাত্র কথিত ভাষায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে হিন্দী এবং উর্দু ভাষাই প্রচলিত। কাশ্মীরে ব্রহ্মবিদুষী লাল্লেশ্বরীর বাক্যাবলী পুরাতন কাশ্মীরী ভাষায় লিখিত। গুপ্তলিপি, ব্রাহ্মীলিপি এবং খরোষ্ট্রী প্রভৃতি মৃত ভারতীয় লিপির ন্যায় কাশ্মীরের নিজস্ব বর্ণমালা সারদালিপিও আজ মৃত। কাশ্মীরের সারদাপীঠ নামক যে স্থানে মহাবিদ্যালয় ছিল, সেই স্থানে শ্রীচক্র অদ্যাপি বিদ্যমান এবং সেখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই সারদা হইতে উক্ত লিপির উদ্ভব বলিয়া এই লিপির নাম সারদালিপি হইয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কল্হান মিশ্র তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কাশ্মীরে বহু মহাবিদ্যালয় ছিল। যখন চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন সাং (৬৩১-৬৩ খ্রী:) এবং ওউকং (Oukong) (৭৫৯ খ্রী:) কাশ্মীরে আগমন করেন তখনও ইহার মন্দিররাজি এবং মহাবিদ্যালয়সমূহ বিশেষ প্রখ্যাত ছিল।

একদা কাশ্মীর বিদ্যাদেবী সারদার প্রিয় দেশ ছিল। প্রবাদ আছে, প্রায় ২৫০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকায় পুরাকালে 'সতীসার' নামক একটী বৃহৎ হ্রদ ছিল। কশ্যপ ঋষির তপস্যায় দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে জলদেব যখন এই হ্রদের জলরাশি বাহির করিয়া উহাকে উপত্যকায় পরিণত করেন উক্ত ঋষি তথায় পদার্পণ করিবার জন্য দেবতাগণকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রথমে সারদাদেবী

---

* উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৫৪

আসিয়াই সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিলেন। পরে আসিলেন লক্ষ্মীদেবী। তিনি উচ্চাসন না পাইয়া ক্রুদ্ধা হইয়া এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, এই উপত্যকার অধিবাসিগণ কখনও ধনসম্পন্ন হইবে না। সারদাদেবী আশীর্বাদ করিলেন, কাশ্মীরীগণ লক্ষ্মীর বরপুত্র না হইলেও আমার বরপুত্র এবং বিদ্বান্ হইবে। শোনা যায়, যখন এই দেশে সংস্কৃত কথিত এবং লিখিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল তখন পণ্ডিতদের বাড়ীতে ময়না এবং তোতা পাখীরাও সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করিত। দীর্ঘ ছয় শত বৎসর মুসলমানদের অত্যাচারে এই স্থানের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ধ্বংস হইয়াছে। মতিণ্ড, তাপর, ব্রজবিহারী ও সারদা প্রভৃতি স্থানের মন্দির-এবং তৎসংলগ্ন মহাবিদ্যালয়গুলি মুসলমানগণ ধ্বংস করেন।[১] সিকন্দর লোদী, মামুদ গজনী এবং কালা পাহাড় হিন্দুদের যে সর্বনাশ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়! শ্রীনগরের অদূরে ব্রজবিহারী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রীঃ ভগ্নী নিবেদিতার সমভিব্যাহারে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। এই মন্দিরের পুঁথিগুলি ধ্বংসকালে ১৭ দিন যাবৎ আগুনে জ্বলিতেছিল! সিকন্দর লোদী নিহত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের সাড়ে সাত (৭॥০) মণ যজ্ঞোপবীত সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলেন[২]। অধিকাংশ কাশ্মীরী হিন্দুগণ প্রাণভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সহস্র সহস্র লোক হিন্দুধর্মের জন্য প্রাণ দান করে, মাত্র দ্বাদশ গৃহ ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে প্রাণরক্ষা করেন। সেই দ্বাদশ গৃহ হইতে কাশ্মীরে আজ প্রায় ৭৫।৮০ হাজার ব্রাহ্মণ হইয়াছে। কাশ্মীরী হিন্দুগণ সকলেই ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারা পণ্ডিত নামে অভিহিত।

কাশ্মীরে বর্তমান যুগে প্রথম হিন্দু রাজা হন গুলাব সিং[৩]। তিনি ১৮৪৭ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকারের সহিত সন্ধি করিয়া এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র রণবীর সিং তৎপরে রাজা হন। রণবীর সিংহের পুত্র প্রতাপসিং ছিলেন ভূতপূর্ব মহারাজা। প্রতাপসিং নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কাশ্মীরের অন্তর্গত

---

১ "Archaeological Remains of Kashmir" by Pandit Ananda Kanta দ্রষ্টব্য।

২। "A Short History of Kashmir" by Pandit Ghawsalall দ্রষ্টব্য।

৩। "Gulab Singh" by K. M. Pannikkar দেখুন।

পুঞ্চ রাজ্যের রাজার দ্বিতীয় পুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারত-সরকার তাহা অনুমোদন না করায় প্রতাপসিংএর ভ্রাতা অমরসিংএর পুত্র হরিসিং বর্তমান মহারাজা হইয়াছেন। হরিসিংএর পুত্র করুণসিং এখন যুবরাজ। রণবীর সিং অশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি জম্মুতে রণবীরেশ্বর শিবমন্দির স্থাপন করেন এবং প্রতাপসিং ও অমরসিং প্রভৃতি পুত্রদিগের মধ্যে সংস্কৃত পুঁথির বিরাট সংগ্রহপূর্ণ স্বীয় লাইব্রেরী ভাগ করিয়া দিয়া এইগুলি রক্ষা ও প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া যান। প্রতাপসিংএর প্রাপ্ত লাইব্রেরী অংশ জম্মু রঘুনাথ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। অমরসিংএর অংশ বর্তমান মহারাজার প্রাইভেট লাইব্রেরী নামে শ্রীনগরে বিদ্যমান। উহাতে বহু মূল্যবান হস্তলিখিত পুঁথি আছে। কাশ্মীর সরকারের গবেষণা এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ইহার অনেক পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। কাশ্মীর শিবাদ্বৈতবাদের জন্মভূমি এবং তন্ত্রপ্রধান। অভিনব গুপ্ত, রামকণ্ঠ, ক্ষেমরাজ এবং উৎপলদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত (বা মহাযান) বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি স্থানও কাশ্মীর। অভিনব গুপ্ত এবং রামকণ্ঠের গীতাটীকাদ্বয় তথায় খুব প্রচলিত।

কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছে লাল্লেশ্বরীর বাক্যাবলী। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখে এই ব্রহ্মবিদুষীর অমূল্য বাণী শোনা যায়। ইঁহার কোন রচিত গ্রন্থ নাই। ইঁহার বাক্যাবলী দুর্বোধ্য লুপ্তপ্রায় কাশ্মীরী ভাষায় কথিত। লাল্লেশ্বরী লাল দেদ নামেই পরিচিতা। শ্রীনগর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে পাপর বা পদ্মপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে লাল্লার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় ছিল। শাশুড়ী তাঁহার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতেন। একদিন তিনি লাল্লাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'তোমার মত পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া আমার কোনই লাভ হইল না। ঘরে তুমি একটু জলই আনিলে না, অন্যকিছু ত দূরের কথা।' ইহা শ্রবণে লাল্লা মনঃক্ষুণ্ণা হইয়া একটী কলসী লইয়া বাহিরে গেলেন এবং কলসীপূর্ণ জল আনিয়া গৃহের সকল জলপাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার কক্ষস্থিতা কলসী জল-পূর্ণই রহিল। গৃহে আর জলের

আবশ্যক না থাকায় তিনি উঠানের একটী খাতে কলসীর জল ঢালিতে লাগিলেন। খাত জলপূর্ণ হইয়া গেল। এই কুণ্ডটী এখনও বিদ্যমান। ইহাকে লালত্রাগ বলে। বাল্যাবস্থায় লালেশ্বরীর জন্মান্তর স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিলে তিনি পতিকে বলিলেন, 'তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? পতি, পুত্র, না পিতা? কারণ এই জন্মে তুমি পতি হইলেও পূর্ব পূর্ব জন্মে তুমি কখনও পিতা, কখনও বা পুত্র ছিলে।' এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া পতি নির্বাক এবং নিস্পন্দ হইলেন! ভাবিলেন, 'পত্নীরূপে কোন্ ডাকিনীকে ঘরে আনিলাম!' লাল্লা রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর স্বীয় গুরু দর্শনে এবং তপস্যায় যাইতেন। পথে একটী নদী অতিক্রম করিতে হইত। লাল্লা স্থলের উপর যেভাবে অনায়াসে চলিতেন জলের উপর দিয়াও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া নদী পার হইতেন। তাঁহার পতি একদিন রাত্রিতে তাঁহার গন্তব্য স্থানের অনুসন্ধানে গুপ্তভাবে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া লাল্লার নদী পার হইবার উক্ত প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইহাতে লাল্লার প্রতি তাঁহার সন্দেহ এবং শ্রদ্ধা উভয়ই বাড়িয়া গেল। শেষে তাঁহার সন্দেহের অবসান হইল। তিনি জানিতে পারিলেন, লাল্লা সামান্যা নারী নহেন; তিনি উন্মত্তা যোগিনী।

লাল্লা সন্ন্যাসিনীবেশ ধারণপূর্বক যখন গৃহত্যাগিনী হইলেন, তখন তিনি অধিকাংশ সময় নিরাভরণ থাকিতেন। তিনি সাধারণতঃ উন্মাদবৎ উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেন। কাশ্মীরী ভাষায় লাল্লা অর্থে তলপেটের ভুঁড়ির যে অংশ ঝুলিয়া পড়ে তাহা। লাল্লার তলপেটের দোদুল্যমান ভুঁড়ির অংশই ল্যাঙটের মত তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিত। এইজন্য লোকে তাঁহাকে লাল্লা বলিত। একবার শিবরাত্রিতে গ্রামের সকলেই শিব দর্শনে যাইতেছেন। প্রতিবেশী বয়স্যাগণ লাল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি শিব মন্দিরে যাইবে না?' তাহাতে লাল্লা উত্তর করিলেন, পাথর তাহাকে ছাড়িতেছে না। অর্থাৎ তাঁহার শাশুরীই সাধন-পথের প্রধান অন্তরায়! নচেৎ তিনি এতদিনে অনেক দূর অগ্রসর হইতেন এবং অনেক সাধু ও তীর্থ দর্শন করিতে পারিতেন। লাল্লা শিবাদ্বৈতভাবের

সাধিকা ছিলেন এবং এই ভাবেই তিনি সংসিদ্ধা হন। একদিন তাঁহার গুরু স্নান করিতেছেন দেখিয়া লাল্লা একটী মলভাণ্ড আনিয়া গুরুর সমক্ষেই উহা খুব মাজিতে লাগিলেন। তৎদর্শনে গুরু শিষ্যাকে বলিলেন, 'তুমি একি করিতেছ? যে ভাণ্ডের অন্তরে মল, তাহাকে বাহিরে পরিষ্কার করিয়া লাভ কি?' তাহাতে শিষ্যা গুরুকে বলিলেন 'আপনিই ত আমাকে এইরূপ করিতে শিখাইয়াছেন। আপনি তবে নিত্য স্নান করেন কেন? রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে ত রক্ত, মল, দূষিত বায়ু ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহাকে এত সাফ্ করিবার কি প্রয়োজন? জ্ঞান হইয়া গেলে শরীর-ত মলভাণ্ডবৎ পরিত্যাজ্য!' একদিন জনৈক ব্যক্তি লাল্লাকে কোন পুরাকাহিনী বলিতেছিল। তাহাতে লাল্লা বলিলেন, "হরমুখ কঁউসার, কজ্‌নাগ সুমসার।" হরমুখ একটী পাহাড় এবং ২২ হাজার ফুট উচ্চ। কঁউসার = কংসনাগ পর্বত, কজনাগ = কাজীনাগ পাহাড়। কংসনাগে বিষ্ণুপদ আছে। পুরাকালে যখন কাশ্মীর জলময় ছিল তখনও এই তিনটী পর্বত মস্তক উত্তোলনপূর্বক বিরাজ করিত। এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে যাতায়াতের জন্য পুল বা কদল ছিল। কাশ্মীরী ভাষায় পুলকে কদল বলে। লাল্লা বলিলেন, "যখন এই তিন পাহাড়ের উপর দিয়া কদল ছিল সেই সময়ও আমি জানি"। সার জর্জ গ্রীয়ারসন (Sir George Grierson) এবং ডক্টর লাইওনেল ডি বার্নেট (Dr. Lionel D. Barnett) লাল্লা যোগেশ্বরীর ১০৯টী বাক্য সংগ্রহ করিয়া ১৯২০ সালে ইংরাজী অনুবাদসহ লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম 'লাল্লা-বাক্য'। উক্ত গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং আর ছাপান হয় না। লাল্লা শৈবযোগিনী ছিলেন। তাঁহার বাক্যাবলীর মধ্যে শৈব যোগের তত্ত্ব ব্যাখ্যাত আছে। লাল্লা চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূতা হন। মধ্যযুগে কাশ্মীর শৈব যোগের এত প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল যে, রামানুজাচার্য্য সুদূর দক্ষিণ ভারত হইতে কাশ্মীরে শৈব যোগমত খণ্ডনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। লাল দেদের বাক্য-গুলি কাশ্মীরী ভাষার প্রাচীনতম নমুনা। এইজন্য তাঁহার মূল বাক্যগুলি শব্দতত্ত্ববিৎ ও দার্শনিক উভয়েরই প্রয়োজনীয়। লাল্লা ছিলেন পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনী এবং

বিখ্যাত ফকিব সৈয়দ আলি হাম্‌দানির সমসাময়িক। ফকির আলি হাম্‌দানির প্রভাবেই প্রধানতঃ কাশ্মীর ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি সম্রাট্‌ কুতুবুদ্দিনের (১৩৭৭-১৩৯৩ খ্রীঃ) রাজত্বকালে ১৩৮০ খ্রীঃ কাশ্মীরে আসিয়া তথায় ছয় বৎসর অবস্থান করেন। হামদানির সহিত যোগেশ্বরী লাল্লার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। এইজন্য লাল্লার উদার এবং উচ্চ তত্ত্বপূর্ণ উপদেশগুলি কাশ্মীরী হিন্দু ও মুসলমান সকলের মুখে শোনা যায়। কাশ্মীরে এত প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, এইরূপ খুব অল্প প্রদেশেই পাওয়া যায়। মিঃ জে. হিণ্টন নোলেশ (J. Hinton Knowles) ১৮৯৫ খ্রীঃ বোম্বাই এবং লণ্ডন হইতে যে "Dictionary of Kashmiri Poverbs and Sayings" প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে অতি সুন্দর কাশ্মীরী প্রবাদ-বাক্য সংগৃহীত পাওয়া যায়। হিণ্টন্‌ নোলেশ সাহেবকৃত উক্ত অভিধানে লাল্লাব দশটী বাক্য পাওয়া যায়। লাল্লার বাক্যাবলী পদ্যে রচিত এবং অতি সুন্দব। লাল্লাব জীবনী সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা কাশ্মীবে প্রচলিত থাকিলেও অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। লাল্লা এক ভদ্র পবিবাবে বিবাহিতা হন। তাঁহাব শাশুড়ী তাঁহাকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন এবং প্রায়ই অনাহারে রাখিতেন। প্রত্যহ আহার প্রদানের সময় শাশুড়ী বধূকে এত অল্পাহাব দিতেন যে, তাহাতে লাল্লার উদরপূর্তি হইত না। কিন্তু লাল্লা সব সহ্য করিতেন এবং কোন দিন উহাব প্রতিবাদ বা প্রতিকাব করেন নাই। বিদ্বেষপ্রণোদিত হইয়া শাশুড়ী তাঁহাব চরিত্রেব বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পুত্রের কর্ণগোচব করিলেন। পুত্র গভীব রাত্রে লাল্লার অনুসন্ধানে গিযা দেখেন—লাল্লা দরজার অর্গল বন্ধ করিয়া স্বীয় গৃহে ধ্যাননিমগ্না! স্বামীর সকল সন্দেহ দূব হইল এবং স্বীয় পত্নীব প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহ'র হৃদয় পূর্ণ হইল। শাশুড়ী অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া অবশেষে পুত্রবধূকে স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থা হইলেন।

লাল্লা জীর্ণ বস্ত্রে রিক্ত, হস্তে গৃহত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসিনী হইলেন এবং কাশ্মীরের তদানীন্তন বিখ্যাত শৈব সাধু সিদ্ধমালুকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলেন এবং গুরুর আদেশে সন্ন্যাসিনীবেশে অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় ভজন গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অর্দ্ধনগ্নাবেশে নারীর বিহার করা উচিত নয়—এইরূপ কথা তাঁহাকে কেহ কেহ বলিলে তিনি বলিতেন—"যারা ঈশ্বরভীরু তারাই মানুষ, সেইরূপ মানুষের সংখ্যা নগণ্য।" একদিন ফকির সৈয়দ আলি হামদানিকে দূরে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি একজন মানুষ দেখিতেছি'। এই বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন এবং একটা রুটীর দোকানে জলন্ত উনানের মধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ফকির আসিয়া উক্ত দোকানের একটা নারীকে লাল্লাব কথা জিজ্ঞাসা করিলে নাবী ভয়ে সকল ঘটনা অস্বীকাব কবেন। কিন্তু ফকির ছাডিবার পাত্র নহেন। তিনি জিদ করিয়া সকল ঘটনা শুনিলেন। এমন সময় সেই দোকানের উপর হইতে লাল্লা স্বর্গের হরিৎবর্ণ পোষাকে সুসজ্জিতা হইয়া ফকিবেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! নবী এবং মুসলমান দরবেশগণেব মত লাল্লা ঈশ্ববেব গুণগাণ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ কবিতেন। লাল্লার বাক্য-গুলির কোন হস্তলিখিত পুঁথি এতাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯১৪ খ্রীঃ সার জর্জ গ্রীয়াবসন তাঁহাব সহকর্মী পণ্ডিত মুকুন্দরাম শাস্ত্রীকে লাল্লাবাক্যের পুঁথি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ কবেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত মুকুন্দবাম বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তখন সার জর্জ গ্রীয়াবসন গুষগ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্মদাস দববেশের নিকট হইতে তাঁহাব গ্রন্থে প্রকাশিত ১০৯টী বাক্য সংগ্রহ করেন। ধর্মদাস বলিলেন যে, তিনি কুলপরম্পরাক্রমে এই বাক্যগুলি পাইয়াছিলেন। গুষগ্রামটী সারদাতীর্থেব অদূবে এবং বাবামূলা হইতে ৩০ মাইল দূবে অবস্থিত। এই গণ্ডগ্রামে প্রাচীন পণ্ডিতগণের নিবাস, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা হইতে কাশ্মীরী ভাষা উৎপন্ন। এই জন্য লাল্লাবাক্যে অনেক প্রাকৃত শব্দ পাওয়া যায়। সার জর্জ গ্রীয়ারসনের গ্রন্থে লাল্লাবাক্যগুলি রোমান হবফে লিখিত। লাল্লার ৬০টী বাক্য মূল এবং সংস্কৃতানুবাদ সহ কাশ্মীর সবকারের প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ (শ্রীনগর) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্কৃত অনুবাদ পণ্ডিত রাজনক ভাস্কর কৃত। সার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) সংগৃহীত পুঁথি এবং গ্রন্থের লাইব্রেরী—যাহা অক্সফোর্ড ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটে আছে—তাহাতে লাল্লাবাক্যের দুইটী পুঁথি (সারদালিপিতে লিখিত) পাওয়া যায়।

ষ্টাইন সাহেবই 'রাজতরঙ্গিণী'র ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। সার জর্জ গ্রীয়ারসনের 'Kashmiri Dictionary' (এসিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত) এবং 'Manual of Kashmiri Grammar' (অক্সফোর্ড্ ক্লেয়ারিডন প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত) গ্রন্থদ্বয়ে কাশ্মীরী ভাষার স্বরূপ সবিশেষ জানা যায়। সারদালিপি সম্বন্ধে "Journal of Royal Asiatic Society, October, 1919 প্রবন্ধটী দ্রষ্টব্য।

লাল্লেশ্বরীর বাক্য অদ্যাবধি যত পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা সাত শতের অধিক হইবে না। সার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) এবং পণ্ডিত আনন্দ কাউল এবং পণ্ডিত এস. এন. চারাগী মহাশয়গণও অনেক বাক্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত চারাগী চার খণ্ড পুস্তিকায় লাল্লার বাক্য শ্রীনগর হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ডে মূল বাক্য এবং তাহার উর্দু অনুবাদ আছে। কেবলমাত্র ১ম খণ্ডে তিনি মূলের সহিত হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে মাত্র এক শত বাক্য আছে। ইহা হইতে কতিপয় বাক্যের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যাঁহার নাভিস্থান হইতে ওঁকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যিনি নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডবৎ বৃহৎ জ্ঞান করেন এবং যিনি এক অনাহত নাদেরই চিন্তা করেন তাঁহার হাজার মন্ত্রের কি প্রয়োজন?"

"যোগাভ্যাস দ্বারা যখন সংসারপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে লীন হয়, যখন সগুণ নির্গুণ বা শূন্যে প্রলয় প্রাপ্ত হয় এবং যখন শূন্যও মহাশূন্যে বিলীন হয় তখন একমাত্র অনাময় পরমাত্মাই থাকেন। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ, ইহা ধারণা কর।"

"লোকে আমাকে হাজার গালি দিক্, কিন্তু তাতে আমার মনে কোন খেদ হয় না। আমি শিবভক্ত। উত্তম আদর্শে (আয়নায়) ময়লা জমিয়া উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে?"

"অনাদি হইতে আমি এসেছি, অনন্তে আমাকে যাইতে হইবে। দিবারাত্রি আমি অনন্তের অভিমুখেই চলিয়াছি। আমি অনন্ত পথের যাত্রী। যে স্থান

হইতে আমি আসিয়াছি সেই স্থানেই আমাকে যাইতে হইবে। এই সংসার অনিত্য, অনিত্য, অনিত্য।"

"অসীম অতীতে আমিই ছিলাম, সুদূর ভবিষ্যতেও আমিই থাকিব। অনাদি কাল আমি আনন্দসাগরে নিমজ্জিত। জীবের জন্মমৃত্যু বন্ধ হয় না, কিন্তু জীব স্বস্বরূপে শিব। শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়।"

"প্রত্যেক নিঃশ্বাসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর। 'আমি', 'আমার' ভাব চিরতরে বিসর্জন দাও। ব্রহ্মতত্ত্বের ধ্যান কর। যিনি অহংভাব ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই জীবিত, অন্য সব ত অজ্ঞানাভিভূত ও মৃত। অহংভাব ত্যাগ কর—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ।"

"যিনি হাসেন, হাঁচেন, হাই তোলেন, কাশেন এবং সকল তীর্থে স্নান করেন এবং সর্বতীর্থে সদা বিরাজমান তিনি পরমাত্মা। তিনি তোমার অন্তরে আছেন। তাঁহাকে জান।"

"তিনি আছেন অন্তরে, কিন্তু আমি তাঁহাকে বৃথা খুঁজিলাম বাহিরে। তাই অন্তর্মুখী হইয়া ধ্যানেই জগৎ-ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে দর্শন করিলাম। তখনই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময় প্রতীত হইল।"

"যখন ওঁকার অন্তরে লয় হইল এবং শরীর জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করিলাম, এবং যখন ষষ্ঠ চক্র ছাড়িয়া সপ্তম চক্র সহস্রারে মন উঠিল, তখন লাল্লা অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিল।"

"হে ব্রাহ্মণ, বাহিরে কেন বৃথা তাঁহাকে খুঁজিয়া মরিতেছে? যদি বুদ্ধিমান্ হও ত অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনের বহির্দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া দাও। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ আলোকিত করিয়া শিব প্রকাশিত। বাহিরে যাইও না। আমার কথা বিশ্বাস কর।"

"যিনি গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী, তাঁহার কুশ, তিল, ফুল, চন্দন, দীপ, জল ও অন্যান্য পূজাদ্রব্যের আবশ্যক নাই। যিনি আন্তরিক আগ্রহের সহিত শম্ভুর সদা স্মরণ করেন, তাঁহার আর অন্য পূজার আবশ্যক নাই। স্মরণ মননই সত্য পূজা।"

"গুরুদত্ত মন্ত্রে যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, জ্ঞানরূপ লাগাম দ্বারা যিনি চিত্তরূপ অশ্বকে সংযত করিয়াছেন, তাঁহারই শান্তি লাভ হয়। তিনি জন্মমৃত্যুর অধীন হন না।"

"আমি আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হার মানিয়াছি। যখন ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া আপনাকে ভুলিলাম, তখন অমৃত ধামে পৌঁছিলাম। সেই অমৃত ধামে অমৃতপূর্ণ বহু ভাণ্ড আছে। সেই অমৃত পান করিতে পায় না।"

"আমি নাই, তুমি নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যান নাই। আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। তাঁহার চিন্তায় ডুবিয়া যাও। অন্য সবই মিথ্যা। মূঢ়গণ ইহার রহস্য বুঝিতে পারে না। দিন অতীত হইবে, আর রাত্রি আসিবে। পৃথিবী আকাশের সঙ্গে যুক্ত হইবে। অমাবস্যার রাত্রিতে অন্ধকার চন্দ্রকে গ্রাস করিবে। বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করাই শ্রেষ্ঠ শিবপূজা। ব্রহ্মরন্ধ্রকে যিনি শিবের স্থান বলিয়া জানেন, প্রাণবায়ুর প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যিনি অনাহত শব্দ শ্রবণ করেন, যাঁহার বাসনাসমূহ হৃদয়েই বিলীন হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা, তিনি ত শিবস্বরূপ। তিনি আবার কাহার পূজা করিবেন ?"

"সন্ন্যাসী পরমাত্মার সন্ধানে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায়। হে চিত্ত! তুমি নিরাশ হইও না। পরমাত্মা তোমার সন্নিধানে সমাসীন। শস্য-ক্ষেত্রকে দূর হইতে অধিকতর নীল দেখা যায়। আদর্শ (আয়না) হইতে ধূলা ঝরিয়া পড়ার ন্যায় যখন আমার মন হইতে ময়লা মুছিয়া গেল, তখনই পরমাত্মার প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। তখন হইতে আমাকে লোকে এত শ্রদ্ধাভক্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে আমার কি যায় আসে? হৃদয়কন্দরে পরমাত্মার দর্শনান্তে অনুভব করিলাম—তিনিই সত্য, তিনিই সব। আমি মিথ্যা। যিনি লোভ, কাম ও অহংকারের বশবর্তী তিনি নিজেই নিজের অধীন হইয়াছেন। যিনি সহজ ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট সংসার মৃত্তিকাতুল্য অসার বোধ হয়।

"মন তুমি অধীর হইও না। পরমাত্মা স্বয়ং তোমার চিন্তা করিতেছেন। কিরূপ তোমার জ্ঞান হইবে, কবে তোমার অতৃপ্তি দূর হইবে, সব তিনিই

ভাবিতেছেন। তুমি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। কালে তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

"চিদানন্দময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত। কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মমৃত্যুর চক্রে আরও গ্রন্থি সৃষ্টি করিতেছে।

"তিনবার আমি পূর্ণ সরোবর দেখিয়াছি। একবার উহাকে আকাশে অবস্থিত দেখিয়াছি, আর একবার হরমুখ পর্বত হইতে কৌসরনাগ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত দেখিয়াছি, আর সাত বার সংসারপ্রপঞ্চকে শূন্যে লয় হইতে দেখিয়াছি।"

লাল্লেশ্বরীর মুখনিঃসৃত কয়েকটি মূল বাক্যের (কাশ্মীরী ভাষায় রচিত) অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তন্ত্র গল্য তায় মন্ত্রস্বচে, মন্ত্রগোল তায় খতুয় চিত্ত।
চিত্ত গোল তায় কেংহ তি না কুনে, শূন্যস শূন্যাহ মীলিথ গব ॥১
ভান গোল তায় প্রকাশ আব জুনে, চন্দ্র গোল তায় শতুয় চিত্ত।
চিত্ত গোল তায় কেংহ তিনা কুনে, গয় ভূব ভূব স্বব মিলিথ কাথ ॥২
মূঢব ভীশিখ তু পশিথলাগ, জোব ত কোল শ্রোতবোন জডবপ্য আস।
যুস যিয় দপিয় তস ত্যুখ বোল, স্বয ছুয তত্ত্ববিদস অভ্যাস ॥৩
অব্যচারী পোথ্যান ছি হব মালি পবান, যিথ তোত পবান ত হীথা বাম পঞ্জরস।
গীতা পবান ত হীথা লভান, পবম গীতা ত পবান ছস।"৪

অনুবাদ—তন্ত্র লয় হইলে মন্ত্র থাকিবে। মন্ত্র লয় হইলে চিত্ত থাকিবে। চিত্ত বিলয় হইলে আর কিছুই থাকে না। তখন শূন্যে শূন্য মিলিত হয় ॥১ সূর্য্য অস্ত হইল ত চাঁদ উদিত হইল। চন্দ্র অস্তমিত হইলে চিত্ত থাকে। চিত্ত লয়প্রাপ্ত হইলে কিছুই থাকে না। তখন ভূঃ, ভূবঃ ও স্বর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মে লীন হয় ॥২ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূকের মত বিচরণ কর। সব দেখিয়াও অন্ধের মত থাক। সকল শুনিয়াও বধিরবৎ ব্যবহার কর। জড়বৎ জীবন যাপন কর। যে যা বলে সব মানিয়া লও। জ্ঞানী জগতে এইভাবে বাস করিয়া তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন ॥৩ হে তাত, পিঞ্জরস্থিত তোতাপাখী যেমন 'রাম,' 'রাম' বলে বিচারবুদ্ধিহীন ব্যক্তি সেইরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে অর্থাববোধ না করিয়াই। লোক-দেখানর জন্য তারা গীতা পড়ে। গীতা ত আমিও পড়েছি এবং এখনও পড়ি ॥৪

ছয়

মোক্ষমূলার *

বর্ত্তমান যুগে যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, ফ্রেডরিক মোক্ষমূলার তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রণী। অক্‌সফোর্ড্ হইতে উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি ঋগ্বেদের যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। সংস্কৃত শাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপান্তে বলিয়াছিলেন, বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পাশ্চাত্য জগতে বেদ প্রচারোদ্দেশ্যেই মোক্ষমূলার রূপে অবতীর্ণ। 'কবে তিনি ভারতে শুভাগমন করিবেন' স্বামিজীর এই প্রশ্নে বৃদ্ধ ঋষির নয়নযুগল আরক্তিম ও সজল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, 'তাহা হইলে আমার আর ফিরিয়া আসা হইবে না, তথায় আমার দেহ।ক ভস্মীভূত করিতে হইবে।'

মোক্ষমূলার জাতিতে জার্ম্মাণ এবং জীবনের অধিকাংশ কাল অক্সফোর্ডে অতিবাহিত করেন। তিনি ১৮২৩ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর জার্মাণীতে জন্মগ্রহণ ...রেন। প্রসিদ্ধ জার্মাণ গীতিকাব্যলেখক উইলহেল্‌ম মূলার ছিলেন তাঁহার ...তা। দেশাউ নামক স্থানের ডিউকের প্রধান মন্ত্রী ভন বেশডাউয়ের কন্যা ছিলেন তাঁহার মাতা। ১৮৪১ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া ফ্রেডরিক লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রোকাস তাঁহাকে সংস্কৃতাধ্যয়নে প্রবৃত্ত করেন। তাঁহার সমগ্র জীবন সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনেই ব্যয়িত হয়। ১৮৪৪ খ্রীঃ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক শেলিংয়ের বক্তৃতাবলী শ্রবণেই তিনি উপনিষৎ পাঠে আকৃষ্ট হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বপ্ (Bopp) কর্ত্তৃক তিনি তুলনামূলক ভাষা-

---

*প্রবর্ত্তক, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

তত্ত্বের অধ্যয়নে উৎসাহিত হন। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ণফের নিকট সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষার শিক্ষাকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষার প্রেরণা পান। ঋগ্বেদের একটী সুসম্পাদিত সংস্করণের জন্য বার্ণফ তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। ব্যারণ বুনসেন এবং অধ্যাপক উইলসনের অনুরোধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উক্ত পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়-বহনে স্বীকৃত হওয়ায়, এই কার্য্যের জন্য তিনি ১৮৪৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৯০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত অক্সফোর্ডে স্থায়ীভাবে নিবাস করেন।

ব্যারণ বুনসেনের দ্বারা মোক্ষমূলার অচিরে ইংলণ্ডের রাণী ও রাজকুমার-দম্পতীর সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা এই জার্ম্মাণ পণ্ডিতের সাহিত্যসাধনায় বিশেষ সহায়ক হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট হইবার পর তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সহিত পরিচিত হন। ১৮৫০ খ্রীঃ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সহকারী অধ্যাপক, চারি বৎসর পরে অধ্যাপক এবং ১৮৫৬ খ্রীঃ অক্সফোর্ডের জগদ্বিখ্যাত বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর কিউরেটার নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী বৎসরে তিনি এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজের অনারারি ফেলো এবং ১৮৫৮ খ্রীঃ অল সোলস্ কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। অক্সফোর্ডে প্রথম প্রথম তিনি কর্ত্তৃপক্ষের গুণগ্রাহিতার অভাব ও ঔদাসীন্যে উৎপীড়িত হইতেন। ব্যারণ বুনসেনকে তিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর এক পত্রে তাঁহার মনোবেদনা এইভাবে জ্ঞাপন করেন—'এই যুগে বিদ্যোৎসাহ ও বিজ্ঞানপ্রীতির এত অভাব যে, গবেষণার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন না। সেইজন্য নূতন কিছু করিবার আগ্রহ হয় না এবং সব ছাড়িয়া বিশ্রাম ও অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ মোক্ষমূলার অক্সফোর্ডে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি 'প্রাচ্যের ধর্ম্মগ্রন্থ' নামক তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন ও সম্পাদন আরম্ভ করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ তিনি জার্ম্মাণীর ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। এই সকল বক্তৃতার জন্য যে অর্থ তিনি পান, তাহার দ্বারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকপদ তিনি স্থাপন

করেন। মোক্ষমূলার ১৮৯২ খ্রীঃ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সভাপতি হন। এই দুই কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য অক্সফোর্ড ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি অক্সফোর্ডেই নিবাস করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ তিনি প্রিভিকাউন্সিলের সভ্যপদ প্রাপ্ত হন এবং ১৯০০ খ্রীঃ ২৯শে অক্টোবর পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করেন।

মোক্ষমূলারের পুত্র পিতার যে জীবনী ইংরাজিতে লিখিয়াছেন, তাহা দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থে মোক্ষমূলারের জীবনীর বহু চিত্তাকর্ষক তথ্য আছে। অধ্যাপক অতিশয় অমায়িক ও প্রেমময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনীলেখক বলেন, পিতা জীবনে যত ভাল জিনিয বা সম্মান পাইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীকেই তিনি ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজেকে এই সকল দানের অযোগ্য ভাবিতেন। কানন ফাযারের মতে, মোক্ষমূলার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞান সংস্থাপন এবং পাশ্চাত্যে সংস্কৃত পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেন। তিনি ঋগ্বেদের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে মোক্ষমূলার তাঁহার জীবন-স্মৃতির শিক্ষনীয় ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন' "পিতার সাফল্যের প্রকৃত কৌশল ছিল নিজের মধ্যে, তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে নহে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জীবনের সফলতা বা বিফলতা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষার এমন একাগ্রতা ছিল যে, যাহা তাহার জীবনের নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে, তাহা তিনি বিষবৎ ত্যাগ করিতেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন।" মোক্ষমূলার তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—'শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতির আলোকে এখনও দেখি স্নেহময়ী জননীর মুখ, পিতার করুণ নয়ন, ফুলের বাগান, দ্রাক্ষাদি ফল-বৃক্ষশোভিত উদ্যান, হরিৎবর্ণের তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র এবং একখানি পুরান ছবির বই।" ব্যবহারিক জগতের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার শৈশবের সোণার স্বপ্ন ভগ্ন হওয়ার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "এই সহানুভূতিশূন্য সংসারের শীতল বায়ুর প্রথম স্পর্শে যদি

হৃদয় দুঃখভাবাক্রান্ত না হইত, তাহা হইলে জীবন স্বর্গের স্বপ্নে পূর্ণ হইত। দিব্যজ্যোতির মত যদি মাতাপিতার করুণ নয়ন হইতে অরুণালোক সন্তানের উপর ঝরিয়া না পড়িত, তাহা হইলে মানুষ বাঁচিত না।" যৌবনের ও ছাত্রজীবনের স্মৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, স্কুলের এবং প্রথম কয়েক বৎসরের কলেজের আনন্দময় জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবনে বহু সোণার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু একটী জিনিষ অবিচালিত রহিল' ভগবানে ও মানুষে বিশ্বাস।" জনৈক সমালোচককে তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল' "আমি সামান্য বৃদ্ধ অধ্যাপক। আমার বয়স এখন বাহাত্তোর বৎসর হইলেও, আমি উৎসাহে যুবক'। তোমার মতই রিক্ত হস্তে আমি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম। অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই ধনসম্পৎপূর্ণ অক্সফোর্ডে এবং লণ্ডনে থাকিয়াও আমি ধনী হইতে পারি নাই। ধনার্জ্জন আমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। জ্ঞানার্জ্জন ছিল জীবনের একান্ত বাসনা। সেই বাসনা আমি সাধ্যমত পূর্ণ করিয়াছি। তাহার ফলে যে তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের পরম সম্পদ্। তেত্রিশ বৎসর বয়সে আমি বিবাহিত হই। আমার একমাত্র সন্তান এখন কনস্টান্টিনোপলস্থিত রাজদূতের সেক্রেটারী। আমার যে দুইটী কন্যা হারাইয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে আমি নীরব থাকিব। আমার একমাত্র জীবিত কন্যা বিবাহিতা এবং সে চারিটী সন্তান-রত্নলাভে ধন্যা। সমগ্র জীবন আমি অতীতের গবেষণায় নিমগ্ন। আমি ভাষাতত্ত্ববিৎ। ইতিহাসও আমি অধ্যয়ন করিয়াছি, বিশেষতঃ মানবজাতির বিভিন্ন ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারাবাহিকরূপে আমি পড়িয়াছি। এইজন্য প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষাগুলিকে গভীরভাবে চর্চ্চা করিয়াছি।" জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি অন্য এক স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, সফলতা নহে, সত্যান্বেষণই ছিল তাঁহার জীবনব্রত।"

মোক্ষমূলার আজীবন প্রকৃত পণ্ডিতের মতই কাটাইয়া গিয়াছেন। সুপণ্ডিত হইলেও, তাঁহার স্বভাব নীরস ছিল না; উহা সরল ও ভদ্র ছিল। সারা জীবন

হিন্দু ধর্মের অনুধ্যান করিয়া তাঁহার চরিত্রটী মধুময় হইয়া গিয়াছিল। ১৮৪৯ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই তাঁহার গর্ভধারিণীকে একটী পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "পার্থিব জীবন অদীর্ঘ ভ্রমণ মাত্র। ভ্রমণে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী জিনিষ হইলে চলে। জীবনে যে সকল বস্তু খুব দরকারী মনে হয়, তাহার অধিকাংশই অনাবশ্যক।" ১৮৫৬ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবরে তাঁহার স্বীয় জননীকে লিখিত পত্রে আছে—"যাঁহাদের দৃষ্টি ঈশ্বরে নিবদ্ধ, যাঁহাদের মন অনন্তমুখী, তাঁহাদের নিকট দীর্ঘতম জীবনও অদীর্ঘ মনে হয়। বিশ্বাস, আশা ও প্রীতির সহিত একটু অপেক্ষা করিলে, এই সত্য অচিরে উপলব্ধ হইবে। এই তিনটীই স্থায়ী হয়। এই তিনটীর মধ্যে প্রীতিই শ্রেষ্ঠ।" ১৮৬৪ খ্রীঃ ১৭ই জুন সহধর্ম্মিণীকে এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন—'ইহ-জীবনে অসুখী হওয়াই মহাপাপ। আমাদের অনেক দুঃখ আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদের বহু দুঃখ নিবারণ করিতে পারি। পরস্পরের কল্যাণচিন্তা করিলে সহজে সুখী হওয়া যায়।" ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৭শে আগষ্ট তিনি তাঁহাকেই লিখিয়াছিলেন—"স্বর্গের দিকে তাকাইলে পৃথিবীর দুঃখ উড়িয়া যায়, এমন কি মৃত্যুর ভয়ও থাকে না।" থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল অলকটকে ১৮৯৩ খ্রীঃ ১০ই জুন তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি যদি আপনার কোন কাজে আসিতে পারি, আমি সদাই আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার বহু নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমি এখনও মানুষে বা সত্যের শেষ জয়ে বিশ্বাস হারাই নাই।"

মোক্ষমূলার ভারতে না আসিলেও, ভারতকে তিনি ভারতবাসীর ন্যায় স্বীয় জন্মভূমিতুল্য ভালবাসিতেন। ভারত সম্বন্ধে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতাবলী দিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের নাম "ভারত—ইহা আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারে?" এই বইখানি প্রসিদ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। হিন্দুর সত্যনিষ্ঠ চরিত্রচিত্রনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যবসিত। সংস্কৃত সাহিত্যের যে বিশ্বজনীন মূল্য আছে, তাহা তিনি এই গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ভারতে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এমন আশ্চর্য্য সংযোগ আছে যে, পুনঃ পুনঃ

সামাজিক বিপ্লব, ধর্ম্ম-সংস্কার ও বৈদেশিক আক্রমণ সত্ত্বেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃতই বিশাল ভারতের সর্ব্বত্র কথিত হয়। সংস্কৃতকে যত মৃত মনে করা হয়, ইহা তত মৃত নহে। ভারতের আর্য্য ও দ্রাবিড় প্রভৃতি সকল জীবিত ভাষা সংস্কৃত হইতে এখনও তাহাদের জীবনীশক্তি গ্রহণ করে। প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্মই ছিল প্রাণ।" মোক্ষমূলার বলেন, "ভারতের প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট ধর্ম্মই ছিল সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা। তাহাদের পূজা ও উপাসনা, দর্শন ও নীতি, আইন ও শাসন সবই ধর্ম্ম-মূলক ছিল। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম ছিল দর্শনের পরিণতি, ধর্ম্ম কখনও দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতেও ধর্ম্ম বিষয়ে বেদ অপেক্ষা উচ্চতর প্রমাণ নাই। যতকাল ভারত থাকিবে, ততকাল ইহার বেদভক্তি বিলুপ্ত হইবে না। বাল্যকাল হইতে প্রত্যেক হিন্দু এই বেদ-ভক্তিতে দীক্ষিত হয়। এই বেদপ্রীতি পৌত্তলিকের বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনায়, দার্শনিকের দর্শনচিন্তায় এবং ভিক্ষুকের প্রবাদে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতি-প্রদত্ত সম্পদ্, শক্তি ও সৌন্দর্য্যে পরিমণ্ডিত, মর্ত্ত্যে স্বর্গতুল্য এমন একটী দেশের জন্য যদি আমাকে সারা পৃথিবী খুঁজিতে হয়, আমি ভারতের দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিব। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—কোন দেশে কতকগুলি মানসিক শক্তির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হইয়াছে এবং লোকে মানবজীবনের সর্ব্বোত্তম সমস্যাগুলির গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে, যাহা কাণ্ট ও প্লেটোর দর্শন অধ্যয়নকারীর অবগত হওয়া কর্ত্তব্য, আমি ভারতের নামই করিব। এবং যদি আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি—কোন সাহিত্য হইতে ইউরোপীয় আমরা গ্রীক, রোমান ও ইহুদী চিন্তায় পরিপুষ্ট হইয়াও নূতন আলোক পাইতে পারি, যাহা আমাদের অন্তর জীবন অধিকতর পরিপূর্ণ, পরিপুষ্ট ও সার্ব্বজনীন করিবার জন্য বিশেষ আবশ্যক এবং যাহা আমাদের জীবনকে আদর্শ, অনন্ত জীবনে পরিণত করিতে পারে, আমি ভারতকেই নির্দ্দেশ করিব।"

মোক্ষমূলার-সম্পাদিত "প্রাচ্য ধর্ম্মগ্রন্থাবলী" ৫১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথম খণ্ড ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১২ খানি প্রধান ও প্রাচীন

উপনিষদের প্রাঞ্জল ইংরাজী অনুবাদ আছে। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় মোক্ষমূলার বলেন, "উপনিষদ্‌বাজি বিশ্বসাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। যে কোন দেশে, যে কোন কালে মানবমনের যে সকল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইগুলি পরিগণিত হইবে।" ভারতের ষড় দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয়। ইহার ভূমিকাতে আছে, 'মানবীয় চিন্তা সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বেদান্তে'। তাঁহার মতে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত; একটাকে অধ্যয়ন করিলে, অপরটী বোঝা যায়। তিনি বলেন, "বেদের ব্রাহ্মণসমূহের কোন কোন অধ্যায়ে এবং উপনিষদে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও মানসিক চিত্র পাওয়া যায়। তাহার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, ভারত প্রাচীন কাল হইতে দার্শনিক জাতি।"

সায়নাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদের যে ভাষ্য আছে, তাহার নাম মাধবীয়-বেদার্থ-প্রকাশ। উক্ত ভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ মোক্ষমূলার অক্সফোর্ড হইতে কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করেন। উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রীঃ। তৎপূর্ব্বে ডাঃ এফ রোসেন ঋগ্বেদের একটী সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এই প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় নাই। রোসেনের পরেই বার্ণফ ইউরোপে বেদাধ্যয়ন সংরক্ষণ করেন। ই বার্ণফ ছিলেন এফ রোসেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্যারিসস্থিত কলেজ ডি ফ্রান্সের সংস্কৃতাধ্যাপক। মোক্ষমূলার, বার্থেলোমি, গোরেসিও, নেভি' পেভি, ফুকো, রথ, গোল্ডষ্টুকার, বার্জোলি প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞগণ বার্ণফের ছাত্র ছিলেন। বেদাধ্যয়ন ও বেদপ্রকাশের মূল প্রেরণা বার্ণফের নিকটেই মোক্ষমূলার লাভ করেন। মোক্ষমূলারের মতে বৈদিক ভাষা ও ভাবের সহিত বার্ণফের যেমন প্রগাঢ় পরিচয় ছিল, এমনটী ইউরোপের অন্য কোন পণ্ডিতের ছিল না। ইউরোপে বার্ণফই প্রথম পালিপণ্ডিত এবং জেন্দাবেস্তার প্রথম সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতা। প্রাচ্য ধর্ম্মসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং মানবজাতির আদিম ইতিবৃত্তের প্রকৃত মূল নির্দ্ধারণের জন্য বেদাধ্যয়ন অপরিহার্য্য, এই ভাবটী বার্ণফ

মোক্ষমূলারপ্রমুখ তাঁহার ছাত্রগণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করেন। অক্সফোর্ড হইতে মোক্ষমূলার-সম্পাদিত বেদ সম্পূর্ণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণি হইতে রথ কর্ত্তৃক যাস্কের নিরুক্ত প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সের অধ্যাপক ই বার্ণফ ও আলেকজাণ্ডার ভন হামবোল্ডট্ এবং ইংলণ্ডের এইচ. এইচ. উইলসন ও চেভেলিয়ার বুনসেন মোক্ষমূলারকে বেদপ্রকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। উইলসন ছিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ। তাঁহার মধ্যস্থতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টার্স বেদপ্রকাশের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন।

বেদপ্রকাশের পথে মোক্ষমূলারকে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। অক্সফোর্ড, লণ্ডন, প্যারিস ও বার্লিন প্রভৃতি সহরের বিখ্যাত লাইব্রেরীসমূহে কয়েক বৎসর অন্বেষণ করিয়া তিনি অতি কষ্টে বেদের সংহিতা ও ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তৎপরে বহু পাণ্ডুলিপি-তুলনান্তে একটা বিশুদ্ধ মূল গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে বেদরচনার অন্ততঃ ত্রিশ শতকের পরে বেদভাষ্য রচিত হইলেও সায়নাচার্য্য বেদের মূলভাব যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা বেদের কোনও প্রকার (ভাবগত বা ভাষাগত) পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। তিনি বলেন "Sayana, though the most modern, is on the whole, the most sober interpreter. Where he has no authority to mislead him, his commentary is at all events rational" গীতার উপর সূর্য্য পণ্ডিতের 'পরমার্থ প্রভা' নামক এক টীকা আছে। উক্ত টীকায় উল্লিখিত আছে যে, তিনি নাকি রাবণপ্রণীত ঋগ্বেদভাষ্য দেখিয়াছেন। মোক্ষমূলার বলেন, "যজুর্ব্বেদের কোন শাখার উপর রাবণের এক টীকা আছে। রাবণরচিত দু'একটি দেবীস্তোত্রও দেখা যায়। মোক্ষমূলার বেদ সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, "ইণ্ডো-ইউরোপীয় জগতে বেদই প্রাচীনতম সাহিত্যিক স্তম্ভ। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের মৌলিক গবেষণায় বেদাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ গ্রন্থ জগতে আর নাই। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ভারতীয় মনের ঐতিহাসিক বিকাশের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিবে। হোমার ব্যতীত গ্রীক সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ, কোরাণ ব্যতীত আরবীয়

সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ এবং সেক্সপীয়র ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ, বেদ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যও তেমনি অসম্পূর্ণ। বেদাধ্যয়নে জানা যায় যে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাগুলি ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত। ভাষার ইতিহাসের অন্ধতম প্রদেশে বেদ উজ্জ্বল আলোকপাত করে। প্রাচীন জাতিসমূহের অজ্ঞাত ইতিবৃত্তের বহু তথ্য বেদ হইতে জানা যায়। বেদই প্রাচীন পারস্তবাসিগণের ধর্ম্মপ্রথাবলীর আদি উৎস। দেবিয়াস ও জার্ক্সেসের তীরচিহ্নিত শিলালিপির অবোধ্য শব্দগুলির অর্থ বেদের সাহায্যেই আবিষ্কৃত। বেদের কবিত্বপূর্ণ ভাষার সহিত তুলনায় গ্রীস, ইতালি, জার্মানি ও আইসলাণ্ডের পুরা কাহিনীর অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর্য্যজাতিসমূহেব আধুনিক ইতিহাসে যে সামাজিক বিধি, স্থানীয় প্রথা ও প্রাবাদিক ভাবদৃষ্ট হয়, তাহাদেব অপ্রত্যাশিত অভিনব ব্যাখ্যা বেদের সরল কবিতায় আছে।" মোক্ষমূলাব তৎসম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় যে মূল্যবান কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়, তিনি দ্বিতীয় সাযন এবং বেদ প্রচারকল্পে ইউরোপে অবতীর্ণ। পাশ্চাত্যে বেদপ্রচাব. করিয়া তিনি হিন্দু জাতিব যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা যথাযথ উপলব্ধি করি নাই।

মোক্ষমূলাব বহু গ্রন্থ বচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসখানি' আমাদেব অবশ্য পাঠ্য। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, বৈদিক যুগের সাহিত্য বিশেষ অধ্যযন ব্যতীত ভারতীয় ধর্ম্ম, নীতি ও সাহিত্যের জ্ঞান নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থাকিবে। ১৮৯৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউটে বেদান্ত সম্বন্ধে তিনটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন—"যদি শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া দর্শনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই প্রস্তুতির সহায়ক বেদান্ত অপেক্ষা অন্য দর্শন নাই। বেদান্ত ঈশ্বর ও মানুষ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ব্রহ্ম ও আত্মা সংযুক্ত করে। বেদান্তের কর্ম্মবাদ অতি অপূর্ব্ব। বর্ত্তমান জীবনের দুঃখ-সহনে এবং দুঃখ-দূরীকরণে কর্ম্মবাদ অতুলনীয়। 'চিন্তাতত্ত্ব' নামক পুস্তকে তিনি বলেন, "ইংরাজি, লাটিন বা গ্রীক ভাষায় এমন শব্দ বা ভাব নাই, যাহা সংস্কৃত ধাতুলব্ধ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। ইংরাজি

অভিধানে মাত্র আড়াই লক্ষ শব্দ আছে। পাণিনীয় ধাতু সমূহ দ্বারা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী শব্দ তৈয়ার করা যায়। পাণিনীয় ব্যাকরণের মত ব্যাকরণ অন্য কোন ভাষায় নাই।" মোক্ষমূলার একখানি গ্রন্থে তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণের স্মৃতি-সঞ্চয় করিয়াছেন। তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুব, বাধাকান্ত দেব, নীলকণ্ঠ গোরে, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, দয়ানন্দ সবস্বতী, বেরামজী মালাবারী, পণ্ডিতা রমাবাই, আনন্দীবাই যোশী, গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্কর ওঝা প্রভৃতি তাহার ভারতীয় বন্ধুগণের প্রীতিপূর্ণ প্রশংসা আছে। তৎসম্পাদিত ঋগ্বেদেব দ্বিতীয় সংস্করণেব খরচ বিজযনগরের মহারাজা বহন কবেন। সেইজন্য উক্ত গ্রন্থ তাঁহাকেই তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, বেদভাষ্যকার সায়ন বিজয়নগর বাজাব মন্ত্রী ছিলেন। মোক্ষমূলার ভারতীয় চবিত্র সম্বন্ধে যে উচ্চ মত পোষণ কবিতেন, তাহা স্পষ্ট ভাষায নানাভাবে ব্যক্ত কবিয়াছেন। 'জার্মাণ কারখানার টুকরোরাশি' নামক গ্রন্থে মোক্ষমূলার বলেন "ভাবত ব্যতীত অন্য কোন দেশে অপৌরুষেযবাদ এত পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই।" ঋগ্বেদে (২-৪৭-৪) ঋষিগণ বলিতেছেন যে, মন্ত্রগুলি দেবদত্ত। মোক্ষমূলার ঋগ্বেদের এই বাক্যটী উদ্ধার করিয়া অপৌরুষেয়বাদকে সমর্থন করিযাছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকটে রামকৃষ্ণ পবমহংসদেবের জীবনী ও বাণী শ্রবণে মোক্ষমূলার এই মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামীজিব নিকট হইতে পরমহংসদেবের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া তিনি ইংবাজিতে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "ভাবত ধর্ম্মসাধক ও ধর্ম্মসংস্কারককে পৃথক্ রাখিয়াছেন। ভারতে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারক অপেক্ষা রামকৃষ্ণ প্রমুখ ধর্মসাধকগণ সমধিক সমাদৃত।" কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকিয়াও তিনি ভারতের ধর্ম্মান্দোলন নিরীক্ষণ করিতেন এবং কেশবচন্দ্রের যখন ধর্ম্মমতের পরিবর্তন ঘটিল শ্রীবামকৃষ্ণের সংস্পর্শে, তখন হইতেই তিনি দক্ষিণেশ্বরের সাধকের কথা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার হওয়ায় তিনি পরমানন্দিত হন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অক্সফোর্ডের কয়েকটী কলেজ ও বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী দেখান

এবং স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামীজিকে ভোজন করান। রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত তিনি স্বামিজীর সঙ্গে আসেন। এত দূর আসিতে নিষেধ করায় মোক্ষমূলার বলেন, "রোজ ত আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় না!" স্বামিজীর নিকট যখন বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপক শুনিলেন যে, ভারতের হাজার হাজার নরনারী রামকৃষ্ণকে পূজা করেন, তখন তিনি বলিলেন, "এইরূপ মহাপুরুষকে পূজা করিবে না ত আর কাহাকে করিবে?"

স্বামী বিবেকানন্দ এই জার্মাণ বেদবিৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উহার কিয়দংশ পাঠককে উপহার দিয়া আমরা এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। স্বামিজী লিখিয়াছেন—"কি অসাধারণ লোক অধ্যাপক মোক্ষমূলার! উদ্যান-বেষ্টিত সুন্দর ছোট বাড়ীতে এই সুপণ্ডিত পুস্তকরাশির মধ্যে উপবিষ্ট। পক্ককেশ ঋষির মুখটী প্রশান্ত ও গম্ভীর। সত্তরটী শীতকাল তাঁহার কপালে আঘাত করিলেও উহা এখনও শিশুর কপালের মত কোমল ও উজ্জ্বল। তাঁহার মুখের প্রত্যেক রেখাটী গভীর আধ্যাত্মিকতাব্যঞ্জক। তিনি যেন বশিষ্ট, আর তাঁহার কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবনের সঙ্গিনী যেন অরুন্ধতী—তাঁহার গৃহের বৃক্ষ, পুষ্প, শান্তভাব ও নির্ম্মলাকাশ আমাকে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাঁহার মধ্যে ভাষাতত্ত্ববিৎ বা পণ্ডিতকেই আমি দেখি নাই; দেখিয়াছি এক ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি, যিনি ধীরে ধীরে ব্রহ্মদর্শনের সম্মুখীন হইতেছেন। শুষ্ক শব্দারণ্যে তিনি নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই। 'আত্মাকে জান'—এই সঙ্গীতের সুরে যেন তিনি অভিভূত। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ও বিদ্বান্ হইয়াও তিনি তত্ত্বানুভূতির দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। অপরা বিদ্যা তাঁহাকে পরা বিদ্যার অর্জনে সাহায্য করিয়াছে। বিদ্যা বিনয় প্রদান করে—এই নীতিবাক্য মোক্ষমূলারের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।"

"ভারতের প্রতি তাঁহার কী গভীর প্রেম! সেই প্রেমের শতাংশ যদি আমার থাকিত মাতৃভূমির প্রতি! তিনি এক অসাধারণ পুরুষ, এক তীব্র কর্ম্মী। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বা ততোধিক কাল ভারতীয় চিন্তাজগতে তিনি নিবিড়ভাবে বাস করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অসীম অরণ্যে তিনি

আজীবন বিচরণ করায়, তাঁহার হৃদয় ও মন ভারতীয় ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহাকে এক বৈদিক ঋষিতে পরিণত করিয়াছে। মোক্ষমূলার খাঁটী বৈদান্তিক—বেদান্তের প্রকৃত ভাবের প্রতিমূর্ত্তি। ভারতীয় চিন্তা-গগনে যে নতুন তারকা উদিত হয়, তাহা ভারতবাসিগণ বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য ঋষি তাহা নিরীক্ষণ করেন। তিনি পৃথিবীর কল্যাণস্বরূপ। পাশ্চাত্যে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি যে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রদ্ধা দেখা যায়, তাহা মোক্ষমূলারের আজীবন পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মধুময় ফল।"

যে মহাপুরুষ ভারতের এত উপকার করিয়াছেন, পাশ্চাত্যে ভারতের সংস্কৃতি-প্রচার ছিল যাঁহার জীবনব্রত, আমরা তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছি! কই, এখন ত ভারতের কোন শিক্ষা বা সংস্কৃতিপ্রতিষ্ঠান এই জার্মাণ ঋষির স্মৃতিরক্ষাকল্পে কোন ব্যবস্থা করে নাই? মোক্ষমূলারের নামে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী অধ্যাপকপদ সৃষ্ট হওয়া উচিত।

সাত

দাদুদয়াল *

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন সন্ত দাদুদয়াল সম্বন্ধে যে বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষার একখানি অমূল্য পুস্তক। গত বৎসর প্রায় সাত আট মাস রাজপুতানার নানাস্থানে পর্যটনকালে দেখিয়াছি' দাদু-সাহিত্য বিশাল। দাদু ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণের গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিলে একটী আলমারি পূর্ণ হইবে। দাদু ছিলেন কবীর-পুত্র কামালের শিষ্য। বস্তুতঃ দাদুদয়ালই কবীরের প্রকৃত শিষ্য। দাদুবাণী কবীরবাণীর ভাষ্যস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উভয় মহাপুরুষ ছিলেন মুসলমান-বংশ-সম্ভূত এবং হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্মের মিলনের পক্ষপাতী। মধ্যযুগে যখন ইসলাম-

* উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৫২।

প্রভাবে ভারতবর্ষ কম্পিত, তখন এই মহাপুরুষদ্বয় আবির্ভূত হইয়া উদাত্ত সুরে মিলন-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। কবীর-পন্থ ও দাদু-পন্থ নামে দুইটী পৃথক সম্প্রদায় আছে।

১৫৪৪ ঈশাব্দের ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দাদুর জন্ম হয় এবং ষাট বৎসর বয়সে ১৬০৩ ঈশাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী শনিবার তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি আহমেদাবাদে কোন দরিদ্র ধুনকার বা মুচীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে তাঁহার জন্মস্থান কাশীর নিকট জৌনপুরে। আজমীরের নিকটবর্তী নরানা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। নরানাতে দাদুপন্থী সাধু ও ভক্তগণের প্রধান মন্দির ও গদী আছে। মন্দিরের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ পূজিত হয়। ওখানে প্রতিবৎসর ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্থী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বিরাট মেলা হয়। তখন দাদুপন্থী শত শত সাধু এই স্থানে মিলিত হন। উদাসী সাধুদের মত ইঁহারা গেরুয়াধারী ও বেদান্তবাদী। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে দাদুর গুরুলাভ হয়। গুরুদত্ত সাধন লইয়া তিনি কয়েক বৎসর তন্ময় থাকেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশাদির অন্তর্গত নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত আসেন। তিনি এই ভ্রমণকালে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত হন। ত্রিশ বৎস বয়সে তিনি তাঁহার সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং উহার নাম রাখেন পরব্রহ্ম সম্প্রদায়। উক্ত সম্প্রদায় মূর্তিপূজাবিরোধী ও নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মে বিশ্বাসী। দাদু বলেন—

ব্রহ্মকো খণ্ড খণ্ড করি পশি পশি লিয়া বাঁটী।
দাদু পুরণ ব্রহ্ম তাজি বান্ধে ভরম কী গাঁঠী॥

অনুবাদ—বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় পূর্ণ ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাঁটিয়া লইয়াছে, তাহারা পূর্ণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া ভ্রমের গাঁঠী বাঁধিতেছে। চল্লিশ বৎসর বয়সে দাদুর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়। সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহার দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে আসিতে থাকেন। সম্রাট্ আকবরের সহিত তাঁহার মিলন এবং চল্লিশ দিনব্যাপী ধর্মপ্রসঙ্গ হয়। দাদু বিবাহিত ছিলেন এবং তাহার দুইটী কন্যাও ছিল। কন্যাদ্বয় বিবাহ করেন নাই এবং ঈশ্বরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। কন্যা

দুইটীর সাধনার স্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। দাদূ যখন আমেরে ছিলেন, তখন মানসিংহের পিতা জয়পুরের রাজা ভগবন্তদাস দাদূর আশ্রম পরিদর্শনে আসিয়া কন্যাদ্বয়কে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা বিবাহ কর নাই কেন?" উত্তর আসিল, সন্ত কবীরের ইষ্টকে তাঁহারা পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।

দাদূর গুরুলাভ সম্বন্ধে একটী চমৎকার ঘটনা প্রচলিত আছে। এক অপরাহ্নে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। দাদূ মাথা নীচু করিয়া আনমনে মোট সেলাই করিতেছেন। তখন তিনি দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালকমাত্র। কিন্তু তাঁহার মন সেদিন কিছুতেই কাজে লাগিতেছে না। হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন, কবীরপুত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ কামাল তাঁহার কুটীরের বহির্দেশে দাঁড়াইয়া বৃষ্টি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেছেন। দাদূ সশ্রদ্ধভাবে কামালকে কুটীরের মধ্যে আনিয়া যে চামড়াটী তিনি সেলাই করিতেছিলেন তাহাই তাঁহাকে বসিতে দিলেন। কামালের চোখে জল আসিল। তাহা দেখিয়া দাদূ ভাবিলেন—কামাল হয়তো কোন কারণে তাহার প্রতি দুঃখিত হইয়াছেন। দাদূ সাশ্রুনয়নে বলিলেন—আমার এই চামড়াখানা ব্যতীত অন্য কোন আসন ছিল না। তাই উহা আপনাকে দিয়াছি, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। কামাল দাদূর হৃদয়বেদনা ও সরলতায় অভিভূত হইয়া বলিলেন—"না দাদূ, আমি সেই জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেছি না। প্রভু আমাদের হৃদয়দ্বারে যুগযুগান্তর ধরিয়া বসিয়া আছেন। আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া হৃদয়াসন দিতেছি না, যেমন তুমি আমাকে সাদরে আসন দান করিলে।" দাদূর নব জীবন আগতপ্রায়। তাঁহার হৃদয় অজ্ঞাত প্রভুর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কামালের নিকট জগৎপ্রভুর তত্ত্ব শুনিয়া ও তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। কামাল দাদূর উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে সাধনার অঙ্কুরিত বীজ রোপণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। দাদূ সাধনলাভ করিয়া অভ্যাস-যোগে মগ্ন হইলেন। তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় বন্ধ হইল। তিনি পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। দাদূকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত তোমার গুরু কে? তিনি বলিতেন—

দাদূ অলহ রাম্‌কা দোনোঁ পথ তৈঁ ন্যারা।
রহিতা গুণ আকার কা সো গুরু হমারা॥

অর্থাৎ—আমার গুরুর কোন গুণ বা আকার নাই ; তিনি আল্লা ও রাম এই দুই পক্ষেরই অতীত। দাদূ মন্ত্রগ্রহণ কালেই ইষ্ট দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রগ্রহণকালে তিনি গুরুকৃপায় কা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দাদূ ছিলেন অসাধারণ ভক্ত-কবি। তাঁহার মধুর ভাষায় তিনি গুরু-মাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

সতগুরু অংজন বাহি করি, নৈন পটল সব খোলে।
বহরে কানৌ সুননে লাগে, গূংগে মুখ সৌ বোলে॥
সতগুরু কিয়া ফেরি করি, মনকা ঔরৈ রূপ।
দাদূ পংচৌ পলটি করি, কেসে ভয়ে অনূপ॥
বাহরি সারা দেখিয়ে, ভিতরি কিয়া চূর।
সতগুরু সবদৌ মারিয়া জান ন পাবৈ দূর॥

অনুবাদ—চোখের সকল অঞ্জন ফেলিয়া দয়াল গুরু পটলগুলি খুলিয়া দিলেন—অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিলেন। তাঁহার কৃপায় বধির শুনিতে লাগিল, বোবা কথা বলিল। বহির্মুখী মনকে তিনি অন্তর্মুখী করিয়া হৃদয়-দেবতাকে দেখাইলেন। তখন পঞ্চেন্দ্রিয় পরিবর্তিত হইয়া অনুপম রূপ ধারণ করিল। আমাকে বাহিরে দেখিতেছ পূর্ববৎ আছি। কিন্তু আমার ভিতরে সব চূর্ণ হইয়া নব রূপ ধারণ করিয়াছে। সদ্গুরু যখন শব্দ দিয়া মারেন, মন্ত্রপ্রদান করেন তখন মন্ত্রশক্তিতে যে সকল পাপ দগ্ধ হয়, তাহা অপরে বুঝিতে পারে না।

সম্রাট্ আকবরের সহিত সন্ত দাদূর যে ধর্মপ্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। দাদূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে আকবর একটী দূত পাঠান। দূত দাদূর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সম্রাট্ আকবর আপনার মিলনপ্রার্থী।" দাদূ নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, "রাজদর্শনে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" দূত দাদূর এই বার্তা সম্রাটের নিকট নিবেদন করিলে আকবর দূতের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সম্রাট আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী একথা সন্তকে বলিলে কেন ? যাও, তাঁহাকে আবার বল যে, ভগবৎ-প্রসঙ্গ-পিয়াসী আকবর আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" দূত দাদূদয়ালকে আকবরের বার্তা বলিলে তিনি

সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি যদি আপনার সহিত দিল্লীতে দেখা করি, আমিও আপনাকে চিনিতে পারিব না, আর আপনিও আমাকে চিনিতে পারিবেন না। কারণ, দিল্লী রাজধানী, ধনপুরী। দূত দাদুর এই বক্তব্য সম্রাট-সমীপে নিবেদন করিলে আকবর দূত মারফৎ পুনরায় এই সংবাদ পাঠাইলেন, "সাগর হইতে এক কলস জল দিল্লীতে আনিয়া তাহার মধ্যে সাগর-সৌন্দর্য দেখিবার দুর্বুদ্ধি আমার নাই। হিমালয় হইতে একখণ্ড প্রস্তর আনাইয়া তাহার মধ্যে নগাধিরাজের গম্ভীর মহিমা দর্শনের বাতুলতা আমার নাই।" সাধনপুরী ফতেহপুর শিকরীতে উভয়ের মিলনের স্থান নির্দিষ্ট হইল। উভয়ে ফতেহপুরে উপস্থিত হইলেন। আকবর দাদুকে প্রথমে এই প্রশ্ন করিলেন, "এই বিশ্বের সৃষ্টিক্রম কি? প্রথমে কি সৃষ্টি হইল? মাটী, বায়ু, জল, ভূমি, আকাশ—কোনটী আদিতে উৎপন্ন হইল?" দাদু বলিলেন—

এক শব্দ সব কুছ কিয়া, ঐসা সমরথ সোই।
আগৈ পীছে তৌ করে, জো বলহীনা হোই॥

অনুবাদ—জগৎস্রষ্টা এমন সমর্থ যে, তাঁহার একটী মাত্র শব্দে (ইচ্ছাতেই, ইঙ্গিতেই) যুগপৎ সকল পদার্থই, সর্বভূতই সৃষ্ট হইয়াছে। যিনি শক্তিহীন, তিনিই একটীর পর একটী সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা সর্বশক্তিমান।

কবীরের সম্বন্ধে প্রচলিত নিম্নোক্ত দোহাটী দাদুকে শুনাইয়া আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এই বিষয়ে মতামত কি?" দোহাটি এই—

তন মটকী মন মাহী, প্রাণ বিলোবনহার।
তত্ত্ব কবীরা লে গয়া, ছাচ পিয়ৈ সংসার॥

অনুবাদ—সাধনার পক্ষে তনু হইতেছে মন্থনের পাত্র, মন মন্থন-দণ্ড, প্রাণ মন্থনকর্তা। মন্থনান্তে ব্রহ্মরস-রূপ যে নবনী লাভ হইল, তাহা কবীর সাহেবই লইয়া গিয়াছেন। সংসার কেবল ছাঁচ (ঘোল) পান করিতেছে।

দাদূ কবীরের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, কারণ কবীর ছিলেন তাঁহার পরম গুরু। কিন্তু সত্যের অপলাপ করা তিনি ঘৃণা করিতেন। এই সকল প্রবাদ সাম্প্রদায়িকতা-সম্ভূত। দাদূ বলিলেন—

চিড়ি চংচ ভরি লে গৈ, নীর নিঘট নহি জাই।
ঐসা বাসন না কিয়া, সব দরিয়া মাহি সমাই।

অনুবাদ—পাখী যদি সাগরের জল চঞ্চু ভরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে সাগরের জল কমিয়া যায় না। এমন কোন পাত্রই সৃষ্ট হয় নাই, যাহার মধ্যে সাগরের সব জল ধরিতে পারে। এমন কোন সাধক নাই, যিনি নিঃশেষে ভগবৎতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন।

দাদূ-বাণী শ্রবণে আকবর মুগ্ধ হইলেন এবং একটীর পর একটী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আকবরের সহিত একটি মৌলবী দিল্লী হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দাদূর নিকট নিত্য নূতন তত্ত্ব-কথা শুনিয়া দাদূকে বলিলেন—আপনার মতটী কি এক কথায় বলিয়া দিন। রোজ নূতন কথা শুনিয়া আপনার মত কী বুঝিতে পারিতেছি না। তদুত্তরে দাদূ আকবরকে বলিলেন—

গুরু দাদূ আকবর মিলা, কহৈ সুবে সে জাত।
হমারে সংগ তো আপ হায়, শুনো সুখ কথা নয়া বাত॥

অনুবাদ—গুরু দাদূ আকবরকে বলিলেন, আপনি একটী শুকপাখী আনিয়া মৌলবী সাহেবকে দিন। শুকপাখী রোজ একটী কথা বার বার বলিবে। আপনিও আমার সঙ্গে আছেন। হে আকবর শাহ, আমরা নিত্য নূতন ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়া আনন্দ লাভ করিব। মৌলবী, পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ শাস্ত্রের একই বুলি আওড়াইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা সাধক, তাঁহাদের নিকট একই সত্য নিত্য নব ভাবে প্রকাশিত হয়। অভিনবত্ব সাধনার প্রগতি নির্দেশ করে। জ্ঞান-চক্ষু যখন সাধন দ্বারা উন্মিলিত হয়, তখন অন্তরে সত্যের অভিনব আলোকদর্শনে সাধক সর্বজ্ঞ হন। পণ্ডিত কেবল মুখস্থ কথাই বলেন। তৎশ্রবণে মৌলবী দাদূকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তুমি ত কোরাণ পড়িয়া হাফিজ

(কোরাণ কণ্ঠস্থকারী) হও নাই। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব কি বোঝ?" তদুত্তরে দাদু বলিলেন—

দাদু যহু তন পিঞ্জরা, মাহী মন সুবা।
একৈ নাম আল্লাহ কা, পড়ি হাফিজ হুবা॥

অনুবাদ—আমার এই দেহরূপ পিঞ্জরার মধ্যে মনরূপ শুকপাখী আছে। সে কোরাণ পাঠ করে নাই সত্য, কিন্তু একমাত্র আল্লার নাম জপ করিয়াই সে হাফিজ হইয়াছে। ভগবানের নামের মধ্যেই সকল শাস্ত্রজ্ঞান নিহিত। ভগবৎ নাম জপ করিলেই মানুষ জ্ঞানী হয়। শাস্ত্র সে না-ই বা পাঠ করিল।

মৌলবী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি পুনরায় দাদুদয়ালকে আক্রমণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় তুমি নেমাজরোজা করিলে? কে তোমার সাধনার সাক্ষী? তুমি গোসল ও উজু করে করিলে?" দাদু উত্তর করিলেন—

দাদু কায়ামহল মেঁ নিমাজ গুজারুঁ, তহঁ ঔর ন আবন পাবৈ।
মন মনকে করি তসবী ফেরুঁ, তব সাহিব কে মন ভাবৈ॥
দিল দরিয়া মেঁ গুসল হামারা, উজু করি চিত লাঁউ।
সাহিব আগৈ করুঁ বন্দগী, বের বের বলি জাঁউ॥

অনুবাদ—আমি এই দেহ-মন্দিরের মধ্যে নেমাজ পড়ি; সেখানে অন্য লোক আসিতে পারে না। মন-মালাই আমি জপ করি, বাহিরে কোন জপমালা আমি ব্যবহার করি না। কিন্তু সাহেব (ঈশ্বর) মনমালার জপেই অধিক সন্তুষ্ট হন। চিত্তসাগরে স্নান করিয়া আমি নিত্য শুদ্ধ হই এবং শুদ্ধভাবে প্রভুর চরণে প্রণত হই ও আত্মসমর্পণ করি। প্রিয়তমকে প্রীত করিতে হইলে সকল বিষয় অন্তরে করিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যই বলিতেন যে, সাধন যতই গুপ্ত হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়, ততই ভাল। মৌলবীর মুখ বন্ধ হইল। দাদুর সাম্প্রদায়িক ভাব আদৌ ছিল না। আকবর দাদুর উদারতায় মুগ্ধ হইলেন। দীর্ঘ চল্লিশ দিনব্যাপী দাদুর পরমার্থ প্রসঙ্গ শুনিয়া আকবরের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিও দূর হইল। সেই বৎসর হইতে আকবর নিজ মুদ্রায় ও অন্যত্র সাম্প্রদায়িক মুসলমান সনের বদলে নূতন প্রবর্তিত ইলাহী

কলমা চালাইলেন। আকবরের জীবনে দাদুর গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল। আকবর ছদ্মবেশে মীরাবাঈ-এর দর্শনে গিয়াছিলেন। বহু মহাপুরুষের দর্শনে ও উপদেশ শ্রবণে আকবর অতিশয় উদার ধর্মপিপাসু হইয়াছিলেন।

দাদু অতিশয় দয়ালু ছিলেন। ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁহার কাছে আসিলে তিনি সকলকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানে তৃপ্ত করিতেন। তাই লোকে তাঁহাকে দাদুদয়াল বলিত। তাঁহার অনেক মুসলমান শিষ্য এবং অসংখ্য হিন্দু শিষ্য ছিল। একবার তিনি দুই হাত উঁচু করিয়া মুসলমান শিষ্যগণকে দেখাইলেন স্বীয় শরীর মধ্যে মসজিদ এবং দুই হাতে দুই দিকে ভূমি স্পর্শ করিয়া হিন্দু শিষ্যদিগকে স্বদেহে দেখাইলেন মন্দির। মন্দির ও মসজিদ একই দেবতার স্থান—ইহাই তাঁহার মর্মবাণী। উক্ত তত্ত্বনির্দেশক তাঁহার বাণীটী এই—

যহ মসীতি যহ দেহরা, সতগুরু দিয়া দিখাই
ভিতরি সেবা বংদিগী, বাহরি কাহে জাই।

অনুবাদ—সদ্‌গুরু দেখাইয়াছেন, এই দেহই মসজিদ, এই দেহই মন্দির। অন্তরেই সেবা ও বন্দনা চলিয়াছে। বাহিরে প্রয়োজন কি?

দাদু পুরা বেদান্তবাদী ছিলেন তাঁহার পরম গুরু কবীরের মত। তিনি বলেন—

পূরণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে, সকল আত্মা এক।
কায়া কে গুণ দেখিয়ে, নানা বরণ অনেক॥
ঘট ঘট রামরতন হ্যায়, দাদু লখৈ ন কোই।
যবহি কর দীপক দিয়া, তবহি সুঝন হোই॥

অনুবাদ—পূর্ণ ব্রহ্মের দিক দিয়া বিচার করিলে সকল মানবের অন্তরেই এক পরমাত্মা বিরাজিত। আর কায়ার (দেহের) দিক দিয়া ধরিলে নানা বর্ণ, নানা রূপ ও নানা ভেদ। প্রত্যেক ঘটে (হৃদয়ে) রামরত্ন বিদ্যমান। আমাদের মন বহির্মুখ বলিয়া অন্তরস্থিত আত্মারূপ রামকে দেখিতে পাই না। সদ্‌গুরু যখন সাধনার প্রদীপ হাতে দেন, সেই প্রদীপের আলোকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় ও হৃদয়ে রামদর্শন হয়।

দাদু-বাণীর একটী প্রধান কথা জগতের ও জীবনের নশ্বরত্ববোধ। মৃত্যুচিন্তা দ্বারা এই বোধ দৃঢ়ীভূত হয়। এই নশ্বরত্ব উপলব্ধি পাকা না হইলে ঈশ্বরের দিকে মন যায় না, জগতের প্রতি আসক্তিও দূর হয় না। এই জন্য বহু সাখীতে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

যহ ঘট কাঁচা জল ভর্‌যা বিনসত নহিঁ বার।
যহ ঘট ফুটা জল গয়া, সমুঝত নহিঁ গবার।
ধরতী করতে এক ডগ দরিয়া করতে ফাল।
হাঁকোঁ পরবত ফাড়তে, সোভি খায়ে কাল॥
মুসা ভাগা মরণ তৈঁ, জহঁ যায় তহঁ গোর।
দাদু সরগ পাতাল সব, কঠিন কালকা সোর॥
জুরা কাল জনম মরণ, জহাঁ তহাঁ জিব জাই।
ভকতিপরায়ণ লীন মন, তাকোঁ কাল ন খাই॥

অনুবাদ—এই ঘট (দেহ) জলপূর্ণ কাঁচা মাটীর পাত্রতুল্য। কখন যে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে ঠিক নাই। ঘটটী ফুটা (ছিদ্রযুক্ত) হইলেই জলরূপ প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে। নয়টী ছিদ্রযুক্ত এই ঘটে প্রাণবায়ু থাকেই বা কিরূপে? যাঁহারা এক পাদক্ষেপে পৃথিবী অতিক্রম করিতেন ও সমুদ্র এক লম্ফে পার হইতেন, যাঁহাদের ডাকে পর্বত টলিত, তাঁহাদিগকেও মহাকাল (মৃত্যু) গ্রাস করিয়াছে। ইহুদী ধর্মের আচার্য্য মুসা মৃত্যুভয়ে গৃহ হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু যেখানে যান সেখানেই দেখেন কবরস্থান। স্বর্গ ও মর্ত্য সবই কালের ভয়ে ত্রস্ত। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জীবের (মানুষের) পেছনে পেছনে ছুটিতেছে। কিন্তু যিনি ভক্তিপরায়ণ, যাঁহার মন ভগবৎচিন্তায় মগ্ন, তাঁহাকে কাল গ্রাস করিতে অক্ষম।

সন্ত দাদুর মতে ঈশ্বরের নামজপই কলিযুগে শ্রেষ্ঠ সাধন। তিনি বলিতেন, চঞ্চল মনকে জপকর্মে নিযুক্ত রাখ অহর্নিশি। দাদুর বাণী—

দাদু বিন অবলংবন ক্যূঁ রহৈ, মন চংচল চলি জাই।
অস্থির মনবা তৈ রহৈ, সুমিরণ সেতী লাই॥

অনুবাদ—চঞ্চল মন সদাই চলিতেছে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে। অবলম্বন ব্যতীত তাহাকে স্থির রাখা অসম্ভব। সুতরাং নিরন্তর জপে তাহাকে জুড়িয়া দাও। তখন উহা শান্ত হইবে। দাদু এই বিষয়ে একটী গল্প বলিতেন। এক শ্রেষ্ঠী এক সাধুর নিকট সদা কর্মঠ এক ভৃত্য প্রার্থনা করেন। সাধু তাহাকে একটী ভূত দেন। ভূত শ্রেষ্ঠীর নিকট গেল এবং শ্রেষ্ঠীর সকল কাজ মুহূর্ত মধ্যে সমাপন করিতে লাগিল। শ্রেষ্ঠী শেষে তাহাকে আর কোন কাজ দিতে পারিলেন না। ভূত তখন কর্মের অভাবে প্রভুর ঘাড় ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। শ্রেষ্ঠী সাধুর নিকট পলাইয়া প্রাণরক্ষার পরামর্শ প্রার্থনা করিল। সাধু বলিলেন, একটী বাঁশ পুঁতিয়া রাখ। যখন কাজ না থাকিবে তখন এই ভূতকে বাঁশের উপরে উঠিতে ও নামিতে বলিবে এবং এইরূপে অবসর সময়ে উহাকে নিযুক্ত রাখ। মনও এই ভূতের মত চঞ্চল ও অস্থির—উহা সদা ক্রিয়াশীল। যখন উহার অন্য কর্ম থাকে না তখন উহাকে জপকর্মে নিরত রাখ।

সন্ত তুলসীদাসের মত দাদু জপমালা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। মালার সঙ্গে আঙ্গুল চলিতেছে কিন্তু মন জপে বসে নাই, অন্যত্র ঘুরিতেছে। তাই তুলসী দাস বলেন—

মালা ফেরত জুগ গয়া, পায় ন মনকা ফের।
মন কা করকা ছাড়িকে, মনকা মনকা ফের॥

অনুবাদ—এক যুগ ধরিয়া মালা ফিরাইতেছি, অথচ মনের ফের (অন্ত) পাইলাম না, মন স্থির হইল না। জপমালা ত্যাগ করিয়া মনমালায় জপ কর, তবেই মন শান্ত হইবে। মনের গ্রন্থি কাটিয়া মনমালা ফেরাও। তবেই শান্তি পাইবে। দাদুদয়ালকে তাঁহার গুরু প্রথম হইতেই মনমালায় জপ করিতে শেখান। তাই তিনি মনমালায় জপের বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বলেন—

মনমালা তহঁ ফেরিয়ে, দিবস ন পরশৈ রাত।
তহঁ গুরু বাণা দিয়া, সহজেই জপিয়ে তাত॥
মনমালা তঁহ ফেরিয়ে, আপৈ এক অনংত।
সহজৈ সো সতগুরু মিলা, জুগ জুগ কাল বসংত॥

সতগুরু মালা মন দিয়া পবন সুরতি সো পোই।
বিনা হাথ নিশিদিন জপৈ মরম জাপ যু্ঁ হোই॥

অনুবাদ—মনমালায় এমন জপযোগ কর যাহাতে দিবস বা রাত্রি স্পর্শ করিতে না পাবে। সদ্‌গুরু যে সাধনার রীতি দিয়াছেন তাহাতেই জপ সহজ ও সিদ্ধ হয়। মনমালা যখন ফেরাই, তখন প্রভু একা অনন্ত আমার হৃদযে সমাসীন হন। সদ্‌গুরুব কৃপা বিনা আয়াসে মিলিয়াছে। এখন যুগ যুগ আমাব জীবনে বসন্তোৎসব চলিতেছে। প্রেমের সূত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসেব গুটিকায় মনমালা গ্রথিত। বিনা হাতে আমার মনমালায় নিশিদিন মবম জাপ বা অজপা জপ চলিতেছে। অজপা জপ জপ-সিদ্ধির অবস্থা। জপেই ভগবদ্দর্শন হয ও মানুষ সাধনে সিদ্ধ হয়।

আট

মাইষ্টার একহার্ট *

মধ্যযুগে ইউরোপে যে সকল মিষ্টিকের (ঋষির, তত্ত্বদর্শীব) আবির্ভাব হইযাছিল তন্মধ্যে মাইষ্টার একহার্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্লটিনাশ, জালালুদ্দীন রুমী, লাওৎজে, মনসুর হালাজ প্রভৃতির ন্যায় তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। জার্মান শব্দ 'মাইষ্টার'-এর অর্থ আচার্য্য বা ঋষি। একহার্টকে তাঁহার দেশবাসিগণ 'মাইষ্টার' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি ডমিনিক্যান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। পাশ্চাত্য মিষ্টিসিজ্‌ম (তত্ত্ববিদ্যা) সম্বন্ধে অভিনব মত প্রচারের জন্য তিনি বিচাবালয়ে অভিযুক্ত হন। পোপের নিকট তিনি মুক্তিলাভার্থ আবেদন করেন, কিন্তু বিচারের রায় হইবাব পূর্ব্বেই কলোন কারাগারে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। টমাস্ একুইনাসকে তিনি গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। একহার্ট প্যারিসে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া সেই স্থানেই ধর্মপ্রচার আবম্ভ করেন এবং রোমের ডানস্ স্কোটাসের নিকট হইতে ডক্টব উপাধিপ্রাপ্ত হন। একহার্ট

* উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৫০।

স্বীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সসম্মানে বহু বৎসর ধর্মপ্রচার করেন। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিকারের পদে উন্নীত হন এবং বোহেমিয়াস্থিত স্বীয় সম্প্রদায়ের সকল মঠের উন্নতি ও সংস্কার সাধনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীর বহু স্থানে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সহিত অদ্বৈত মত প্রচার করেন, কিন্তু এই মত প্রচারের অপরাধে শেষে পদচ্যুত হন।

আচার্য্য শঙ্করের সহিত মাইষ্টার একহার্টের রচনা ও মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের রচনা একত্রে তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যেন উহা একই ব্যক্তির রচনা, ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ মাত্র। একহার্ট জার্মান ও লাটিন ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাবলী লিখিয়াছেন, আর শঙ্কর সংস্কৃতে। শঙ্কর যেমন গীতা ও উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, একহার্ট তদ্রূপ বাইবেলের গ্রন্থাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়া স্বীয় দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য যেমন শঙ্করের প্রধান গ্রন্থ, একহার্টের 'ওপাস্ ত্রিপার্টিটাম্' (Opus Tripartitum) তেমন বিখ্যাত দর্শন-গ্রন্থ।

দর্শনের দিক দিয়া ক্যাণ্ট্ যেমন শঙ্করের সমীপবর্ত্তী, তেমনি একহার্ট তত্ত্বের দিক দিয়া শঙ্করের নিকটবর্ত্তী। শঙ্কর ও একহার্টের মধ্যে ভাবে ও ভাষায় অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। জার্মান ভারত-তত্ত্ববিৎ ডক্টর রুড্লফ অটো (Dr Rudolf Otto) 'Mysticism of East and West' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে শঙ্কর ও একহার্টের তুলনামূলক ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, একহার্ট পুরা অদ্বৈতবাদী ছিলেন। 'The Idea of the Holy', 'Vishnu-Narayan', 'India's Religion of Grace and Christianity' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য মিষ্টিসিজমের (তত্ত্ববিদ্যার) সারতত্ত্বটী অতি গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। একহার্ট, শঙ্কর, প্লটিনাশ, জালালুদ্দীন প্রভৃতির তত্ত্বানুভব বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অদ্বৈতই অনুভূতিগিরির শিখর এবং জ্ঞানই ভক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বিভিন্ন দেশের উপরোক্ত মনীষিগণের অনুভব হইতে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, চীন, পারস্য, জার্মানী, আলেক্জান্দ্রিয়া, এথেন্স প্রভৃতি যে দেশেই তত্ত্ব-কুসুম প্রস্ফুটিত হউক না কেন, ইহার সুরভি একই

প্রকার। সুবভিব তারতম্য যদি কিছু দেখা যায়, তাহা স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাব-মাত্র; তাহা গৌণ, মুখ্য নহে।

একহার্ট অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, ভগবান্ মানুষ হন এইজন্যে যে, মানুষ ভগবান্ হইবে। মানবকে তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপতা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বেদস্তুতিতে উক্ত ভাবাত্মক এই বাক্যটী আছে। যথা, 'আত্মতত্ত্বনিগমায়' অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-বিস্মৃত জীবকে স্ব-স্বরূপ বোঝাইবার জন্যই অবতারের আবির্ভাব। একহার্ট বলেন, "প্রাকৃত লোক মনে করে যে, ঈশ্বর কোথাও বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা নহে। ঈশ্বর দর্শন কালে আমি ও ঈশ্বর এক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন জড়বস্তুকে লোকে যেরূপ দর্শন করে, ঈশ্বর-দর্শন বা তত্ত্বানুভব তদ্রূপ নহে। ঈশ্বর দেখা অর্থে ঈশ্বর হওয়া।" শঙ্কর বলিয়াছেন, "ব্রহ্মভাবই মোক্ষ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।" ব্রহ্মভূত হওয়াই ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান। একহার্ট বলেন, "যদি পূর্ণ হইতে চাও, ঈশ্বরের জন্য চীৎকার করিও না। যদি সর্ব্বোচ্চ অনুভূতির অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে ঈশ্বরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হও, ঈশ্বরকে ত্যাগ কর, তাঁহার কথা ভুলিয়া যাও। মানুষের মত ঈশ্বরেরও আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। কারণ, জীব ও ঈশ্বর এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন অপূর্ণ প্রকাশমাত্র।" ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তিনি যে অসীম সাহস ও নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য জগতে সত্যই অভূতপূর্ব। মনসুর সুফী যখন অনুভূতি-রাজ্যের শেষসীমায় উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন—'আমিই সত্যস্বরূপ', তখন গোঁড়া মুসলমানগণ তাঁহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। একহার্টও এইরূপ নির্ভীক উক্তির জন্য বহু অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছিলেন। একহার্ট বলেন, 'নির্বিশেষ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম হইতেই শত শত সাকার সগুণ ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতেছে। নেতি নেতি বিচার দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে জানাই আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা! ইহাই মুক্তি।' বৌদ্ধ নির্ব্বাণ বা বৈদান্তিক সমাধির অবস্থা যদ্রূপ শূন্যরূপে অভিহিত হয়, একহার্টও তদ্রূপ তত্ত্বদর্শনকে জার্মান ভাষায় 'Wuste'

বলিয়াছেন। Wuste শব্দটীর ইংলিশ অর্থ Void। তিনি এই শব্দে চরমানুভবের অবাঙ্‌মনসোগোচর তত্ত্ব ও অসীমতাকে মরুভূমির নীরবতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবের পূর্ব্বে সাধক ঈশ্বরের যত প্রকার ধারণা করেন, তাহা আংশিক, অপূর্ণ। কারণ এই সকল ধারণা স্বীয় মানসিক শক্তি ও সংস্কারানুযায়ী, সুতরাং সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। এই অর্থেই 'Man has made God after his own image' কথাটী সত্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের ১ম অধ্যায়ে আছে যে, একমাত্র সৎবস্তুই সর্ব্বাগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ছিলেন। একহার্ট তাঁহার "Opus Triparitum গ্রন্থে (৫৩৫ পৃষ্ঠায়) বলেন, "সৎবস্তুই (Ipsum Esse) সকল বস্তুর (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ছিলেন এবং সকল বস্তুর (প্রলয়ের) পরেও থাকিবেন।" সৎবস্তুর সত্তা সর্ব্ববস্তুতে ওতঃপ্রোত আছে। এই সত্তা ব্যতীত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। ইহার আদি ও অন্ত নাই, ইহা দেশাতীত, কালাতীত, অদ্বিতীয়, নিত্য। কদাপি যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর নহে, পরন্তু সদা অস্মৎপ্রত্যয়গোচর। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর, ইহা উপনিষদের বাণী। একহার্ট তাঁহার শিষ্যগণকে গভীর ধ্যান দ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে বলিতেন। জনৈক শিষ্য আসিয়া একদিন একহার্টকে প্রশ্ন করিলেন, 'মহাশয়, দেবদূতগণ কে?' মাইষ্টার উত্তর দিলেন, "বৎস, এই স্থান হইতে যাইয়া প্রত্যাহারপূর্ব্বক অন্তর্মুখী ও ধ্যানপ্রবণ হও এবং যতক্ষণ অন্তর হইতে প্রশ্নের মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আসনত্যাগ করিও না। এই প্রশ্নের উপর সমস্ত মন একাগ্র কর; অন্য কিছু ভাবিও না বা দেখিও না। তখন মানস চক্ষে প্রথমে দেখিবে যে, তুমি দেবদূতগণের সঙ্গী। পরে যখন তুমি দেবদূতগণের সমষ্টি সত্তাতে একীভূত হইবে, তখন দেখিবে, তুমি তাঁহাদের সত্তা হইতে পৃথক্ নহ। তুমি ও দেবদূত একই।" শিষ্য তদনুযায়ী দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুর উপদেশের সত্যতা অনুভব করিলেন। সত্যদর্শনান্তে গুরুর সমীপে আগমন করিয়া শিষ্য বলিলেন, "মহাশয়, আপনার কথা সফল হইয়াছে। দেবদূতের অবস্থা-লাভের আকাঙ্খা লইয়া আমি যখন সমগ্র মন ধ্যাননিমগ্ন করিলাম, তখন দেখিলাম, 'আমিই দেবদূতগণরূপে দেবদূতগণের সঙ্গে বিচরণ করিতেছি।' একহার্টের

মতে সত্য দর্শন ও সত্যস্বরূপ হওয়া একার্থক। বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতিও একই প্রকার। তিনি বলিতেন, 'শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান একই।' এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, শুদ্ধা ভক্তির ও শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা একই অদ্বৈতের অনুভূতি হয়। হনুমানও শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন যে, দেহবুদ্ধিতে দাসভাব, জীববুদ্ধিতে অংশভাব এবং আত্মবুদ্ধিতে অদ্বৈতভাব অনুভূত হয়। দেহবুদ্ধি ও জীববুদ্ধি নাশ না হইলে অদ্বৈতবুদ্ধি বিকশিত হয় না। কিন্তু ভক্ত-সাধক একনিষ্ঠ হইলে অন্তে নিশ্চয়ই জ্ঞানের অনুভূতির অধিকারী হইবেন। প্রহ্লাদ ভক্তরাজ ছিলেন। কিন্তু তিনিও ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় অদ্বৈতানুভব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণোক্ত (১।১৯।৮৪-৮৬) প্রহ্লাদের নিম্নোক্ত স্তবে এই ভাবই ধ্বনিত হইয়াছে। যথা—

"নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ॥ ৮৪
সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বং অহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে॥ ৮৫
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরং পুমান॥ ৮৬

বিখ্যাত পারস্যদেশীয় সুফী মস্‌নবী-কার জালালুদ্দীন রুমীর তত্ত্বানুভবের মধ্যেও একই ভাব প্রকটিত। চরমানুভবে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন কিছুই উপলব্ধ হয় না, সাধক সমস্ত ব্রহ্মময় দর্শন করেন—জালালুদ্দীনও তাহাই বলেন। তাঁহার অনুভবের বর্ণনা 'মসনবী' গ্রন্থে যাহা আছে তাহার নিম্নোক্ত অনুবাদ দেওয়া হইল। যথা, "আমিই সূর্য্য-কিরণস্থ ধূলিকণা, আমিই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডল। ধূলিকণাকে আমি বলি—তুমি স্থির হও। আবার সূর্য্যকে বলি—তুমি চলো। প্রাতের অন্ধকার আমিই, কুঞ্জবনের শব্দও আমিই, তরঙ্গায়িত সমুদ্রের বজ্রনির্ঘোষও আমিই। জঙ্গলের নীরবতা আমিই; বাগানের পাখির ডাকও আমি। আমিই আকাশস্থিত গ্রহ ও উপগ্রহ মণ্ডলের গতি—স্থাবরের স্থিতির ও জঙ্গমের প্রাণ আমিই। আমিই স্বর্ণের জ্যোতি, প্রস্তরের শীলতা। আমিই জীবের আত্মা, আমিই সৃষ্টির শক্তি ও প্রলয়ের ভীতি। আমিই বংশীধ্বনি ও কণ্ঠের সুর।"

মাইষ্টার একহার্টের গ্রন্থাবলী মিঃ সি ডি ইভান্‌স্ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া "The Work of Meister Eckhart" নামে ইংলণ্ডের ওয়াট্‌কিন্স কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্লেটো ও বোহেম প্রভৃতি পাশ্চাত্য তত্ত্বদর্শী অপেক্ষা একহার্ট অধিকতর অদ্বৈতবাদী। প্লটিনাশের 'ইনিড্‌স্' (Enneads), জালালুদ্দীন রুমীর 'মসনবী' এবং লাওৎজে'র 'তাও-তে-কিং' গ্রন্থাবলীতে অদ্বৈতবাদের অদ্ভুত তত্ত্ব আছে। এই সকল গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। ইহাদের বঙ্গানুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়।

একহার্ট বলেন, 'God is the same One that I am'। উপনিষদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের ন্যায় একহার্টের এই বাক্যটীর অর্থ। তিনি বলেন, 'ঈশ্বরতত্ত্ব এক নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। জীবের ন্যায় ঈশ্বরের আবির্ভাব ও লয় হয় ব্রহ্মেই। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্ববিকারাতীত। জার্মান মার্টিন লুথার যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিপুল সংস্কার সাধন করেন তেমনি জার্মান একহার্ট পাশ্চাত্য মিষ্টিসিজমের আমূল সংস্কার করেন। মুক্তিবিষয়েও একহার্ট শঙ্করের ন্যায় নির্ভীক। পরমার্থসত্ত্বা ও জীবাত্মার একত্বানুভূতিই প্রকৃত মোক্ষ বা শ্রেয়ঃ। এই তত্ত্ব-উপলব্ধি ব্যতীত সংসার-দুঃখের নিবৃত্তি, জন্মমৃত্যু বন্ধ ও শাশ্বত শান্তি লাভ হয় না। সুতরাং ইহা লাভ করাই মানব-জীবনের আদর্শ। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।১৫) আছে, 'সর্বমেব আবিশন্তি' অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বভূতে প্রবেশ করেন। একহার্ট বলেন, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বাত্মা হন। তাঁহার মতে যে ঈশ্বর বুদ্ধির বিষয়ীভূত হন, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন কিন্তু তিনি পরমার্থ বস্তু নহেন। তাঁহাকে জানিলে জীবের মোক্ষ হয় না। ব্রহ্মভাবকে একহার্ট Mysticus intuitus অথবা Unknowing knowing বলেন। ইহা ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। পরমার্থতত্ত্ব অনুভূত হইলে সাধক মৌন হন। তুষ্ণীভাব দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব বরং প্রকাশ করা সম্ভব; কিন্তু বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা বৃথা। ব্রহ্ম বাক্যাতীত, বর্ণনাতীত এবং মনাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন, পাত্র জলপূর্ণ হইলে নিঃশব্দ হয়। জ্ঞানী এইজন্যই মৌনাবলম্বন করেন। একহার্ট বলেন, 'God is one's own Being' ইহা ধারণা ও দর্শন করার পর মানুষ

ঠিক্ ঠিক্ তত্ত্বজ্ঞ হয়। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে না যাইলে যেমন রত্নরাজির সন্ধান মিলে না, সেইরূপ এই তত্ত্বদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী হয় না। ইউরোপের আধ্যাত্মিক বিদ্যায় একহার্ট অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া অমর হইয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের মায়াবাদও একহার্ট আংশিক ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জগৎ নাম ও রূপ হিসাবে অনিত্য। কালে জগতে উৎপত্তি নহে, কাল ও জগৎ একসঙ্গে উৎপন্ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে কালও ছিল না। তিনি বলেন, 'এই দৃশ্যমান জগৎ ছায়া মাত্র, জগৎ শুষ্ক তৃণতুল্য, বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায়, অদৃশ্যমান মেঘের মত, দিবাস্বপ্নের ন্যায়, বা দীর্ঘ নিশ্বাসতুল্য। সৃষ্টি মরীচিকাবৎ। নামরূপ ব্যতীত সৃষ্ট বস্তুর কোন সত্তা নাই। আর নামরূপ 'illusion'ও নহে; ইহা 'pure nothing.' তাঁহার মতে জীবত্বের যেখানে অন্ত হয়, ব্রহ্মত্বের সেখানে আরম্ভ হয়। জীবত্বভাব হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টাই প্রকৃত সাধন। অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় একহার্টও এই নামরূপময় প্রপঞ্চের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টানগণও বলিতে পারেন না, তাঁহাদের ডেভিল (Devil) কোথা হইতে আসিল। জীব উপলব্ধিহীন যতদিন থাকে ততদিন দুঃখ-দৈন্য দুর্ভোগ হইতে মুক্তি পায় না এবং মায়ার কোন কারণও বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই মায়িক উপাধি ফলপ্রসব করিতেছে এবং জীব মায়া-ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। এই জীবত্ব মায়িক, এবং ব্রহ্মভাব পারমার্থিক। হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে, সৌভরী ঋষি মায়া দ্বারা পঞ্চাশটী শরীর সৃষ্টি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং সেই বিবাহে তাঁহার ১৫০টী সন্তান জন্মিল!

একহার্ট অদ্বৈতবাদী হইলেও তিনি নাস্তিক বা নীরস জ্ঞানী ছিলেন না। তিনি আস্তিক এবং পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যগণের নিকট তিনি অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করিলেও তিনি জনসাধারণের নিকট ভক্তিবাদই প্রচার করিতেন। শ্বেতালোক যেরূপ কাচের (prism) মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া সাতটী রঙ্গে বিভক্ত হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-চক্রে এক ব্রহ্মই জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপে দৃষ্ট হন। ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও ভক্তি করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য—তিনি এই আদর্শ পালন ও প্রচার করেছেন। তাঁহার 'Collations' এবং 'Book of Divine Consolation' গ্রন্থে ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় অতি সুন্দরভাবে তিনি বর্ণনা

করিয়াছেন। ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং তাঁহাকে লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাকে ধ্যান ও লাভ না করাই 'মহতী বিনষ্টি'। তিনি বলেন, "তোমার সকল চিন্তা ও চেষ্টা ঈশ্বরমুখী হউক।" ঈশ্বরলাভই শ্রেষ্ঠ লাভ। ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ মানব-জীবনে আর কিছু নাই। যাঁহার মন ঈশ্বরচিন্তায় সদা মগ্ন, তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে ঈশ্বরভাবই প্রকটিত হয়। তাঁহার জীবনে ঈশ্বরই প্রতিফলিত হন। আমি যতদিন জগতে আছি ততদিন ঈশ্বর আমাতে আছেন। পরলোকে আমি তাঁহাতে বাস করিব। মানব-হৃদয়ে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহার প্রত্যেক চিন্তায় ঈশ্বর বাস করেন। তখন ঈশ্বর 'প্রতিবোধবিদিত' হন। একহার্ট তাঁহার Book of Godly Comfort গ্রন্থে ঈশ্বর-ভক্তির এক অপূর্ব্ব বর্ণনা দিয়াছেন।

মাইষ্টার একহার্ট ত্যাগী ও তীব্র বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি নিজে পূর্ণ অনাসক্তি অভ্যাস করিতেন এবং শিষ্যগণকে অনাসক্ত হইতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বর-দর্শন করিতে হইলে জগতের সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিতে হইবে। আসক্তিই সাধনপথের প্রধান অন্তরায়। সর্ব্বপ্রকার আসক্তি মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেল এবং সকল প্রকার প্রাকৃতভাব বিসর্জ্জন দাও। নানাত্বদৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া একত্বদৃষ্টি গ্রহণ কর। জগৎ-বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে অনন্ত নীরবতার মধ্যে দণ্ডায়মান হও। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন বৃথা।" একহার্ট এক অনুপম আশ্বাসবাণী মানুষকে দিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মসাধনে কাহারও নিরাশ হওয়া উচিত নহে। আন্তরিক চেষ্টা করিলেই মন ঈশ্বরমুখী হইবে, কারণ সৎই মানুষের সনাতন সত্তা। তিনি বলেন, "The humau mind may be fully turned towards God."

বাইবেলের মতে মানুষ আজন্ম (original) পাপী। একহার্ট মানুষকে পাপাত্মা বলিতে ঘৃণা করিতেন। তিনি পাপের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা বেদান্তের মতই। 'আমি', 'আমার' ভাব এবং দেহ-সুখের বাসনাই তাঁহার মতে পাপ। কারণ, এই সকল ভাব দ্বারাই মানুষ মায়াবদ্ধ ও জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। একহার্টের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার গ্রন্থাবলী

অধ্যয়ন করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, যেন ভারতীয় অদ্বৈতবাদের কোন অনূদিত গ্রন্থ পড়িতেছি। জার্মানীর ভাবধারায় অদ্বৈতবাদের বীজ উপ্ত, অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়াছে একহার্টের চেষ্টায়। কোন ফার্সী অনুবাদ হইতে এনকোয়েটিল ডু পেরন উপনিষদের আলোক ইউরোপে লইয়াছিলেন। সোপেনহাওয়ার উপনিষদের পরম অনুরাগী ছিলেন। শেলিংও উপনিষদের আলোকে বর্ধিত। দার্শনিক ফিক্‌টে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহার 'A Guide to the Blessed Life' পুস্তকে পরম সত্তা, জগৎ ও জীবের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতভাবে পূর্ণ। একহার্ট, প্লটিনাশ, জালালুদ্দীন ও লাওৎজে প্রভৃতি ভারতেতরদেশীয় অদ্বৈতবাদিগণের জীবনী ও বাণী বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইলে আমাদের মাতৃ ভাষা আরও সমৃদ্ধ হইবে।

নয়

কমলাকান্ত *

ই-আই-রেলওয়ে লাইনে বর্ধমান হইয়া খানা জংশন ষ্টেশন পর্যন্ত এবং তথা হইতে ২॥০ মাইল উত্তরে যাইলে চান্না গ্রাম পাওয়া যায়। এই চান্না গ্রামের ঈশান কোণে দেবী বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে বর্ধমানের মহারাজার কোন আত্মীয় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে শ্মশান ও পশ্চাতে খড়্গেশ্বরী নদী প্রবাহিতা। মন্দির একটী ছোট কক্ষ মাত্র। উহার সম্মুখে অল্প বারান্দা আছে। দেবীর মূর্তি একটী সিন্দুর-মাখান রক্তবর্ণ গোল মুখ মাত্র বলিয়া মনে হইল। মন্দিরের বায়ুকোণে একটী পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। সাধক কমলাকান্ত এই আসনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকে বিশালাক্ষীতলাকে সিদ্ধপীঠ বলে। বর্ধমানের

* উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৫৪

মহারাজা উক্ত পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর সমচতুষ্কোণ চার ফিট স্থানটী বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তদুপরি একটী একফুট শ্বেত মর্মর প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে—

সাধকপ্রবরস্যাদ্যাপদপঙ্কজসেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্তস্যাত্রৈবাসীৎ দ্বিজন্মনঃ॥

অর্থাৎ আদ্যাদেবীর পাদপদ্মসেবী সাধকপ্রবর দ্বিজ কমলাকান্তের সিদ্ধাসন এইখানেই ছিল। বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশে বর্ধমানের মহারাজ প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। অনেক পুরোহিত পুরুষানুক্রমে দেবীর পূজা ও উক্ত সম্পত্তি ভোগ করেন। বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যানমন্ত্রটী এই—

ধ্যায়েৎ দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদপ্রভাং।
দ্বিভুজাম্ অম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখর্পরধারিণীং॥
নানালঙ্কার-সুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥
মুণ্ডমালাবতীং রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শিবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাং॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাং।
সর্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥

চান্না গ্রামে এখন ২০।২৫ ঘর ব্রাহ্মণের নিবাস। তাঁহারা সকলেই শাক্ত। পূর্বে এই ব্রাহ্মণপল্লীতে কালীনামের চব্বিশ প্রহরা হইত। একদা গ্রামটী সমৃদ্ধ, জনপূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। উহার চতুর্দিকে এখনও শতাধিক পুষ্করিণী বিদ্যমান। চান্নার উত্তরে খড়্গেশ্বরী নদীর অপর পারে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে বিখ্যাত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা (অনুর্বর পতিত উচ্চভূমি) অবস্থিত। চান্না গ্রামে কমলাকান্তের মাতুলালয় ছিল।

সাধক কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনায় আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। সম্ভবতঃ ১১৭৯ বঙ্গাব্দে তিনি

জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত পদাবলী' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১২১৬ বঙ্গাব্দে মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর সাধকপ্রবরকে কালনা হইতে বর্ধমান নগরে লইয়া আসেন এবং তাঁহার সভাপণ্ডিতপদে বরণ করেন। তখন কমলাকান্তের বয়স চল্লিশের অধিক। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন, তাঁহারা দুই সহোদর, তন্মধ্যে কমলাকান্ত জ্যেষ্ঠ। পিতা দরিদ্র যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলাকান্ত পিতৃহীন হইলে তাঁহার মাতা পুত্রদ্বয়কে লইয়া চান্না গ্রামে পিত্রালয়ে গমন করেন। কমলাকান্তের মাতুল নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভাগিনেয় দুইটীকে কয়েকটী গরু ও কিছু জমি দান করেন। কমলাকান্ত কালনায় যজমান গৃহে থাকিয়া স্থানীয় একটী টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহার তত আগ্রহ ছিল না। তিনি আজন্ম সুকণ্ঠ ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতেই গান গাহিতে ভালবাসিতেন। এই সময় তাঁহার মাতুল তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উপনীত হইবার পরেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি সন্ন্যাসী হইবার সংকল্প করেন। পুত্রের মনে সংসারে আসক্তি জন্মাইবার জন্য চান্না হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে লাকুর্দ্দী গ্রামের জনৈক ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পরেও তিনি সন্ন্যাসীর মতই থাকিতেন। এই সময়ে বর্ধমানের উত্তরে চান্না হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে উঙ্কড়ে গ্রামের রক্ষাকালী পূজা দেখিতে যান। সেখানে সাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি পরিচিত হন। কেনারাম বর্ধমান জেলার মানকরের নিকটবর্তী অমরার গড়ে বাস করিতেন। উক্ত গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্ত্তি আছেন। কেনারাম বাদ্যযন্ত্রে ও কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। কমলাকান্ত তাঁহারই নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। চান্না গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব হইত। সেই সময় তথায় কালনা হইতে কমলাকান্তের বহু শিষ্য আসিতেন। চান্না হইতে কালনা প্রায় বারো ক্রোশ। এক উৎসবে তাঁহার কোনও ধনী শিষ্য চান্নায় আগমন করেন। তিনি গুরুর আর্থিক অসচ্ছলতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সংসারের সকল ভার গ্রহণ করেন, এবং

তাঁহাদিগকে কালনায় লইয়া যান। কিছুদিন পরে মাতার মৃত্যু হইলে সাধক পুনরায় চান্নায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পরে তাঁহার সাধ্বী পত্নী পীড়িতা হন এবং স্বর্গারোহণ করেন। পত্নীকে শ্মশানে চিতায় ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কমলাকান্ত নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন :—

রাগিণী—জঙ্গলা, তাল—একতালা

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।

শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার, সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাসমা, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুখে বাপ, সুখে বাপ মা, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর, পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা।
জগৎ জুড়ে নাম রটেছে, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম জানবে কেটা॥

সাধক গান গাহিবার সময় এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইত, এবং তাঁহার মন ভাবরাজ্যে বিচরণ করিত। কমলাকান্তের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে দস্যুগণও মুগ্ধ হইত। চান্না হইতে অমরার গড়ে যাইবার সময় ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার পূর্বপ্রান্তে আসিলে তিনি একদা বিশে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হন। সাধক নিঃসহায় হইয়া বিপদ কালে গান গাহিয়া জগন্মাতাকে স্মরণ করেন। তাহার প্রাণমাতানো গান শুনিয়া দস্যু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিল। বিশালাক্ষী-তলায় পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া সাধন করিবার সময়ও তিনি একবার অপদেবতাগণ কর্তৃক আসন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। বিপন্ন সাধক জগদম্বার উদ্দেশে গান গাহিতে থাকেন। ডাকাতগণ তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ভক্তিভাবে চান্নায় লইয়া যায়। ওড়গাঁয়ের

ডাকাত দস্যুকবলে পতিত হইয়া কালীসিদ্ধ কমলাকান্ত নিম্নলিখিত গানটী গাহিয়াছিলেন :—

রাগিণী—জঙ্গলা, তাল—একতালা

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোমার,
কেবল দুটী চরণ রাঙা।
শুনি, তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
অতেব হৈলাম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি-বন্ধু-সুত-দারা, সুখের সময় সবাই তারা।
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই,
ঘর-বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা॥
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখো।
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া
সে সব হলো ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা।
জপের মালা ঝুলি-কাঁথা, জপের ঘরে রইলো টাঙ্গা॥

উপরোক্ত গানটী হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কমলাকান্ত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায়, সত্যই বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহার সিদ্ধি ও সঙ্গীতের সুখ্যাতি চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাজা তেজশ্চন্দ্র ১২১৬ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত করেন। বর্দ্ধমান শহরের পশ্চিমে বাঁকা নদীর তীরে কোটালহাটে মহারাজা কালীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহাকে বাস করিতে দেন। ওখানেও কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় পূর্বে মহাসমারোহে কালীপূজা হইত। উক্ত কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া উহা আমাদের জাগ্রত মনে হইয়াছিল। তেজশ্চন্দ্রের পুত্র যুবরাজ প্রতাপচাঁদও কমলাকান্তকে গুরুতুল্য ভক্তি করিতেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রও রাজপুরে কমলাকান্তকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনিও

কালীবাড়ীতে আসিয়া প্রায়ই গুরুমুখে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। কমলাকান্ত রাজসভার কাজ শেষ করিয়া ধ্যানে ও সঙ্গীতরচনায় অবসর সময় অতিবাহিত করিতেন।

সিদ্ধিলাভের পর কমলাকান্তের অনেক অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়াছিল। একবার মহারাজা তেজশ্চন্দ্র গুরুর সিদ্ধিলাভে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষাচ্ছলে তাঁহাকে অমাবস্যার রাত্রিতে চন্দ্র দেখাইতে বলেন। সিদ্ধ গুরু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর নিশীথে স্বীয় শিষ্যকে আকাশের দিকে তাকাইতে বলেন। মহারাজা তমসাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হন। এই ঘটনার পরে গুরুর প্রতি মহারাজের ভক্তি বৃদ্ধি হয়। কয়েক বৎসর পরে তেজশ্চন্দ্র গুরুপরীক্ষার জন্য পুনরায় কৌতূহলী হন। তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্ত সাধনের সহায়করূপে মদ্য ব্যবহার করিতেন। ইহাতে তাঁহার দুর্নাম রটিয়া যায়। তাহা শুনিয়া তেজশ্চন্দ্র একদিন স্বয়ং কোটালহাটের কালীবাড়ীতে গুরুর অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হন। রাজগুরু তখন অনুপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মদের একটী প্রকাণ্ড বোতল হাতে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে কমলাকান্ত ফিরিয়া আসেন, তদ্দর্শনে মহারাজের গুরুভক্তি লুপ্তপ্রায় হয়। তিনি সক্রোধে গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, বোতলে উহা কি?' কমলাকান্ত বলেন, দুধ। রাজা ইহা বিশ্বাস না করিয়া গুরুর সন্নিকটে যাইয়া বোতলের মধ্যে কি আছে তাহা স্বচক্ষে দেখিতে চান। কমলাকান্তও রাজার কথামত বোতলের মদটা অন্য পাত্রে ঢালিয়া দেখাইলেন। রাজা দুগ্ধ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, 'এ দুধে কি সর বা ঘৃত হয়?' কমলাকান্ত বলিলেন, 'নিশ্চয়ই।' তৎক্ষণাৎ সেই দুধ হইতে ঘৃত তৈয়ার করিয়া গুরু শিষ্যকে বলেন, 'আমি এই ঘৃত দিয়া হোম করিব। আপনি দাঁড়াইয়া দেখুন।' মহারাজ গুরুর আদেশে হোম দেখিতে লাগিলেন। পরে পূর্ণাহুতি দিবার সময় গুরু শিষ্যকে বলিলেন, 'মহারাজ এই পূর্ণাহুতি দিলাম। অদ্যাবধি আপনার রাজবংশে কোন বংশধর জন্মিবে না।' মহাপুরুষের সিদ্ধ বাক্য ভবিষ্যতে সফল হইয়াছে। শোনা যায়, [illegible] বর্ধমান রাজবংশে আর কোন বংশধর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সিদ্ধপুরুষকে অবিশ্বাস ও পরীক্ষা করার নির্বুদ্ধিতার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

কমলাকান্ত কতবৎসর জীবিত ছিলেন বা কবে তিনি দেহত্যাগ করেন তাহা নিশ্চয় করা যায় না। কী দুঃখের বিষয় যে, বাংলার এই অমর মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোন বাঙ্গালী ঐতিহাসিক এ পর্যন্ত কোন গবেষণা করেন নাই বা তাঁহার কোন বিস্তৃত জীবনী রচিত হয় নাই। তাঁহার কোন স্মৃতি রক্ষা ত দূরের কথা, আমরা তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছি। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত সমসাময়িক ছিলেন। এই শাক্তসাধক কবিগণের সঙ্গীতসম্পদ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শাক্ত সঙ্গীত বাংলার অমূল্য সম্পদ। বাঙ্গালীর ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য তাহাই উক্ত সঙ্গীতে সুব্যক্ত। আনন্দের বিষয় এই যে, বর্দ্ধমান মহারাজের উৎসাহে 'কমলাকান্তের পদাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুশয্যা হইতে অনুরক্ত শিষ্যকে পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানান্তর বলেন, 'এইবার আমার জীবনান্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমায় মৃত্তিকার উপর শয়ন করাইয়া দিন।' মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া শিষ্য গুরুকে গঙ্গাতীরস্থ হইবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করেন। সিদ্ধ গুরু এক পদটী গাহিয়া শিষ্যকে উত্তর দেন—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব।

আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে

বিমাতার কি শরণ লব॥"

কমলাকান্ত দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মহারাজ এবং সমাগত ভক্তগণ কৃতার্থ হন। দেওভোগের মহাপুরুষ দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের গৃহেও কোন শুভযোগের সময় জাহ্নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

কমলাকান্ত তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রাদির ভেদাবোধ সম্বন্ধে একখানি অপূর্ব ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই হস্তলিখিত পুঁথিখানি ১৩২৫ বঙ্গাব্দে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশালাক্ষী দেবীর কোন পূজারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। উহা কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির নাম 'সাধক-রঞ্জন'। কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' সম্বন্ধে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায়

শাস্ত্রী বলেন, 'সুললিত ভাষায় মনোহর ছন্দে অতি অল্পের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বসকল আর কেহ এত সহজে বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।' উক্ত পুস্তকের সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বলেন, তিনি বাংলা ভাষায় সাধন সম্বন্ধে এমন সুন্দর পুঁথি দেখেন নাই।

'সাধক রঞ্জন'এর শেষে কমলাকান্ত আত্মপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাঠ গোবিন্দ মঠে গোবিন্দের স্থান॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধক-রঞ্জন॥

উক্ত কয়েক পংক্তি হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায়, কমলাকান্তের মাতুল ও ও অভিভাবক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি অম্বিকা (কাল্না) ও নিবাস বর্ধমান জেলায়। শ্রীপাট গোবিন্দ মঠের চন্দ্রশেখর গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ করিয়াও তান্ত্রিক সাধনা করেন এবং রামপ্রসাদের ন্যায় কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব ভক্তির যে সমন্বয়-সুর রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় রামকৃষ্ণে। বাংলার ধর্মের পরিপূর্ণ প্রকাশ রামকৃষ্ণের জীবনে পাওয়া যায়।

'সাধকরঞ্জন' গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত এবং ৫১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কমলাকান্ত উহাকে 'যোগগ্রন্থ' বলিয়াছেন। উহাতে অন্তর্যজন, ভক্তিলক্ষণ, নাড়ীনির্ণয়, ষট্চক্রবর্ণনা, ব্রহ্মনিরূপণ, সমাধিনির্ণয়, আসনবিধি, প্রাণায়াম, [illegible], [illegible], জপাধারনিরূপণ, বায়ুবিবরণ এবং পিঙ্গলালক্ষণ আছে। ভক্তিলক্ষণ-

শীর্ষক অধ্যায়ে ভক্তির বাল্যভাব, মধ্যাবস্থা এবং উত্তমাবস্থা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত। ষট্‌চক্র বর্ণনাধ্যায়ে প্রত্যেক চক্রটি পৃথক্‌ভাবে লিখিত। ষট্‌চক্র নিরূপণ নামক যে সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থ আছে উহা ব্যতীত ষট্‌চক্রের এত সরল ও সুন্দর বর্ণনা বাংলা বা সংস্কৃতে দৃষ্ট হয় না। স্বানুভব না হইলে এত জীবন্ত বর্ণনা সম্ভব হয় না। সমাধিনির্ণয় অধ্যায় হইতে জানা যায় কমলাকান্তের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ এবং সমাধি লাভ হইয়াছিল। তিনি সমাধির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা কুলার্ণবতন্ত্রে প্রদত্ত নিম্নোক্ত সমাধিবর্ণনার সদৃশ—

যদত্র নাত্র নির্ভাসঃ স্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্।
স্বরূপশূন্যং যৎ ধ্যানং সমাধিরভিধীয়তে ॥

যে ধ্যান নির্ভাসরহিত, স্বরূপশূন্য এবং প্রশান্ত সাগরবৎ স্থির তাহাই সমাধি। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের ন্যায় কমলাকান্ত কালীধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

দশ

উইলিয়াম জোন্স *

কলিকাতা মহানগরীতে দেড় শতাধিক বৎসর 'এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল' নামক যে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, স্যর উইলিয়াম জোন্স ছিলেন তাহার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি। উক্ত সোসাইটী কর্তৃক অমর প্রতিষ্ঠাতার দ্বিশতাব্দ জন্মবার্ষিকী যথাসময়ে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল পাশ্চাত্ত্য মনীষী সংস্কৃতভাষা অনুশীলনপূর্বক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, স্যর উইলিয়াম ছিলেন তাঁহাদের সর্বাগ্রণী। সংস্কৃতভাষার প্রতি তাঁহার কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত বাক্যে সুপরিস্ফুট—"সংস্কৃতের প্রাচীনত্ব যাহাই হউক না কেন, উহার অদ্ভুত গঠন গ্রীক অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ, ল্যাটিন অপেক্ষা অধিকতর প্রচুর এবং এই উভয় ভাষা

---

* 'প্রবর্তক' (আষাঢ় ১৩৫৩) প্রকাশিত।

অপেক্ষা অসামান্যভাবে অধিকতর সুসংস্কৃত।" উইলিয়ম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই অল্পপরিসর জীবনের মধ্যে তিনি যে সকল অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই তিনি অমর হইয়াছেন। চালমার (Chalmer) সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, "উইলিয়ম জোন্স ছিলেন বর্তমান যুগে যুক্তিসঙ্গত উচ্চাভিলাষ, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সংস্বভাব ও সংগুণের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তিনি চিরকাল বিদ্বৎসমাজে প্রশংসাভাজন থাকিবেন। তাঁহার সমকক্ষ হইবার সৌভাগ্য অল্প লোকেরই হয়; তাহার অভাধিক হইতে হয়ত কেহই সমর্থ হইবেন না।" জোন্সের জীবনী-লেখক লর্ড টাইনমাউথের[1] মতে কোন লেখক কোন কালে এত অল্প আড়ম্বরের সহিত এত অধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন নাই।"

উইলিয়ম জোন্স ১৭৪৬ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত হ্যারো স্কুলে তাহার বাল্যশিক্ষা লাভ হয়। নবম বর্ষ বয়সে তাঁহার বাহু-অস্থি ভগ্ন হওয়ায় তিনি এক বৎসরকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময়েই তিনি শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিতাবলী অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার তিনি ও তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ সেক্ষপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' (প্রবল ঝটিকা) নাটকটী অভিনয় করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু কাহারও কাছে এই বই একখানিও ছিল না। তিনি স্বীয় স্মৃতি হইতে সমগ্র নাটকটী নির্ভুলভাবে লিখিয়া দিয়া বন্ধুগণকে স্তম্ভিত করিলেন। স্কুলে পড়িবার সময় মেলিয্যাজারের[2] আখ্যায়িকা অবলম্বনে তিনি যে বিয়োগাত্মক নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সহপাঠিগণ কর্তৃক অভিনীত হয়। তিনিই ছিলেন তাহার প্রধান অভিনেতা। ডাঃ বেনেট বলেন, "এই সময়েই তিনি দুর্লভ যোগ্যতা, অভিনব চিন্তাশীলতা, নানা প্রকার নাটক ও পদ্যাদি রচনায় আগ্রহ, সাধুতা ও সৎসাহসাদি গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।" তাঁহার স্কুলের শিক্ষক থ্যাকারীর মতে উইলিয়াম এরূপ অধ্যবসায়ী

[1] Life of Sir William Jones (2 vols) by Lord Teignmouth দ্রষ্টব্য।

[2] ক্যালিডনের ও এলথিয়ার রাজা ইনিয়াসের পুত্র মেলিয়াজার। একখণ্ড কাষ্ঠের সংরক্ষণের উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিত। মাতুলগণকে বধ করায় মাতা আলথিয়া ক্রোধে উক্ত কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

ও আত্মনির্ভরশীল বালক ছিলেন যে, তিনি যদি নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় স্যালিসবারীর নির্জন প্রান্তরে একাকী পরিত্যক্ত হইতেন, নিশ্চয়ই তিনি যশঃ ও সম্পদের পথ আবিষ্কার করিতেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে উইলিয়াম অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে তিনি প্রাচ্য সাহিত্যের প্রতি এত আকৃষ্ট হন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যাবলী এবং সাফল্যের পথ তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ জোন্স লর্ড আলথর্পের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। হিব্রু কবিতা সম্বন্ধে ডাঃ লাউথ কর্তৃক অক্সফোর্ডে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুকরণে উইলিয়াম একুশ বৎসর বয়সে এশিয়ার কবিতা বিষয়ক রচনা আরম্ভ করেন। দেনমার্কের রাজা তখন ইংলণ্ড পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। উক্ত রাজা নাদির শাহের যে জীবনী লিখিয়াছিলেন উইলিয়াম তাহার পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে জোন্স আইন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ১৭৭২ খ্রীঃ তিনি প্রাচ্য কবিতা সম্বন্ধে দুইটী নিবন্ধ এবং কবিতার বই দুই খণ্ড প্রকাশ করেন।

আইন-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই উইলিয়ামের হৃদয়ে বলবতী ছিল। সেই জন্য ১৭৭৪ খ্রীঃ তিনি ব্যারিষ্টাররূপে বারে যোগদান করেন। তিনি একজন 'দার্শনিক আইন-ব্যবসায়ী' হইবার জন্য চেষ্টা করেন। যদিও প্রথমে আইন-ব্যবসায়ে তিনি আশানুরূপ সফল হন নাই, তথাপি কিছুকাল পরে তিনি ইহাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময় গ্রীকদেশীয় বাগ্মীগণের বক্তৃতাবলী অধ্যয়নপূর্ব্বক তিনি ইসায়াসের বক্তৃতার উপভোগ্য অংশগুলি অনুবাদ করেন। ১৭৭২ খ্রীঃ তিনি রয়্যাল সোসাইটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৭৮৩ খ্রীঃ আরবদেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাতটী প্রাচীন কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে তিনি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামস্থিত সুপ্রীম কোর্টের জজ নিযুক্ত হন এবং 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। এই বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি অ্যানা মেরিয়া শিপলের পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার বন্ধু লর্ড এসবার্টন তাঁহাকে এই মর্ম্মে অভিনন্দিত করেন যে, মানব জীবনের দুইটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রেম—তিনি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স এবার তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্রের আহ্বান শুনিলেন। তিনি ১৭৮৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের পুসেন জজ হইয়া আসেন। তাঁহার খ্যাতি তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই ভারতে পৌছিয়াছিল। তাঁহার আগমনে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লণ্ডনের এশিয়াটীক সোসাইটীর মত বাংলায় প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার জন্য তিনি কলিকাতায় 'এসিয়াটীক সোসাইটী অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেন। এই গৌরবময় মহৎ কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি এই দেশে অমর হইয়াছেন। মহানুভব প্রতিষ্ঠাতার সভাপতিত্বে নূতন সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। এই প্রশংসনীয় কাজে স্যার চার্লস উইলকিন্সপ্রমুখ ইংরাজগণ তাঁহার সহকারী ছিলেন। এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাপূর্বক কয়েক বৎসর সভাপতিরূপে ইহার ভিত্তি এরূপ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন যে, গত একশত ষাট বৎসরাধিক ইহা প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার আলোক বঙ্গে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। এই সমিতি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে প্রাচীনতম সংস্কৃত-প্রতিষ্ঠান। ইহাতে ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি প্রাচ্য সংস্কৃতির বহুমুখী স্রোত একত্রিত করিয়া, একটী বিরাট গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত করাই ছিল তাঁহার স্বপ্ন। তিনি যে দশ বৎসর জীবিত ছিলেন তাহার মধ্যেই তাঁহার স্বপ্ন অনেক পরিমাণে সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্বপ্ন পূর্ণভাবে রূপ গ্রহণ করে নাই। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এশিয়াটীক সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পরে মার্কিণ বিচারপতি ষ্টোরী (Storey) সাহেব এসিয়াটীক সোসাইটীর সভাপতি হন। ১৮১৭ খ্রীঃ ষ্টোরী সাহেব বলিয়াছিলেন, "যদি তিনি আর কিছু না লিখিতেন সহজবোধ্য পাণ্ডিত্য, দার্শনিক সূক্ষ্মতা এবং নিখুঁত বিশ্লেষণের জন্য তিনি আইনজ্ঞ হিসাবেও চিরস্মরণীয় হইতেন। ভারতে আসিবার পূর্বেই ইংলণ্ডের পণ্ডিত-সমাজে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে থাকিতেই ফার্সীভাষার ব্যাকরণ রচনা এবং ফার্সী ও আরবী হইতে অনেক অনুবাদ করেন; উভয় ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। সংস্কৃত শিখিবার পূর্বেই তিনি ইংলণ্ডে প্রাচ্যতত্ত্ববিৎরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন।" মার্কিন

উপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত প্রকাশ্যভাবে সমবেদনা প্রদর্শনের জন্য তিনি পাঁচ বৎসর কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিত্ব হইতে বঞ্চিত হন।

প্রধানতঃ দুইটী কারণে উইলিয়াম সংস্কৃত শিক্ষা করিতে অগ্রসর হন। বিচারপতি হইয়া তিনি দেখিলেন, হিন্দু আইনে অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাঁহাকে অনুবাদক ও দোভাষীর উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন, এই উপায়ে কোন বিষয়ের জ্ঞান গভীর হয় না। তিনি জানিতেন যে, ভারতীয় সাহিত্য বা ধর্মের প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যতীত মৌলিক জ্ঞানের অন্যান্য উপায় অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক। কাশী হইতে সেই সময় মানবধর্মশাস্ত্রের এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। হিন্দু আইনের এই প্রধান গ্রন্থখানি অধ্যয়নের জন্য তিনি সংস্কৃত পাঠে মনোনিবেশ করেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে উইলিয়াম জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "সংস্কৃত ভাষার সহিত গ্রীক ও ল্যাটিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। উক্ত ভাষাত্রয়ের মধ্যে ধাতুগত সাদৃশ্য এত সুগভীর যে, কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ উহাদের সাধারণ উৎস অস্বীকার করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, ফার্সী ভাষার সহিতও সংস্কৃতের নিকট সাদৃশ্য আছে।" আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কলিন্ এডগার্টন* বলেন, "উইলিয়াম জোন্সের এই উক্তিতে তুলনামূলক ব্যাকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ও আবিষ্কারক ছিলেন উইলিয়াম জোন্স। ভাষাসমূহের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভাষাতত্ত্ববিৎ মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু গ্রীক ও ল্যাটিনের সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এবং তাহাদের উৎপত্তিস্থলের ঐক্য জোন্সই প্রথম প্রচার করেন।"

উইলিয়াম জোন্স নয় বৎসরেরও কম সময় সংস্কৃতের অধ্যয়ন, আলোচনা ও অনুবাদাদি করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে তাঁহার সরকারী কর্মের চাপও অত্যধিক

* অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কলিন এডগার্টনের প্রবন্ধ "The bicentinary of a pioneer orientalist" in Aryan Path, Sept., 1946 দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও সংস্কৃতের যে অদ্ভুত সাধনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। কোলব্রুক সাহেবকে প্রথম সংস্কৃত-তত্ত্ববিৎ বলা হয়। কিন্তু জোন্স এত অল্পকালে এত অধিক কার্য্য করিয়াছেন যে, তাহা অপরের সাধ্যাতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী, ল্যাটীন, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, গ্রীক, আরাবিক, ফার্সী ও সংস্কৃত—এই আটটি ভাষাতে জোন্স পড়িতে, লিখিতে ও অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কুড়িটি (২০) ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি কতবড় বিদ্বান ছিলেন, তাহা ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়।

এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হওয়ার পর বৎসর আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে স্যার উইলিয়াম সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারেন নাই। সরকারী কাজের চাপ ও শারীরিক অসুস্থতাই এই অক্ষমতার প্রধান কারণ। কলিকাতার জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে অধিকাংশ সময় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বদেশ হইতে বহু সহস্র মাইল দূরে অপরিচিত ও ভিন্নভাষাভাষী লোকের মধ্যে অসুস্থ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখে কী কষ্টে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভৃত্যগণের সঙ্গে কথোপকথন করিবার জন্যই তিনি একটু হিন্দুস্থানী শিক্ষা করেন। কিন্তু এ দেশে সংস্কৃতের প্রতি জনসাধারণের গভীর অনুরাগ দেখিয়া সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি একজন অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ম্লেচ্ছকে দেবভাষা শিক্ষা দেওয়া তখন শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম। সুতরাং কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতই জোন্সের শিক্ষক হইতে সাহসী হইলেন না। কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্র ছিলেন উইলিয়ামের বন্ধু। কিন্তু মহারাজার প্রচেষ্টা এবং উইলিয়ামের বিজ্ঞাপিত মোটা মাহিনার প্রলোভনেও কোন ফল হইল না। বিচারপতি জোন্স স্বয়ং বাংলার সংস্কৃত-শিক্ষার পীঠস্থান নবদ্বীপে যাইয়া অধ্যাপকগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিলেন। তাহা সত্ত্বেও কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক তাঁহাকে পড়াইতে সম্মত হইলেন না। অনেক অনুসন্ধান ও বহু চেষ্টার পর অবশেষে একশত টাকা বেতনে জনৈক বৈদ্যপণ্ডিত পাওয়া গেল। ইনি একটি পাত্রে মোটা মাহিনার প্রলোভনে জোন্সের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চালাইতে

ছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সামাজিক শাসনের ভয় দেখাইলেন। একঘরে হইবার ভয়ে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতই উক্ত কর্মে অগ্রসর হইলেন না। বৈদ্যপণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণ ছিলেন হাওড়া জেলার সালকিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ। তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক ছিল। সংসারে তিনি একাকী; তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেহই ছিল না। তাঁহার একঘরে হইবার ভয় ছিল না। এতদ্ব্যতীত তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ বলিয়া প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। অসুখ হইলে লোকে তাঁহাকেই ডাকিবে—এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। স্যার উইলিয়াম খিদিরপুরে থাকিতেন। নির্দিষ্ট বেতন ব্যতীত সালকিয়া হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত নিত্য যাতায়াতের পাল্কীভাড়াও তিনি পাইবেন—এই বন্দোবস্তে কবিরাজ রামলোচন জোন্সকে সংস্কৃত পড়াইতে রাজী হইলেন।

ব্রাহ্মণ না হইলেও বৈদ্যপণ্ডিত রামলোচন ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। সেইজন্য অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীর মধ্যে নিম্নোক্ত ৮টী চুক্তি স্থির হয়—(১) একটি একতল গৃহে অধ্যাপনার স্থান নির্দিষ্ট হইবে। (২) পাঠাগারের মেজে মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত হইবে। (৩) পাঠাগারের মেজে ও দেওয়াল (যতদূর হাত যায় ততদূর) প্রতিদিন গঙ্গাজলে মার্জ্জনা করিবার জন্য একটী হিন্দু ভৃত্য থাকিবে। (৪) কাষ্ঠাসন ব্যতীত অন্য কোন আসন পাঠাগারে ব্যবহৃত হইবে না, এবং এই কাষ্ঠাসনগুলি প্রতিদিন গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে। (৫) প্রাতঃকালেই অধ্যাপনা হইবে। (৬) নির্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে এক পেয়ালা চা ব্যতীত অধ্যয়নার্থী আর কিছুই আহার বা পান করিবেন না। (৭) গোমাংস, শূকরমাংস বা পাঁটা-চাপড় প্রভৃতি পাঠাগারে নিষিদ্ধ। (৮) অধ্যাপকের ব্যবহারের জন্য পাঠাগারের নিকটবর্ত্তী গৃহটীও প্রত্যহ গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে। এই ঘরে একপ্রস্থ কাপড় থাকিবে। পাঠাগারে প্রবেশের পূর্ব্বে অধ্যাপক স্বীয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এই কাপড় পরিবেন। আবার গৃহে ফিরিবার সময় এই কাপড় ছাড়িয়া স্বীয় কাপড় পরিয়া আসিবেন। সংস্কৃতানুরাগী উইলিয়াম অধ্যাপকের এইসকল কঠিন সর্ত্ত মানিয়া লইলেন। পণ্ডিত কবিভূষণের অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। জোন্স পাঠারম্ভকালে আর্ম্মে সংস্কৃত

জানিতেন না। আবার তাঁহার গোঁড়া অধ্যাপকও ইংরাজী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। স্যার উইলিয়াম সামান্য একটু হিন্দুস্থানী শিখিয়াছিলেন। তাহারই সাহায্যেই গুরুশিষ্যের মধ্যে কথাবার্তা চলিত। যাহা হউক শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়ের অধ্যবসায় ও বুদ্ধিপ্রাখর্যে এক বৎসরের মধ্যেই স্যার উইলিয়াম সহজ সংস্কৃতে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে জোন্স অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের অস্তিত্ব অবগত হন। সহরের ধনীগৃহসমূহে যে নাট্যাভিনয় হইত সেকালের ইংরাজ অধিবাসিগণ তাহা অবশ্যই জানিতেন। প্রাচীন ভারতে রাজা, মহারাজা ও ধনীর প্রাসাদে নাট্যাভিনয় হইত—ইহা জানিতে পারিয়া স্যার উইলিয়াম সংস্কৃত নাটক অধ্যয়নে অভিলাষী হন। প্রথমে তিনি মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠ করেন। পরবর্তী কালে স্যার উইলিয়াম উক্ত সংস্কৃত নাটকের গদ্য ও পদ্য ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কালিদাসই ভারতের সেক্ষপিয়র। তিনি বলিতেন—"সংস্কৃত নাটক আবহমানকাল হইতে ভারত সাম্রাজ্যে প্রচলিত।" কালিদাসের 'ঋতুসংহার' অধ্যয়নান্তে স্যার উইলিয়াম বলিয়াছিলেন, "কালিদাস-রচিত প্রত্যেক বাক্যই মার্জিত। কবিতার প্রত্যেক শ্লোকে ভারতীয় দৃশ্য বর্ণিত। বর্ণনা সর্বদা সুন্দর কদাপি অতিরঞ্জিত, কিন্তু কখনও অস্বাভাবিক নহে।"

উইলিয়াম জোন্সই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা, গীতগোবিন্দ এবং মনুসংহিতা অনুবাদ করেন। তাহার ইংরাজি অনুবাদ এত প্রাঞ্জল এবং মৌলিক হইয়াছিল যে, উহা ইউরোপে শীঘ্রই পাঠকপ্রিয় হয়। তাঁহার শকুন্তলা জার্মান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং গেটে ও হার্ডার প্রমুখ জার্মান মনীষীযুগলের প্রশংসালাভ করে। জোন্সের মনুসংহিতাই প্রায় একশত বৎসর আদর্শ ইংরাজি অনুবাদরূপে প্রচলিত ছিল। জার্মান পণ্ডিত বুহলারের অনুবাদই তৎপরে উহার স্থান গ্রহণ করে। বুহলারের অনুবাদ ১৮৮৬ খ্রীঃ মোক্ষমুলার-সম্পাদিত 'সেক্রেড বুকস্ অব দি ইষ্ট' সিরীজে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বুহলারও জোন্সের ঋণ স্বীকারপূর্বক বলিয়াছেন, "আমি সযত্নে জোন্সের অনুবাদ

ব্যবহার করিয়াছি।' উইলিয়ম জোন্স হিতোপদেশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুবাদ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই চার্লস উইলকিন্সকৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। জোন্সের ধারণা এই যে, পিলপেব আখ্যায়িকাবলী হিতোপদেশ হইতে উৎপন্ন। আমরা জানি যে, হিতোপদেশ অন্ততঃ আংশিকভাবে পঞ্চতন্ত্রের নবীন সংস্করণ মাত্র। ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চতন্ত্রের যে পহলবী অনুবাদ হয়, তাহাই পিলপেব উৎস। উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি গবেষণার অনেক নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। ইউরোপীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম মূল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং তৎকর্তৃক কালিদাসের 'ঋতু সংহার' প্রথম প্রকাশিত হয়।

জোন্সের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত রামলোচন ১৮১২ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। ব্যাকরণ ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্যার উইলিয়াম যখন হিন্দু স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়। তখন দেশে উদার ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেইজন্য স্মৃতি ও দর্শনের অধ্যাপক পাইবার জন্য উইলিয়ামকে অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। ১৭৮৯ খ্রীঃ তাঁহার এসিয়াটিক রিসার্চেস্ (এশিয়া সম্বন্ধীয় গবেষণাবলী) এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাই ক্রমে এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের মুখপত্রে পরিণত হয়। 'মনু-সংহিতা' অধ্যয়নান্তে স্যার উইলিয়াম উহার একটি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ ১৭৯৪ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। স্মৃতিকার মনু সম্বন্ধে তিনি বলেন, "উচ্চ ভক্তিভাব, সুগভীর মানব-প্রীতি এবং সকল প্রাণীর প্রতি অমায়িক কোমলতার দ্বারা সমগ্র গ্রন্থ পরিব্যাপ্ত। সংহিতার ভাষার কঠোর বাক্যবিন্যাস থাকায় আইনগ্রন্থের ন্যায় উহা পাঠকের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা সঞ্চার করে। ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর সকল প্রাণীর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যভাব, এবং এমনকি, রাজাদের প্রতিও কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্যই শিক্ষাপ্রদ। বেদজননী গায়ত্রীর প্রশংসায় মনু মহারাজ চতুর্মুখ ছিলেন। ইহা হইতে প্রতীত হয়, তিনি গায়ত্রীর একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। গায়ত্রীতে পরিদৃশ্যমান সূর্য

সূর্য্যের উপাসনা কথিত হয় নাই ; হিন্দুশাস্ত্রমতে উহাতে দিব্য অতুলনীয় মঙ্গলময় জ্যোতির উপাসনা অভিব্যক্ত। সেই দিব্য জ্যোতিঃদ্বারা সকল বস্তু আলোকিত এবং সকল প্রাণী অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত হয়। ইহা হইতে সকল ভূত সমাগত হইয়াছে এবং উহাতেই সকল ভূত প্রত্যাগত হইবে। সেই জ্যোতিঃতে শুধু আমাদের চক্ষু নহে, আমাদের বুদ্ধি এবং আত্মাও উজ্জ্বল হয়।" ১৭৯৪ খ্রীঃ স্যার উইলিয়াম জোন্স প্লীহা-প্রদাহে অসুস্থ হন এবং ২৭শে এপ্রিল দেহত্যাগ করেন।

কলিকাতায় স্যার উইলিয়াম নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতেন। কলিকাতার ইংরাজি-শিক্ষিতগণ তাহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের গভীর জ্ঞান তাহার বক্তৃতাবলীতে প্রকাশিত। হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেন—"হিন্দু শাস্ত্রে যে ছয় দর্শন ব্যাখ্যাত, প্রাচীন গ্রীসের সকল দার্শনিক সত্যই উহাদের অন্তর্ভুক্ত। বেদান্ত দর্শন বা উহার ভাষ্যটীকাদি পড়িলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পাইথাগোরাস ও প্লেটো ভারতীয় ঋষিগণের ন্যায় তাঁহাদের সুমহান্ দার্শনিক তত্ত্ব একই উৎস হইতে লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীক লেখকগণ সত্যই বলিয়াছেন যে, সকল জাতির মধ্যে হিন্দুগণই অধিকতম জ্ঞানী ও দার্শনিক, এবং নৈতিক প্রজ্ঞাতেও তাঁহারা সমধিক উন্নত।" ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য তিনি জনৈক পণ্ডিতের সাহায্যে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নপূর্ব্বক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, "এইরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অত্যধিক প্রশংসা করা সম্ভব নয়।" বেদান্তের মূলতত্ত্বটী জোন্স কী সুন্দরভাবে বুঝিয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত বাক্য হইতে জানা যায়—"অধিকতর আধুনিক যুগে অদ্বিতীয় শঙ্কর যে বেদান্তের দৃঢ় ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ছিলেন সেই প্রাচীন তত্ত্বে জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকৃত নহে। কাঠিন্য, অভেদ্যতা প্রভৃতি জড় পদার্থের গুণ বেদান্তে অগ্রাহ্য নয়। উক্ত দর্শন সাধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস সংশোধন করিয়া দেয় মাত্র। বেদান্তমতে মানসিক অনুভব ব্যতীত জড়বস্তুর পৃথক সত্তা নাই। জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও উহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা পরিবর্ত্তনীয় রূপ মাত্র। বাহ্য অস্তিত্ব ও মানসিক অনুভব সূক্ষ্মতর সত্তা দ্বারা বিধৃত। উক্ত সত্তা ক্ষণমাত্র অন্তর্হিত হইলে উভয়েরই অভাব হইবে।" হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে উইলিয়াম যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। ভারতের শিল্প-সাধনা

সম্বন্ধে তিনি বলেন, "হিন্দু সাহিত্যে সকল প্রকৃতি প্রাণবতী ও গুণবতী। চারুকলা ভগবান কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মানব ও দিব্যজ্ঞান বেদ হইতে প্রাপ্ত।" হিন্দু সংগীতের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা ছিল। শ্রীরাগের নিম্নলিখিত ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া তিনি হিন্দু সংগীতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন—

লীলাবিহারেণ বনান্তরালে
চিন্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসিবেশোদিত দিব্যমূর্তিঃ
শ্রীরাগ এষঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥

অনুবাদ—পৃথিবীতে প্রখ্যাত শ্রীরাগ সহচরীগণের সহিত বনের অন্তরালে ক্রীড়ারতা এবং সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পচয়নে প্রবৃত্তা। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিব্য কান্তি ও লালিত্যে তাঁহার বিলাসী বেশ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

উইলিয়াম জোন্স আরব সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া লিখিয়াছেন, "ফার্সী ও তুর্কী সাহিত্য আরব সাহিত্য কর্ত্তৃক প্রভাবিত। এশিয়ার সাহিত্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু, ইউরোপীয় সাহিত্যে পুনরাবৃত্তি-দোষ দৃষ্ট হয়।" হিন্দু ও ফার্সী সাহিত্যের তুলনা-মূলক সমালোচনান্তে তিনি বলেন, সুফী ধর্ম ও বেদান্তের মধ্যে সর্ব্বাধিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অবধারণে অক্ষম। কিন্তু জোন্স তাহা গভীরভাবে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "শিক্ষিত হিন্দুদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা অতিশয় কাব্যানুরাগী। তাঁহাদের নিকট কবিত্ব একটী দিব্যগুণ, এবং কাব্য স্বর্গ হইতে সমানীত। মহাকবি বাল্মীকি স্বর্গ হইতে কাব্যস্রোত মর্ত্তে আনিয়া রামায়ণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" জোন্স বেদ সম্বন্ধে বলেন, 'হিন্দুর আয়ুর্বেদ, অস্ত্রচিকিৎসা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চারুশিল্প ও ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি বেদ হইতে উৎপন্ন।" ভারতীয় ঔষধবিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'সংস্কৃতে হিন্দুদের যে সকল চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহা অধ্যয়ন করিলে, ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ অশেষ উপকৃত হইবেন। ঐ সকল গ্রন্থে যে সকল ঔষধ উল্লিখিত আছে—

সেইগুলি সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত।' হিন্দু সাহিত্যের বিশালত্ব সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দু সাহিত্যের যে দিকেই আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই উহার অসীমত্ব উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হই।" সংস্কৃত কবিতার অসংখ্য ছন্দ দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "হিন্দু কবিগণ বিষয় বা ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে ছন্দ পরিবর্তন করিতেন। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই সংস্কৃত কবিতার সমকক্ষ হইতে পারে।" উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত কবিতার অনুকরণে বহু ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছেন। প্রকৃতি, ইন্দ্র, সূর্য্য, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবী সম্বন্ধে যে সকল সংস্কৃত স্তোত্র আছে সেইগুলির এমন সুন্দর অনুবাদ তিনি করিয়াছিলেন যে, তাহা পড়িলে মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, হিন্দু জ্যোতিষ, ভারতীয় অক্ষক্রীড়া, ভারতীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্ব, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া উইলিয়াম জোন্স ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী ছিলেন। ভারতীয় ভাব ও দৃষ্টি লইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্যই বোধ হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যাবধারণে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার গবেষণা বহুমুখী হইলেও, তিনি অন্তরে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহার মহানুভবতাও তাঁহার পাণ্ডিত্যের ন্যায় অসাধারণ ছিল। স্যামুয়েল জনসনের সাহিত্য-সভার সভ্যরূপে ইংলণ্ডে তাঁহার প্রচুর সুখ্যাতি হইয়াছিল। ডাঃ বার্ণার্ড বলেন, "জোন্স আমাকে গ্রীক্ ভাষার সঙ্গে সঙ্গে নিরভিমানিতাও শিক্ষা দেন।" স্যামুয়েল জনসন উইলিয়াম জোন্সকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানব-সন্তানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতার একটী স্মৃতি-সভায় জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষকগণ তাঁহাদের বিদ্যানুরাগী ছাত্রের মহানুভবত্ব স্মরণপূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। জোন্স তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং এমন কি, ভৃত্যগণের সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। বিচারপতি ষ্টোরী সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, "উইলিয়াম জোন্সের প্রতিভার প্রাখর্য্য, সাহিত্য সাধনার বিপুলত্ব এবং নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবন এত অসাধারণ ছিল যে, তাঁহার কোন্ গুণটী

অধিকতর প্রশংসাযোগ্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার মহানুভবতা, মেধা, বিদ্যানুরাগ ও সাধুতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।" ফ্র্যাঙ্কলিন এড্গার্টন সত্যই বলিয়াছেন, "যদি উইলিয়াম জোন্সের মত মহাপুরুষের কোন শত্রু থাকে তাহারা নিশ্চয়ই মানব জাতির শত্রু।"

এগার

নরসিং মেহতা

(১৫০০—১৫৮০)

নরসিং মেহতা গুজরাতের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক-কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি মীরাবাঈ'র সমসাময়িক। তাঁহার সময়ে গুজরাত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবর তখন ভারত-সম্রাট্। কথিত আছে, সম্রাট্ আকবর তানসেনকে লইয়া মীরাবাঈকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মোগল-রাজত্বে গুজরাতের সমৃদ্ধির খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়াছিল। গুজরাতের অন্তর্গত কাম্বে ও সুরাট তখন প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক বন্দর। য়ুরোপীয় পর্য্যটক বার্থেম (১৫০৩—১৫০৮) এবং ওভিংটন (১৬৯০) তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে গুজরাতের ঐশ্বর্য্যের বিপুলত্ব মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন। কাফি খাঁর মতে গুর্জ্জর তখন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ। গুজরাতের রাজধানী আমেদাবাদের তিন শত আশীটি (৩৮০) উপকণ্ঠ বা সহরতলী ছিল। এই সকল উপকণ্ঠের প্রত্যেকটিতে রাস্তা, ঘাট, বাজার ও অট্টালিকা এত অধিক ছিল যে, তাঁহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র নগর বলিলে অত্যুক্তি হইত না।

*মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৪৯।

গুজরাতি কবি ভেঙ্কটাধ্বরিন্ (১৬৪০) তাঁহার 'বিশ্বগুডাদশ' নামক কাব্যে গুর্জরদেশের সম্পদের প্রাচুর্য্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

সকর্পূর-স্বাদু-ক্রমুকনবনীটীরসলসৎ
মুখাঃ সর্বাশাপদবিবিধদিব্যাম্বরধরাঃ।
কনদ্রত্নাকল্পাধুমধুমিতদেহাশ্চনৃস্বগণেঃ
যুবানো মোদন্তে যুবতিভিরমী তুল্যরতিভিঃ ॥১

অনুবাদ—সর্বসম্পদের আলয় অমর ভূমি এই গুর্জরদেশের যুবকগণের মুখে কর্পূর ও মিষ্ট সুপারি দ্বারা স্বাদু টাট্‌কা পান, তাহাদের গাত্রে বিচিত্র শ্লাঘ্য দিব্যবস্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারে শোভিত, সুগন্ধ চন্দনাদি দ্বারা তাহাদের দেহ অনুলিপ্ত, এবং তাহারা রতিতুল্য যুবতীগণের সহিত আহারবিহার করে।

তপ্তস্বর্ণসবর্ণমঙ্গকমিদং তাম্রো মৃদুশ্চাধরঃ
পাণী প্রাপ্তনবপ্রবালসরণী বাণী সুধাধারণী।
বক্ত্রং চ বিকচমিলদুৎপলদলশ্রীচোরণে লোচনে
কে বা গুর্জরসুভ্রুবামনবধে মনাংস ন মোহাবহাঃ ॥২

অনুবাদ—গুর্জরদেশের তরুণীগণের সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। তপ্তস্বর্ণবৎ তাহাদের কান্তি; অধর কোমল ও রক্তবর্ণ, তাহাদের হস্ত নবমৃণালসদৃশ সূক্ষ্ম, মুখের বাক্য সুধাতুল্য; মুখ পদ্মবৎ, নীল পদ্মের আভা তাহাদের চক্ষুতে প্রতিফলিত, গুর্জরের এই সুভ্রু বামাগণ কাহার মন না মুগ্ধ করে?

দেশে দেশে কিমপি কৌতুকাদদ্ভুতং লোকমানাঃ
সম্পাদ্যৈব দ্রবিণমমিতং সদ্ম ভূয়োঽপ্যবাপ্য।
সংযুজ্যন্তে সুচিরবিরহোৎকণ্ঠিতাভিঃ সতীভিঃ
সৌখ্যং বন্ধ্যাঃ কিমপি দধতে নন্দনং পত্নযুক্তাঃ ॥৩

অনুবাদ—গুর্জরবাসিগণ দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া নব নব আচার-ব্যবহার শিক্ষা ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। তাহারা ভ্রমণ ও বাণিজ্য সমাপনান্তে স্বদেশস্থিত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দীর্ঘ-বিরহোৎকণ্ঠিতা সতী পত্নীবর্গের সহিত সম্মিলিত হয়। এইরূপে সর্ব্বসম্পদশালী গুর্জরাতীগণ পরমসুখে কালযাপন করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কবি নরসিং গুজরাতে ভক্তি-ভাবের অভিনব স্রোত প্রবাহিত করেন। শ্রীকানাইয়ালাল এম. মুন্সী তাঁহার গ্রন্থে[১] বলেন, মীরার লালিত্য, সুরদাসের ব্যাকুলতা, এবং তুলসীদাসের গুরুগাম্ভীর্য্য নরসিংহের রচনায় না থাকিলেও তাঁহার কবিতায় ও গানে ভাবসম্পদের অভাব নাই। গুজরাতী কবিতার নির্জীব গতানুগতিকতা ভগ্ন করিয়া তিনি ইহাকে প্রাণ ও প্রেমে পূর্ণ করেন। কবি, ভক্ত, আর্য্য-সংস্কৃতির প্রতিমূর্ত্তি নরসিং মেহতার পদাবলী অদ্যাপিও গুজরাত ও কাথিয়াবাড়ের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সঙ্গীত। গুজরাতী সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। গুজরাতের অমর কবি নরসিংহের নিম্নলিখিত ভজনটি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবনসঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সবরমতী আশ্রমে এই ভজনটি প্রাতঃকালে গীত হইত।—

"বৈষ্ণবজনো তো তেনে কহিয়ে, জে পীড় পরাই জাণে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তে, মন অভিমান ন জাণে রে॥
সকল লোকমাঁ সহুনেবন্দে, নিন্দা তে ন করে কেনী রে।
বাছকাছমন নিশ্চল রাখে তো, ধন্য ধন্য জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাত রে॥
মোহমায়া ব্যাপে নহি তেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামসুঁ তালী রে লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমাঁ রে॥
বনলোভী নে কপটরহিত ছে, কামক্রোধ নে নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়ো তেনুঁ দরশন করতাঁ, কুল ইকোতের তার্যা রে॥

অনুবাদ—তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা ভক্ত, যিনি অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, যিনি দুর্গতদের সেবা করেন, যাঁহার মনে অভিমান নাই, যিনি সকলকে মান দেন, এবং কাহারও নিন্দা করেন না, ও কায়মনোবাক্যে নিশ্চল তাঁহারই জননী ধন্য। প্রকৃত ভক্ত সমদৃষ্টি ও তৃষ্ণাত্যাগী। তিনি পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করেন। তিনি পরধন স্পর্শ করেন না, তাঁহার জিহ্বা কখনও অসত্য

১। Guzrat and its Literature by K. M. Munshi দ্রষ্টব্য।

উচ্চারণ করে না, তিনি মায়ামোহে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার মনে তীব্র অনাসক্তি, রামনামে (ঈশ্বরের নামে) তিনি অশ্রুপাত করেন। তাঁহার শরীরে সর্ব্বতীর্থের সমাগম হয়। তিনি লোভমুক্ত, অকপট, ও কামক্রোধরহিত। নরসিংহ বলেন যে, সেরূপ ভক্তের দর্শনে একাত্তর কুল উদ্ধার হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভক্ত-কবি নরসিংহের যশোভাতি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই পরিব্যাপ্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সময়ে সময়ে যে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, সেই সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বহু প্রদেশে লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছিল। গুজরাতী কবি বিশ্বনাথ জানী ১৬৫২ খ্রীঃ এই সকল ঘটনা অবলম্বনে মনোরম আখ্যায়িকা রচনা করেন।

কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় সহরের নিকটবর্ত্তী তলাজাগ্রামে নরসিং মেহতা কোন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণদাস নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। নাগরগণই গুর্জ্জরে কুলীন ব্রাহ্মণ, এবং সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে সমাসীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁহারাই এই প্রদেশে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের সংরক্ষক ছিলেন। অল্প বয়সেই নরসিংহের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে অগত্যা অগ্রজের গলগ্রহ হইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি পরিব্রাজক সাধুদের সংস্পর্শে আসেন, এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের নিকট ব্রজভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। ‘গোবিন্দদাসের কড়চা’তে লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব ১৫১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জুনাগড়ের রণছোড়জীর মন্দিরে শুভাগমন করেন। নরসিং চৈতন্যদেব এবং মীরাবাঈ’র ন্যায় গোপীভাবের সাধক ছিলেন। গোপীভাবের আবেশে উন্মাদের মত তিনি নৃত্য করিতেন, গান গাহিতেন, এবং ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া আবেগভরে আহ্বান করিতেন। তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত আচরণে আত্মীয়স্বজনগণকে স্তম্ভিত হইতে হইত। একবার তাঁহারা নরসিংহের বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে মাণেকবাঈ নাম্নী ভক্তিমতী মহিলার সহিত নরসিংহের বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে কিন্নরবাঈ নাম্নী কন্যা ও শ্যামল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কপর্দ্দকশূন্য হইলেও নরসিং ও মাণেকবাঈ সময়মত কোন রকমে সেই পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রজপত্নীর কর্কশ বাক্যে ও দুর্ব্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া নরসিংকে গৃহত্যাগ করিতে

হয়। অতঃপর তিনি জুনাগড়ের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কোন মন্দিরে গোপনাথ মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাত দিন ও সাত রাত্রি ক্রমাগত অনাহারে ও অনিদ্রায় দেবারাধনার ফলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। এই দেবতাই নরসিংকে দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন। নরসিং প্রেম-চক্ষুতে এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সন্দর্শন করেন। এই দর্শনের পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তিনি দিবারাত্রি ভাব-বিহ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ-পত্নীকে কটুবাক্য প্রয়োগের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন; কারণ, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—কটুবাক্য শুনিয়া মনঃকষ্টে গৃহত্যাগ না করিলে তাঁহার হয়ত এই অমূল্য ভাব-নিধি লাভ হইত না। কিন্তু নরসিং তাঁহার ভ্রাতার গৃহে পুনঃপ্রবেশ না করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক জন কৃষ্ণভক্ত নরনারীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। এই সময় হইতে নরসিং রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ভজন ও পদাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। করতাল সহযোগে স্বরচিত ভজনাদি গানেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। জনসাধারণেও তাঁহার পদাবলীগুলি ক্রমশঃ গাহিতে লাগিল। এইরূপেই নরসিংহের ভজনাবলী গুজরাত ও কাথিয়া-বাড়ের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

ভক্ত নরসিং সর্ব্বক্ষণ ভাবনিমগ্ন থাকায় নিজের ও পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা আদৌ চিন্তা করিতেন না। শিশু যেমন জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তিনিও সেইরূপ ভগবানের উপর সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। নগরে ধর্ম্মনিষ্ঠ নরনারীগণই তাঁহার সংসার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশপূজ্য নাগর ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার বংশ-গৌরব বা জাতি-গৌরবের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি আপামর সাধারণের সঙ্গে মিশিতেন, এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভক্তি-রসাস্বাদন করাইতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে ভেদাভেদের ভাব, সেখানে পরমেশ্বর নাই ও প্রেমদৃষ্টিতে সকলেই সমান। এক বার মেথরাদি অস্পৃশ্য জাতির নিমন্ত্রণে তিনি তাহাদের গৃহে গমন করিয়া

নামকীর্ত্তনাদিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রভাতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে 'পাষণ্ড' 'ভণ্ড' ও 'জাতিভ্রষ্ট' বলিয়া তিরস্কার করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা সত্যই বলিয়াছ ; আমি ভণ্ডই। তোমরা যাহা ইচ্ছা আমাকে বলিতে পার, কিন্তু আমার প্রীতি গভীর। আমি জাতিবিচার করি না, হরিভক্তগণই আমার একমাত্র আত্মীয়। যে নিজেকে হরিভক্ত অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞান করে, সে পতিত।" জ্ঞাতিগণ নরসিংকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিল।

নরসিংহের ৭৪০টি পদাবলী সংগৃহীত হইয়া "শৃঙ্গারমালা" নামক গুজরাতী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কবি যেমন চণ্ডীদাস, সেইরূপ গুর্জ্জরের কবি নরসিং মেহেতা। দ্বারকার মন্দিরে তাঁহার যে প্রেমানুভূতি হয় তাহা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করেন—"গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার পরিণয় হয়েছে। আমি আর কিছুই চাই না। আমার পুরুষদেহ নারীদেহে পরিণত হয়েছে। আমি একজন গোপী। প্রধানা গোপিকা বিরহিণী রাধিকাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা-দানের সময় দেখিলাম, রাসরাজ কৃষ্ণ আমার হৃদয়বেদীতে সমাসীন।" বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ন্যায় গুজরাতী বৈষ্ণবসাহিত্যেও বিরহ-ভাবই প্রবল। নরসিংহের অধিকাংশ ভজন ও পদাবলী কৃষ্ণ বিরহ-ভাবে পরিপূর্ণ। নরসিং গাহিতেছেন, "প্রিয়তমের বংশী-ধ্বনি আমি শুনিতেছি। গৃহে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। আমি ব্যাকুল, অস্থির। প্রিয়তমের দর্শনলাভের উপায় কি ?" "প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অধরামৃতরস পান করিলাম।" "যমুনায় কি করিয়া জল আনিতে যাই ? প্রিয়তমের বাঁশরী আমায় পাগল করিয়াছে।" "তাঁর চক্ষু কি সুন্দর! তিনি আমাকে কামবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন।" "তাঁর চক্ষু কি সুন্দর! তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন। বিরহের উত্তাপে আমার জ্বরবোধ হইয়াছে। তাঁহার বিরহে আমি মৃতপ্রায়। প্রভু, আমায় দর্শন-স্পর্শন দাও।" শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত বিহার করিতেছেন, তদ্দর্শনে ভক্ত নরসিং চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"চাঁদ, রাতির মত চঞ্চল হইও না। তোমার জ্যোতিঃ যেন নিষ্প্রভ না হয়। মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হও, আমি আমার প্রিয়তমের মুখপদ্ম সন্দর্শন

কবি। আজ বড় শুভ রজনী। আমার প্রভুকে, আমার প্রাণকে আজ আমি লাভ করিয়াছি।”

নরসিং-রচিত “রাসসহস্রপদী” নামক আর একখানি পদাবলী-গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমানে ১২৩টি মাত্র পদ আছে। মূল গ্রন্থখানি বোধ হয় ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৪ অধ্যায়ের ভাবালম্বনে লিখিত। ইহাতে ভাগবতের বর্ণনা ও ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রত্যেক গোপীর নিকট আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিলেন ও তাঁহার বংশীর সপ্ত সুরে কিরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন উল্লসিত হইল—এই সকল বিষয় নরসিং মধুর ভাবের উচ্ছ্বাসে ও সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। গুজরাতী সাহিত্যে ব্রজ-প্রেমের প্রথম ও প্রধান উৎসই নরসিংহের পদাবলী। “বসন্তনাপদো” গ্রন্থে ফাগোৎসব এবং “হিন্দোলানাপদো” গ্রন্থে দোল-উৎসবের বর্ণনায় নরসিংহের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব সুপ্রকাশিত। ভাগবতের ১০ স্কন্ধ অবলম্বনে নরসিং ‘কৃষ্ণ-জন্ম’, ‘বাল্যলীলা’, ‘নাগ-দমন’, ‘দানলীলা’, ‘মানলীলা’, ‘সুদাম-চরিত্র’ ও ‘গোবিন্দগমন’ নামক সাতটি দীর্ঘ পদাবলী বিভিন্ন বয়সে গুজরাতী ভাষায় রচনা করেন। গ্রন্থগুলি মূলের অনুবাদ নহে। গ্রন্থকার মূলের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন। মূল সূত্রকে ভিত্তি করিয়া মৌলিক কল্পনার সাহায্যে তিনি এইগুলিকে অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। যাঁহারা মূল ভাগবত পাঠ করেন নাই, এইগুলি কবির মৌলিক রচনা বলিয়াই তাঁহাদের মনে হইবে। নরসিংহের রচিত “সুরতসংগ্রাম” নামক আর একটি মনোজ্ঞ রচনা আছে। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া এই আখ্যায়িকা অপূর্ব্ব। ইহাতে শ্রীরাধিকাপ্রমুখ দশ জন গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া গোপীনাথের হস্তে বন্দী হন। আখ্যানটি সম্ভবতঃ নরসিংহের কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির উজ্জ্বল চিত্র। কারণ নরসিং সংগ্রামস্থলে ‘গীতগোবিন্দ’-প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, এ কথার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্তি ও জ্ঞানের তত্ত্ব বর্ণনাতেই নরসিংহের ভাব ও ভাষার চরম উৎকর্ষ। উক্ত কবির চরিত্রের বিভিন্ন দিকের চিত্র ইহাতে পরিস্ফুট। কবি শুধু ভক্ত ছিলেন

না, তিনি পরমজ্ঞানী বা বৈদান্তিকও ছিলেন। জ্ঞান-ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তিনি গাহিয়াছেন—"স্নান, সেবা, পূজায় কি লাভ? গৃহে বসিয়া দানাদিরই বা সার্থকতা কি? ষড়্‌দর্শন পাঠেরই বা কি ফল যদি জাতিভেদ না যায়। এইগুলি ত জীবিকা-অর্জ্জনের কৌশলমাত্র।" নরসিং বলেন—"তত্ত্বদর্শন ব্যতীত রত্নচিন্তামণিতুল্য অমূল্য জীবন বৃথা হইল।" তাঁহার বেদান্ত প্রয়োগমূলক। তাঁহার মতে "জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম—এই ভেদজ্ঞান দ্বারা সত্যবস্তু লাভ হয় না। 'আমি' 'তুমি' ভেদ ত্যাগ না করিলে গুরুকৃপা হয় না।" নরসিং তাঁহার পদাবলীতে আর্যনীতির নির্য্যাস সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্ব-প্রচারিত আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। কর্মজীবনে যাহা তিনি পালন করিযাছিলেন তাহাই তিনি ভজনে ও পদাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুপ্রেরণা আজও গুজরাতের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে, তাঁহার বাণী আজও গুজরাতবাসীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ভাবের সরসতায় এবং ভাষার সৌন্দর্য্যে গুজরাতী ভাষায় এখনও কোন কবি নরসিংকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বোপরি ছিলেন পরম কৃষ্ণ-ভক্ত। তাঁহার প্রাণ কৃষ্ণময় ছিল। জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নে তাঁহার মন কৃষ্ণচিন্তা করিত। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ শুধু সাকার ও সগুণ মাত্র নহেন, তিনি আবার নির্গুণ ও নিরাকার। সেই কৃষ্ণ সকল নরনারীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। নরসিং পরম জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা নিম্নলিখিত স্ব-রচিত ভজনে সুপরিস্ফুট।—

"গগনে নিরীক্ষণ কর, দেখ, কে ইহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া 'আমি সেই', 'আমি সেই' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী শ্যামের চরণে আমি মরিতে চাই, কারণ, ইহলোকে বা পরলোকে কৃষ্ণের তুলনা নাই। অসীম শ্যাম-শোভায় আমি আত্মহারা, অনন্ত উৎসবানন্দে আমার মন চির নিমগ্ন। জড় ও চৈতন্য এক প্রেমময়েরই প্রকাশ। প্রেমে অনন্ত জীবনকে আশ্রয় কর। শূন্যে দেখ, যেখানে কোটি উদিত রবির জ্বলন্ত জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্ণালোকে ঊর্দ্ধ সপ্ত ভুবন উজ্জ্বল, সেখানে স্বর্ণময় দোলায় বিরাজিত হইয়া সচ্চিদানন্দ আনন্দক্রীড়া

করিতেছেন। তথায় বাতি, তৈল ও সূত্র বিনা চির-প্রদীপ অচল ঝলকে জ্বলিতেছে। এসো, এই নিরাকার পুরুষকে দর্শন করি, কিন্তু এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা নহে। এসো, এই পরমপুরুষের প্রেম-রস পান করি, এই স্থূল জিহ্বায় নহে। এই অজর অবিনাশী পুরুষ অধঃ ও উর্দ্ধে ব্যাপ্ত ও বাক্য-মনের অতীত। নরসিংহের প্রভু সর্বব্যাপী। ভক্তগণ প্রেমচক্ষে তাঁহার দর্শন পান, অপরে নহে।"

বার

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস্ *

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মনীষী ও চিন্তাশীল লেখক এইচ. জি. ওয়েলস্ ১৯৪৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ওয়েলস্ বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, ঔপন্যাসিক ও ভবিষ্যদ্বক্তা। আধুনিক ইংরাজ ও মার্কিণ যুবকগণের অনেকেই তাঁহার চিন্তায় প্রভাবিত। বড়-ছোট প্রায় এক শত পুস্তকের তিনি প্রণেতা। বাল্যে তিনি জীবন আরম্ভ করেন বস্ত্রবিক্রেতার সহকারীরূপে, মৃত্যুকালে তিনি জগদ্বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

কেণ্টের অন্তর্গত ব্রোমলে নামক স্থানে এইচ. জি. ওয়েলস্ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২১ শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জোসেফ ওয়েলস্ ক্রিকেট খেলায় সুদক্ষ এবং অনুরাগী উদ্যানপাল ছিলেন। তাঁহার মাতা সারা ওয়েলস্ অবিবাহিত জীবনে প্রথমে সাসেক্স সহরের এক বৃহৎ পরিবারে সামান্য পরিচারিকা নিযুক্ত হন; পরে উক্ত গৃহে তিনি প্রধানা পরিচারিকার পদে উন্নীতা হইয়াছিলেন। সারা ধর্মপরায়ণা, সুশীলা এবং প্রচলিত ধারার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্না রমণী

* 'প্রবর্তক' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৫৩) প্রকাশিত।

ছিলেন। জোসেফ ও সারা উভয়ে মিলিয়া ব্রোমলেতে একটী ছোট চীনাবাসনের দোকান করিয়াছিলেন। জোসেফ বাগানের কাজ ও খেলা ভালবাসিতেন, ব্যবসায় তাঁহার পছন্দ হইল না। তাঁহার ক্রিকেট খেলার সঙ্গিগণই প্রধানতঃ দোকানের ক্রেতা হইলেন। তাঁহারা ব্যবসায়ে সফল হইলেন না। পিতা জোসেফের ন্যায় পুত্রের নীল চক্ষু ছিল এবং পুত্র বাল্যেই পিতার বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যমশীলতার প্রশংসা করিতেন। পুত্রকে গণ্যমান্য নাগরিক করিবার আগ্রহ মাতার হৃদয়ে বলবান্ ছিল। মাতা পুত্রকে বলিতেন, "কি দুঃখের বিষয়, তোমার পিতা ভদ্রলোক নয়।" তাঁহার স্বপ্ন ছিল, পুত্র একজন উপযুক্ত বিক্রেতা হইবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পুত্রকে তের বৎসর বয়সে উইণ্ডসরে এক কাপড়ের দোকানে সহকারী বিক্রেতা হইতে পাঠান। এক বৎসর পরে তাঁহাকে মিডহার্ষ্টে এক কেমিষ্টের দোকানে বিক্রেতারূপে দেখা যায়। ওয়েলস্ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "বাল্যের এই দুই বৎসর অত্যন্ত ঘৃণার্হ ছিল। ঐসময়ে একটী জঘন্য ঘরে শয়ন, অপ্রচুর ভোজন এবং দোকানে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। যখন আমার বয়স পনের বৎসর, তখন এক রবিবার প্রাতে আমি ছুটিয়া যাই ও বলি, 'বরং অনাহারে মরিব, তবু বস্ত্রবিক্রেতার কাজ আর করিতে পারিব না।' প্রাতরাশ না খাইয়া পদব্রজে সতের মাইল দৌড়াইয়া জননীকে যেরূপে এই চরম কথা শুনাইয়াছিলাম, তাহা আমার স্মৃতিতে এখনও জাগরূক। আমি খুব মরিয়া হইয়াই এই অপ্রীতিকর কাজ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন মনে হয়, আমি জীবনে যাহা কিছু করিয়াছি তাহার মধ্যে এই কাজটিই সব চেয়ে বড়।"

বাল্যকাল হইতেই ওয়েলস্ অতিশয় অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে তাঁহার একটি পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তিনি কিছুকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি অধ্যয়নের সুযোগ ও সময় পান। মানবের জীবনে দেখা যায় যে, বিপদই সাধারণতঃ সম্পদের পথ উন্মুক্ত করে। ওয়েলস্ বলেন, "আমি যে আজ জীবিত আছি এবং আত্মজীবনী লিখিতেছি, বস্ত্রবিক্রেতার সহকারী হইয়া জীবন কাটাই নাই বা মরি নাই, তাহার কারণ সম্ভবতঃ শৈশবে আমার পা ভাঙ্গিয়াছিল।" তের বৎসর বয়সে বালক ওয়েলস্ স্কুল ত্যাগ

করিয়া কাপড়ের দোকানে সহকারী বিক্রেতার কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন তিনি সামান্যমাত্র লেখাপড়া জানিতেন এবং তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল। মিড্‌হার্ষ্টে কেমিষ্টের দোকানে কাজ করিবার সময়ে কোন বিদ্যালয়ে তিনি কয়েকটি ক্লাসে যোগ দিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এখান হইতে দু'একটি সার্টিফিকেট লইয়া গৃহশিক্ষক হইবার জন্য সোমারসেটে উকোহোলে তিনি গমন করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা বিফল হইল। আবার বস্ত্রবিক্রেতার কাজ করিয়া তিনি মিড্‌হার্ষ্ট গ্রামার স্কুলে শিক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। এখানে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সপ্তাহে এক গিনী বৃত্তি লাভপূর্ব্বক তিনি লণ্ডনে সাউথ কেন্সিংটন বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে ওয়েলস্ বিখ্যাত অধ্যাপক হাক্সলীর নিকট অধ্যয়ন করিতেন। যথাসময়ে তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পাইয়া বি এস্-সি পাস করেন। উক্ত সাফল্যের দ্বারা তিনি সেণ্ট্ জন্স উড নামক স্থানে হেন্‌লে হাউস স্কুলে শিক্ষকের পদ লাভ করেন। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর তাঁহার ভাগ্যে ছিল কঠোর পরিশ্রম ও সামান্য উপার্জন। তিনি লণ্ডনের প্রাচীন ইউনিভার্সিটি করেস্পণ্ডেন্স কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার যে অল্প অবসর মিলিত, তাহাতে তিনি প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক একটী গ্রন্থ ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, তিনি রক্তবমন করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ক্ষয়কাশের আশঙ্কা হয়। তিনি বাধ্য হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ইষ্টবোর্ণে গমন করেন। অসুস্থ হইয়া তিনি এখন প্রবন্ধাদি লিখিয়া "পলমল গেজেটে" নাম না দিয়া প্রকাশ করিতেন। এ উপায়ে তিনি বহু পরিচিত সাহিত্যিকের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইল। ওয়েলসের প্রথম জীবনের একটি সুন্দর ইতিবৃত্ত জোফ্রে ওয়েষ্ট্ প্রকাশ করিয়াছেন।

ওয়েলসের নাতিদীর্ঘ ক্ষুদ্র গ্রীবা এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মস্তিষ্ক ছিল। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় ও পাটলবর্ণ মুখমণ্ডল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুন্দর ও সৌম্য ছিল। অশীতিতম বর্ষ বয়সেও তাঁহার ললাট সঙ্কুচিত হয় নাই। লণ্ডন মহানগরীর রিজেণ্ট পার্কস্থিত ভবনে বসিয়া তিনি অক্লান্তভাবে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল

পুস্তকের পর পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে যে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন, তাহা রুসো এবং টলষ্টয়ের আত্মজীবনীর সমকক্ষ। আত্মজীবনীতে ওয়েলস্ এই মূল্যবান্ কথাটি বলিয়াছেন, "মানুষের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব জীবনীলেখক বা আত্মজীবনীকার কেহই ধরিতে পারেন না। মানুষ নিজেকে যেরূপ কল্পনা করে, তাহাই আত্মজীবনীতে প্রকাশ করে। এই কল্পিত মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে স্বতন্ত্র। অপর কর্তৃক যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, জীবনীলেখক তাহাই চিত্রিত করেন। কিন্তু প্রকৃত মানুষ উভয়ের অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়।" বাল্যে তিনি জীবনের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সুদৃষ্টিতেই তিনি দেখিয়াছেন। এই সময়ে শ্রমজীবিগণের কঠোর জীবনের আস্বাদ তিনি লাভ করেন এবং সুবিধাবাদী ধনিগণের মনোভাবের সহিত পরিচিত হন। বিজ্ঞান কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হাক্সলীর নিকট অধ্যয়নকালে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হন। যে এক বৎসর ওয়েলস্ ডারুইনের বন্ধু উক্ত অধ্যাপক হাক্সলীর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি জীবনের সর্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ বৎসর বলিয়া মনে করেন। হাক্সলীর নিকট তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লাভ করেন এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মনের পার্থক্য অবগত হন। এই বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টিতেই তাঁহার সমগ্র জীবন পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা যখন পরিচারিকা ছিলেন তখন তিনি শিশু মাত্র। শৈশবেই তিনি সাসেক্সে আপপার্কস্থিত ভৃত্যদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রত্যেক সন্ধ্যায় মাতার সহিত বসিতেন এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বৈষম্য লক্ষ্য করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ধনীদের ভোগাধিকারের ন্যায্যতায় বিশ্বাস হারাই।'

ভগ্নস্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করিয়া ওয়েলস্ প্রথম বিবাহ করেন। এই প্রেম পরিণয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রথমা পত্নীর সহিত তাঁহার আদর্শগত ঐক্য ছিল না। ঐ সময় তিনি শেলীর ভাবে ভাবিত হইয়া প্রেম-পরিণয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ওয়েলস্ অচিরে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ক্যাথারাইন রবিন্স। ক্যাথারাইন ছিলেন অতিভাষী ও মেজাজী রমণী। সেইজন্য দ্বিতীয় বিবাহও আশানুরূপ

সুখকর হয় নাই। গৃহস্থাপন বা পুত্রলাভের ইচ্ছা তাঁহার মনে তখন স্থান পায় নাই। অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণায় তাঁহার যৌবন অভিভূত হইয়াছিল। অবাধ অধ্যয়ন ও স্বাধীন জীবনই ছিল তাঁহার যৌবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিছুকাল তিনি ফেবিয়ান সোসাইটীর সভ্য হইয়াছিলেন। উক্ত আন্দোলনের নায়ক সিডনী ও ওয়েবের সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই সময় বার্ণাড শ এবং র‍্যাম্সে ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া তিনি বিদ্রোহশূন্য সমাজবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। উক্ত সোসাইটির মত ও পথ সমালোচনা-পূর্বক সভ্যগণের সভায় তিনি একবার এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সমালোচনার ফলে তাঁহার সঙ্গে সভ্যগণের মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনি ফেবিয়ান সোসাইটি ত্যাগ করেন। সংগ্রামেই তাঁহার জীবন আরম্ভ হয় এবং কিছুকাল চলিতে থাকে। সংগ্রাম বন্ধ হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া লেখনী ধারণ করেন এবং সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। সাহিত্যসাধনার দ্বারাই তাঁহার জীবনের চরম সাফল্য ও উৎকৃষ্ট বিকাশ সাধিত হয়। ওয়েলস্ সত্যই বলিয়াছেন, 'তাঁহার জীবনেতিহাস গৃহের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে মন্থরগতি মাত্র।'

তিনি যে বিজ্ঞান কলেজে পড়িতেন সেই কলেজে ফিনিক্স নামে এক পত্রিকা ছিল। সেই পত্রিকাতে ছাত্রজীবনে তিনি 'কালযন্ত্র' (টাইম মেসিন) শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। উহার কিয়দংশ ন্যাশনাল অবজারভারে এবং নিউ রিভিউতে প্রকাশিত হয়। নিউ রিভিউ পত্রিকা প্রবন্ধাদির জন্য তাঁহাকে একশত পাউণ্ড পারিশ্রমিক দেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'কালযন্ত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই ওয়েলসের প্রথম উপন্যাস। সমালোচকগণ উক্ত গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না; পরে গ্রন্থখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই গ্রন্থে তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী আরম্ভ হয়। বস্ত্রবিক্রেতার সহকারী কিরূপে জগদ্বিখ্যাত ভবিষ্যৎ বক্তার উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ৮৭২৭০১ খৃষ্টাব্দে মানবজাতি জীবন-সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া কিরূপে আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করিবে তাহারই কল্পিত চিত্র 'কালযন্ত্রে' আছে। ওয়েলস্ স্বয়ং শৈশবে জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া জীবন ও জগৎ অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন। সেই জন্য

বোধ হয়, তিনি সংগ্রামক্লিষ্ট ভ্রাতৃগণকে উক্ত অন্ধকার হইতে শান্তি ও সুখের আলোকে লইয়া যাইবার জন্য আজীবন লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সেই কল্পিত সত্যযুগে দুই শ্রেণীর লোক থাকিবে—ইলোয়ী এবং মরলক্। ইলোয়ীগণ পৃথিবীতে দুঃখের স্পর্শ পায় নাই। তাহাদের সোনালী চুল কুঞ্চিত এবং চক্ষু প্রীতিপূর্ণ। তাহারা চিরসুখী ও চিরসুন্দর। শত শত যুগের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-সাধনা তাহাদিগকে কুসুমবৎ রমণীয় ও রোমাঞ্চকর প্রাণীরূপে পরিণত করিয়াছে। মরলকৃগণ আসুরিক স্বভাবসম্পন্ন, কঠোর পরিশ্রমী ও অমানুষিক ভাবযুক্ত। কালযাত্রী শীঘ্রই আবিষ্কার করে যে, মরলকৃগণ ইলোয়ীগণকে খাদ্য জোগায়। শিকারী যেমন স্বীয় ভোগের জন্য পক্ষী পোষণ করে, মরলকৃগণ তদ্রূপ ইলোয়ীগণকে স্বীয় সুখের জন্য পরিপুষ্ট করে। কারণ, মরলকৃগণ মাঝে মাঝে তাহাদের ভূমধ্যস্থ আবাস হইতে উপরে উঠিয়া কয়েকটি ইলোয়ী লইয়া যায় ও ভক্ষণ করে। কাল-যাত্রী শীঘ্রই বুঝিলেন, ইলোয়ীগণ ধনীর সন্তান এবং মরলকৃগণ শ্রমিক-পুত্র। ওয়েলস্ বলেন, 'কার্লোভিঞ্জিয় রাজাগণের ন্যায় ইলোয়ীগণ বিফল অযোগ্য স্তরে অবনত হইয়াছে। কিন্তু, তাহারা এখনও পৃথিবীর সুখসম্পদের অধিকারী ও ধনভোগী। কিন্তু মরলকৃগণ পুরুষানুক্রমে ভূমধ্যবাসের ফলে অন্ধকারপ্রিয়, দিবালোক তাহাদের চক্ষে অসহ্য।'

রাস্কিনের একটি মন্তব্য আছে যে, যদি কোন দেবদূত স্বর্গ হইতে আবির্ভূত হন, তিনি নিশ্চয়ই মানুষের গুলীর আঘাতে প্রাণ হারাইবেন। উক্ত মন্তব্য অবলম্বন করিয়া ওয়েলস্ 'অদ্ভুত পরিদর্শন' নামক একখানি চিত্তাকর্ষক পুস্তক রচনা করেন। ওয়েলসের এই পুস্তকে আছে, পল্লীস্থ এক পাদ্রীর বন্দুকের গুলীতে এক দেবদূত স্বর্গ হইতে পতিত হন। দেবদূত মানবগণের সহিত বাস ও ব্যবহার করিয়া তাহাদের আচরণে ও নৈতিকতায় স্তম্ভিত হন। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার স্বীয় মনোভাব দেবদূতের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ডাঃ মোরিয়োর দ্বীপ' নামক ওয়েলসের আর একখানি সুন্দর উপন্যাস আছে। উক্তগ্রন্থে চিন্তাশীল লেখক দেখাইয়াছেন যে, 'আধুনিক মানুষের মধ্যে পশুভাব প্রবল। সামাজিক নিন্দা এবং যুক্তিবিচারের দ্বারা এই পাশবিকতা কিঞ্চিৎ দমিত হইয়াছে মাত্র। একজন

বড় সাজন ডাঃ মোবিয়ো আবিষ্কার করিয়াছেন, 'অস্ত্রোপচার দ্বারা ক্রমবিকাশের গতি বর্ধিত করিয়া পশুকে মানুষে পরিণত করা যায়। তিনি তদনুযায়ী শূকর, ষাঁড় ও কুকুরকে মানবরূপ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মানবরূপ সংরক্ষণের জন্য তাহাদিগকে সর্বদা শিক্ষা ও নিয়মের অধীন রাখিতে হয়।' ভাবার্থ এই—মানবাকার ধারণ করিলেও আমাদের অনেকের মনে পশুভাব এত প্রবল যে, তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু শরীরের দিক দিয়াও নহে, মনের দিক দিয়াও বানর মানবের পূর্বপুরুষ। শূকর, বানর এবং ষাঁড় সুন্দর সজ্জিত মানববেশে প্রভুত্ব করিতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান যখন যুবকমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তখন ওয়েলস্ আবির্ভূত হন। অন্যান্য ইংরেজ যুবকগণের ন্যায় ওয়েলস্ বিজ্ঞানকে তাঁহার জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। বানর হইতে মানবে অবতরণ ডারুইন কর্তৃক তখন প্রমাণিত হইয়াছে। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেলের মত তখন শিক্ষিত যুবক কর্তৃক পরিত্যক্ত। হাক্সলী ও স্পেন্সারের প্রগতিবাদ ও জড়বাদের দ্বারা যুবকসমাজ অভিভূত। মিল ও বেন্থাম এই মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধিকতম সুখই সমাজের উদ্দেশ্য। এই চিন্তাপ্রবাহে পরিবেষ্টিত হইয়া ওয়েলস্ যৌবনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূরীকরণের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি বিজ্ঞানের অলৌকিক শক্তি প্রচার করিয়া বর্তমান যুগের আগমনী সংগীত গাহিতে লাগিলেন। সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও মধ্যযুগীয় অনুদারতা উৎপাটন মানসে তিনি কতকগুলি সামাজিক উপন্যাস লিখিলেন। 'টোনোবাঙ্গে' তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া অনেকের অভিমত। ভাবী সুখরাজ্যের স্বপ্নলোক তাঁহার উপন্যাসগুলিতে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত।

ওয়েলস্ প্রথমে লীগ অব নেশনসে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরে উহাতে তিনি বিশ্বাস হারাইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, উক্ত সার্বজাতিক সম্মিলনী বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রধান বিঘ্ন। তিনি লেনিন এবং রুজভেল্টের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন! কিন্তু কাহারও নিকট তিনি উৎসাহ

ও সহানুভূতি পান নাই। ট্রট্স্কির মতে, ওয়েলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর লেনিন চীৎকারপূর্বক বলিয়াছিলেন, "কি মধ্যম শ্রেণীর লোক! কি ক্ষুদ্রাশ্রয় ব্যক্তি।" পরে ওয়েলস্ ষ্টালিনের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, সোভিয়েট আদর্শ আদৌ তাঁহার ভাবানুকূল নহে। ওয়েলস্ ষ্টালিনকে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার জন্য উহারা প্রাচীনপন্থী প্রচারক মাত্র।" প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ওয়েলসের ধারণা হইল, 'মানবেতিহাসের অজ্ঞতাই বিশ্বব্যাপী উদার সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়।' সেইজন্য তিনি 'ইতিহাসের উপক্রমণিকা' নামক একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে জীবতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে 'প্রাণী বিজ্ঞান' নামক আরও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার সহযোগী ছিলেন তাঁহার কৃতীপুত্র জি. পি. ওয়েলস্ এবং অলডাশ হাক্সলীর ভ্রাতা জুলীয়ান্ হাক্সলী। তৎপরে তাঁহার তৃতীয় বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার নাম 'মানবজাতির সুখ, সম্পদ ও শ্রম'। এই তিনটী অভিধানতুল্য বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া ওয়েলস্ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা এই পুস্তকত্রয় সমধিক বিক্রীত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থত্রয় প্রকাশ করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার অসংখ্য পাঠকগণের মধ্যে তিনি এক প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একদল বুদ্ধিমান পাঠক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত এবং তাঁহাদের সপ্রেম প্রচেষ্টায় উৎকৃষ্টতর জগৎ সৃষ্ট হইবে। তিনি স্বর্গতুল্য যে জগতের স্বপ্ন দেখিতেন, সে জগতের সকল লোকই সুখী, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্। সেই জগতে অভাবের অন্ধছায়া প্রবেশ করিতে পারে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সুযোগ পায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাদের জীবন কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত?' তিনি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, 'সংস্পৃষ্ট প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া।'

'পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' শীর্ষক তাঁহার একখানি ছোট বই আছে। উপন্যাসের মত বইখানি সুপাঠ্য ও সরল। পৃথিবীর ইতিহাসের আধুনিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। কোন দেশের বা

কোন কালের ইতিবৃত্তি ...নের পূর্বে এই পুস্তক পাঠ অত্যাবশ্যক। সুসাহিত্যিক ও সুলেখক বলিয়া বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থগুলি সাধারণ পাঠকপাঠিকার অবগতির জন্ম রচিত। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল তথ্যগুলি জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে। বিশ্ব-সমাজকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের জ্ঞানালোকে সংস্কার ও সংগঠন করিয়া স্বর্গতুল্য সুখময় ও শান্তিময় করিবার স্বপ্ন ওয়েলস্ আজীবন দেখিয়াছেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাজশাসন করিবেন—প্লেটোর মত ওয়েলস্ও এই মত পোষণ করিতেন। তাঁহার আত্ম-জীবনীতে আছে, 'প্রকৃত সত্য এই যে, পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনতা ও প্রাচুর্য্য লাভের প্রধান বিঘ্ন দেশ নায়কগণের অনুদারতা, অজ্ঞান ও অহমিকা। দেশনায়কগণ ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, কুশিক্ষা, সংকীর্ণ আদর্শ, অসাধুতা, অসৎ অভ্যাস এবং ভীতির বশবর্তী বলিয়া মানব সমাজে স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। বন্দরে আগতপ্রায় জাহাজ যেমন কাপ্তেনের কোনও ভুলক্রমে বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ সমাজভুক্ত আমরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অদূরে থাকা সত্ত্বেও, নেতাগণের দোষে এই গুলির অধিকারী হইতেছি না। ভবিষ্যৎ নায়ক এবং নাগরিকগণের এই বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।'

ওয়েলস্ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তারাশি একত্রিত করিয়া "প্রত্যাশা" নামে একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই অদ্ভুত পুস্তক পাঠক-সমাজে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল! পুস্তক প্রকাশের পর জনৈক ইংরাজ সমালোচক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্ম ওয়েলস্কে বৃটিশ সরকারের নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য এবং তৎসঙ্গে ইংলণ্ডের কবি-সম্রাটের (Poet Laureate) মত শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যদ্বক্তা বা প্রফেট্ লরেট্ (Prophet Laureate) উপাধি প্রদান করা উচিত। উক্ত গ্রন্থে ওয়েলস্ যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই সফল হইয়াছে। যখন বইখানি লিখিত হয় তখন মোটর-কার বা মোটর-বাস ঘণ্টায় ২০ মাইলের বেশী দৌড়াইতে পারিত না, এবং সুদূর গন্তব্যস্থলে মোটর গাড়ীতে

পৌছান অনিশ্চিত ছিল। সেই সময় ওয়েলস্‌ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই মোটর গাড়ী একদিনে তিনশত মাইল চলিতে পারিবে এবং মোটর ও রেলের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতা হইবে। তিনি মোটর রোড ও মোটর-ট্রেনের কথাও লিখিয়াছিলেন। তাহার উক্ত গ্রন্থে 'যুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়টি অতিশয় অদ্ভুত। অদূর ভবিষ্যতের যুদ্ধে এরোপ্লেনের প্রভাব তিনি কল্পনার চক্ষে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সকল দেশের লোক সহজে এরোপ্লেনে একদেশ হইতে অন্যদেশে যাতায়াত করিতে পারিবে। ভবিষ্যতের যুদ্ধকে তিনি প্রধানতঃ এরোপ্লেনের যুদ্ধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মিলিটারী ট্যাঙ্কের আবিষ্কারের পূর্বেই তিনি উহার ভাবী প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, বৈজ্ঞানিক ওয়েলসের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল।

"নূতন মেকিয়াভেলি" নামক একখানি উপন্যাসে ওয়েলস্‌ তাহার রাজনৈতিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "বৃটেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নবভাবে সুগঠিত এবং আদর্শ জাতিতে পরিণত দেখিয়া আমি মরিতে চাই। ইংলণ্ডের এবং সাম্রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জনসাধারণ যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতে পারে আমি তাহাই দেখিতে চাই।' বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উচ্চ শিক্ষার সাহায্যে মানব জাতিকে অধিকতর ধীসম্পন্ন ও শান্তি-প্রিয় করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টির স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখিয়াছিলেন। "নূতন মেকিয়াভেলি" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছিলেন, বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, শিল্প, ঔষধ ও স্বাস্থ্যের অভূতপূর্ব প্রগতি দেখিয়া আমার মনে হয়, উহাদের ভবিষ্যতের উন্নতির সম্ভাবনা কল্পনাতীত। গত শতাব্দীতে যে সামান্য প্রগতি হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিকতর প্রগতি বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব হইয়াছে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে কত অধিক প্রগতি হইবে, তাহা এখন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মেকিয়াভেলি ছিলেন ইতালীর রাজপুত্র। ইতালীর রাজনৈতিক আদর্শে ওয়েলসের প্রগাঢ় আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃহৎ সংস্কার সুসম্পন্ন করিতে হইলে শক্তিশালী পুরুষের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক, ইহা ওয়েলস্‌ বিশ্বাস করিতেন। মনুষ্যজাতি জীবনের যে পূর্ণতা ও স্বাধীনতার

স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহা ভবিষ্যতে সে লাভ করিবে, এইরূপ বিশ্বাসও ওয়েলসের ছিল। তিনি কোন আন্দোলনে যোগদান না করিবার কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করিতেন। তিনি মনে করিতেন, এইরূপেই তাঁহার মন স্বাধীন আছে। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য সহজেই অনুমেয়। পক্ষী স্বীয় পক্ষের নিম্নে বায়ুর চাপ অনুভব করিয়া মনে করে যে, সে সম্ভবতঃ বায়ুশূন্য আকাশে আরও ভালভাবে উড়িতে পারে। কিন্তু বায়ু ব্যতীত উড্ডয়ন অসম্ভব, এই তথ্য পক্ষীর অজ্ঞাত বলিয়া সে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়। মানব সমাজে স্থায়ী পূর্ণতা ও প্রাচুর্য বিরাজ করিতে পারে, ওয়েলস্ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। ওয়েলস্ বিশ্বসমস্যার যে সকল সমাধান দিয়াছেন সেইগুলি সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর হইলেও, অসমীচীন ও অসম্ভব বলিয়া তিনি কল্পনাপ্রিয় ভবিষ্যদ্বক্তাই রহিলেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মহামানব ওয়েলসের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান অসম্ভব। তিনি অল্পাধিক একশত গ্রন্থের প্রণেতা। চিন্তা-জগতে তাঁহার অবদান অমূল্য ও অপরিসীম। বৈজ্ঞানিক মনীষী, ভবিষ্যৎবক্তা এবং ঔপন্যাসিকরূপেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সামান্য অবস্থা হইতে বিশ্ববরেণ্য উচ্চ অবস্থায় অধ্যবসায়বলে কিরূপে উন্নত হওয়া যায়, তাঁহার জীবন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজেই তাঁহার জীবনকে যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীতের প্রধান সুর ব্যক্তিত্বের, মস্তিষ্কের বিকাশ। ওয়েলস্ সমগ্র জীবনে মস্তিষ্কের বিকাশ সাধনেই অতিবাহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মানব-জীবন প্রতিযোগিতা, অশান্তি, সংগ্রাম ও অভাবসঙ্কুল। তিনি স্বপ্নলোক সৃজনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মানুষ তাঁহার কল্পিত স্বপ্নলোকের বর্ণনা পাঠে আনন্দ লাভ করিত। তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির মধ্যে পরিগণিত। বিংশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে তাঁহার প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিবে। তাঁহার মত একাধারে ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক জগতে বিরল। এ্যাণ্ডি মরইস বলেন, "যদিও ওয়েলস্ আধুনিক মানুষকে বাস্তব মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি তিন দশক তাঁহার প্রভাব ইংরাজি পাঠক সমাজে অতুলনীয় ছিল। তাঁহার মত অন্য কেহ এত সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন নাই যে

সমাজ তাহার শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে না তাহা কাচের মত ভঙ্গুর। উন্নততর সমাজের চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়া তিনি বর্ত্তমান সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলেই ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিঞ্চিত উন্নততর হইবেই।" আর্থার কম্পটন বিকেট বলেন, "বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে ওয়েল্‌সের বিপুল প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হইবে। তিনি বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী মৌলিক আদর্শবাদী।"

তের

তুলসীদাস *

গ্রিফিথ্ সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে বাইবেল যেরূপ সমাদৃত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তুলসীদাসের রামায়ণ সেইরূপ আদরণীয়। রাজপুতান ও যুক্তপ্রদেশাদিতে প্রত্যেক হিন্দুগৃহে তুলসীরামায়ণ নিত্য পঠিত ও পূজিত হয়। অনেক গৃহে প্রত্যেক নরনারীর জন্য এক একখানি রামায়ণ আছে।

নাভাজী তাঁহার 'ভক্তমাল' নামক হিন্দী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"কলি কুটিল জীবনিস্তার হেতো বাল্মীকি তুলসী ভযো।
ত্রেতা কাব্য নিবন্ধ করিব সত কোটী রামাযণ।
ইক অক্ষর উদ্ধরৈ ব্রহ্ম ইত্যাদি করি জিন হোত পারাযণ॥
অব ভক্তনি সুখ দৈন বহুরি বপু ধরি লীলা বিস্তার।
রামচরণ রসমত্ত রটত অহনিস ব্রতধারী॥
সংসার অপারকো পারকো সুগম রূপ নৌকা লিযো॥"

অনুবাদ—জীবোদ্ধারনিমিত্ত কুটিল কলিযুগে বাল্মীকি তুলসীরূপে অবতীর্ণ। ত্রেতাযুগে বাল্মীকিরচিত সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা শত কোটি। বাল্মীকি

* উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষরের জীবোদ্ধার-শক্তি আছে এবং ইহা ব্রহ্মহত্যাদি পাপও দূর করিতে সমর্থ। বাল্মীকিই ভক্তকে কৃপা করিবার জন্য এবং রামলীলা বিস্তারহেতু তুলসীরূপ ধারণপূর্ব্বক রামরসমত্ত হইয়া দিবানিশি অপার সংসারসাগর পারের সবল সহজ তরি হিন্দী রামায়ণ রচনা করিয়াছেন।

তুলসীদাস তাঁহার 'রামায়ণে'র নাম দিয়াছেন 'রামচরিতমানস'। তুলসীদাসের রামায়ণ বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। বাংলায় বোধ হয় ইহার দুইটী সংস্করণ হইয়াছে। এফ্. এস. গ্রাউস সাহেব ১৮৭৬খ্রীঃ এই পুস্তকের একটী ইংরাজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। ল্যাটিন, ইতালিয়ান্ ও ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছে। সম্প্রতি লেনিনগ্রাডের সোভিয়েট একাডেমির অধ্যাপক বারানিকভ্ রুশ ভাষায় তুলসীরামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। বারানিকভ্ সাহেব বলেন, "আমার অনুবাদ পাঠে রাশিয়ায়, জনসাধারণ হিন্দুসাহিত্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবে। রুশ অনুবাদে মৌলিক ছন্দ রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত অনুবাদ এই বৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।"

তুলসীদাস ষোড়শ শতাব্দীতে যুক্তপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। স্বীয় পত্নীর প্রতি তিনি অতিশয় আসক্ত ছিলেন, পত্নীর ভর্ৎসনায় সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করেন। তিনি সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ কাল কাশীতেই অতিবাহিত করেন। কাশীতে তাঁহার তপঃস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৫৭৫ খ্রীঃ অযোধ্যায় অবস্থান কালে তিনি 'রামচরিতমানস' লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৬২৫ খ্রীঃ তাঁহার দেহত্যাগ হয়। জগতের শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিদের মধ্যে তুলসীদাস অন্যতম। তুলসীদাস রাজপুতানার প্রসিদ্ধ মহাভাবসাধিকা মীরাবাঈ-এর সমসাময়িক ছিলেন। মীরাবাঈ যখন আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি তুলসীদাসজীকে একটী পত্রে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখেন।—

"ঘরকে হমারে স্বজন জেতে সবন উপাধি বঢাই।
সাধুসংগ অরু ভজন করত মোহি দেত কলেশ অথাই॥

বালপনামে মীরা কীনী, গিরিধরলাল মিতাই।
সো তো অব ছুটত নহি কোঁহু, লগি লগন বরিয়াঁই॥"

অনুবাদ—আমার ঘরের স্বজনগণ আমার সাধুসংগে বাধা দেন এবং আমায় অশেষ ক্লেশ প্রদান করেন। বাল্যকাল হইতেই মীরা গিরিধর লাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিতালি (প্রীতি) করিয়াছে। আমাদের প্রীতি-সূত্র এমন সুদৃঢ় হইয়াছে যে, উহা আমার পক্ষে এখন ছিন্ন করা অসম্ভব।

সন্ত তুলসীদাস মীরাবঈএর উপরোক্ত পত্রের উত্তরে একটী ভজন লিখিয়া পাঠান। ভজনটী তুলসীদাসের 'বিনয় পত্রিকা'র ১৭৪ সংখ্যক পদ। ভজনটী এই—

"জা কে প্রিয় ন রাম-বৈদেহী।
সো ছাড়িয়ে কোটী বৈরীসম যদ্যপি পরম সনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজ্যো, কান্ত ব্রজবনিতানি, ভয়ে মুদমংগলকারী॥
নাতে নেহ রামকে মনিয়ত, সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লোঁ।
অঞ্জন কহা আঁখি জেহি ফুটে, বহুতক কহৌঁ কহাঁ লোঁ॥
তুলসী সো সব ভাঁতি পরমহিত, পূজ্য প্রাণ তে প্যারো।
জাসোঁ হোয় সনেহ রামপদ, এতো মতো হমারো॥"

অনুবাদ—সীতারাম যাঁহার প্রিয় নয়, তিনি পরম স্নেহপাত্র হইলেও তাঁহাকে শত্রুবৎ ত্যাগ করিবে। সেই জন্যই প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ বন্ধুকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে এবং ব্রজবনিতাগণ স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলকারী হইয়াছিল। একমাত্র রামচন্দ্রের সম্পর্কেই সকল আত্মীয়স্বজন প্রিয়পাত্র হন। যে অঞ্জনে অক্ষি অন্ধ করে, তাহার প্রয়োজন কি? আমার ইঙ্গিত বুঝিয়া লও, অধিক আর কি বলিব। তুলসীদাসের মত এই যে, যিনি রামপদে ভক্তি লাভের সহায়তা করেন তিনিই প্রাণাধিক প্রিয় ও পূজনীয় এবং এই পথে যিনি অন্তরায়স্বরূপ, তিনি বিষবৎ হেয়।

রামায়ণ তুলসীদাসের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রামায়ণ ব্যতীত তাঁহার 'দোঁহাবলী', 'রামআজ্ঞা' 'বিনয় পত্রিকা', 'সতসাই' এবং 'কবিতা-সম্বন্ধাবলী' নামক

আরও পাঁচখানি গ্রন্থ আছে। শ্রীগোপালদাস ভক্ত-কবি তুলসীদাসের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আনন্দকাননে হ্যস্মিন জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা॥"

অনুবাদ—এই আনন্দকাননে তুলসীনামক জঙ্গম তরু (বৃক্ষ) বিরাজিত, এবং রামচন্দ্ররূপ ভ্রমরভূষিত মঞ্জরী তাঁহার কবিতা। গোপালদাসজী তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"জগবারিধি কো পার নাহি, ঐসা আয় ফৈলাব।
তুলসীদাস কৃপা কহি, রচি রামায়ণ নাব॥"

অনুবাদ—বিশ্ববারিধি এত বিস্তৃত যে উহার কোন পার নাই। ভক্ত-কবি তুলসীদাস ভবসাগরপারের জন্য কৃপাপূর্ব্বক রামায়ণরূপ নৌকা সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক সেক্সপিয়র তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন। ভারতের প্রায় সকল প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ আছে। কিন্তু হিন্দী রামায়ণ যেমন জনপ্রিয় এমন বোধ হয় কোন রামায়ণ নহে। সংস্কৃতেও তিনটী রামায়ণ আছে—অধ্যাত্ম-রামায়ণ, বাল্মীকিরামায়ণ এবং যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মরামায়ণ ভালবাসিতেন। বাল্মীকিরামায়ণের স্থান সকলের উপরে নানা দিক দিয়া। বাল্মীকির গ্রন্থকে 'রামায়ণী গঙ্গা' বলা হইয়াছে। এই গঙ্গা 'বাল্মিকীগিরিসম্ভূতা' এবং 'রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা'। তুলসীরামায়ণে এবং বাল্মীকিরামায়ণে প্রথমকাণ্ডে সীতারামের বিবাহ পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। তুলসীরামায়ণে প্রথম কাণ্ডটি সপ্তকাণ্ডের মধ্যে দীর্ঘতম এবং গ্রন্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান। উভয় রামায়ণের সপ্তম কাণ্ডে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বাল্মীকি তাঁহার গ্রন্থে এই কাণ্ডে রামসীতার কথোপকথন, সীতার বনবাস এবং অশ্বমেধযজ্ঞাদি বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তুলসীদাস এই সকল ত্যাগ করিয়া কাক-ভূশুণ্ডীর উপাখ্যান এবং ভগবদ্‌বিশ্বাস-মাহাত্ম্য অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দী রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড অধিক পঠিত। এই কাণ্ডে দশরথের মৃত্যুর এবং তাঁহার বিদায় গ্রহণের নানা বর্ণনা অতীব

মনোরঞ্জক। গ্রাউস্ সাহেব বলেন, "হিন্দী রামায়ণের অনেক অংশ এমন কবিত্বপূর্ণ যে, ঐগুলি সবদেশের মানুষের নিকট মনোরম হইবে। কবিত্ব-শক্তি এবং ধর্মভাব কিরূপে মিলিত হইয়া আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে তুলসী-রামায়ণ তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।"

'বিনয়পত্রিকা' তুলসীদাসজীর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রামায়ণের পরেই ইহা সমাদৃত। ইহা রাজপুতানা ও যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের বহু কলেজে বি-এ পরীক্ষার হিন্দী পাঠ্য গ্রন্থ। 'বিনয় পত্রিকা'তে সন্ত তুলসীদাসের ২৭৯টী সঙ্গীত আছে। সঙ্গীতগুলি ২০।২২টী বিভিন্ন সুরে নিবদ্ধ। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, গণেশ, সূর্য, শিব, গঙ্গা, যমুনা, কাশী, চিত্রকূট প্রভৃতি সম্বন্ধে সঙ্গীতগুলি রচিত। গানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কয়েকটী তুলসী-সঙ্গীত বাংলায় ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সহস্র সহস্র কণ্ঠে এই সঙ্গীতগুলি বহু প্রদেশে ভক্তিভাবে গীত হয়। বিনয় অর্থে বন্দনা বা স্তুতি। সন্ত তুলসীদাস এই সঙ্গীতগুলির দ্বারা উপরোক্ত দেব, দেবী ও দেবস্থানের বন্দনা করিতেছেন। শুধু কেবল 'বিনয় পত্রিকা, রচনা করিলেই তুলসীদাস অমর হইতেন। সঙ্গীতগুলির পদবিন্যাস, ভাব-সম্পদ এবং সুর অতি সুন্দর। প্রথম সঙ্গীতে গণেশ-স্তুতি আছে; ইহার রাগ বিলাবল। গানটী এই—

"গাইয়ে গণপতি জগবংদন। শংকর-সুবণ ভবানীনন্দন ॥
সিদ্ধি-সদন, গজবদন' বিনায়ক। কৃপা-সিন্ধু, সুন্দর সবলায়ক ॥
মোদক-প্রিয়, মুদ-মঙ্গল-দাতা। বিদ্যা-বারিধি, বুদ্ধিবিধাতা ॥
মাংগত তুলসীদাস কর জোরে। বসহিঁ রামসিয়া মানস মোরে ॥"

'বিনয়-পত্রিকা'র ১৫ সংখ্যক সঙ্গীতটী কালী-বিষয়ক। ইহার রাগ রামকলী। গানটী এই—

"জয় জয় জগজননি দেবী, সুর নর-মুনি-অসুর-সেবী।
ভুক্তি-মুক্তি-দায়িনী, ভয়হারিণী কালিকা।
মংগল-মুদ-সিদ্ধি-সদনি, পর্ব-শর্ব-রীশ-বদনি।
তাপ-তিমির-তরুণ-তরণি কিরণ-মালিকা ॥

যম-চর্ম-কর কৃপাণ, শূল শেল ধনুষবাণ।
ধরনি, দলনি দানব-দল, রণ-করালিকা॥
পূতনা-পিশাচ প্রেত ডাকনি-সাকিনি সমেত।
ভূতগ্রহ বেতাল খগ মৃগালি-জালিকা॥
জয় মহেশ-ভা'মিনি, অনেক রূপ-নামিনি।
সমস্ত-লোক-স্বামিনী, হিমশৈল-বালিকা॥
রঘুপতি-পদ পরম প্রেম, তুলসী চাহে অচল নেম।
দেহ হ্বায় প্রসন্ন, পাহি প্রণত-পালিকা॥"

সন্ত তুলসীদাসের গঙ্গাস্তুতিটী অতি চমৎকার। ইহার রাগও রামকলী। সঙ্গীতটী এই—

"জয় জয় ভগীরথ-নন্দিনি, মুনিচয় চকোর-বন্দিনি।
নর-নাগ-বিবুধ-বন্দিনি, জয়-জহ্নু-বালিকা॥
বিষ্ণুপদ-সরোজ জাসি, ঈশ-শীস-পর বিভাসি।
ত্রিপথগাসি, পুণ্যরাশি, পাপ-ছালিকা॥
বিমল বিপুল বহসি বারি, শীতল-ত্রয়তাপহারী।
ভঁবরবর, বিহংগতর, তরঙ্গ-মালিকা॥
পুরজন-পূজোপহার, শোভিত শশি ধবলধার।
ভংজন ভবভার, ভক্তি-কল্পফলিকা॥
নিজতটবাসী বিহংগ, জল-থল-চর-পশু-পতংগ।
কীটজটিল তাপস, সব সরিস পালিকা॥
তুলসী তব তীরতীর, সুমিরত রঘুবংশবীর।
বিচরত মতি দেহি, মোহ-মহিস-কালিকা॥"

সন্ত তুলসীদাসের 'দোঁহাবলী' আর একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। উহা ভক্ত-সমাজে বিশেষ সমাদৃত। দোঁহাবলী'তে ৫৭৩টী দোঁহা আছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তুলসী-দোঁহা আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শোনা যায়। ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, নামমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় দোঁহাবলীতে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তুলসীদাস শ্রীরামসীতার পরমভক্ত ছিলেন। চিত্রকূটে অবস্থান কালে এবং অন্যান্য অনেক

স্থানে তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। দোঁহাবলীর প্রথম দোঁহাটী এই—

"রাম বামদিশি জানকী লখন দাহিনিওর।
ধ্যান সকল কল্যাণময় সুরতরু তুলসী তোর।"

অনুবাদ—তুলসী! রাম, রামের বামদিকে জানকী (সীতা) এবং দক্ষিণে লক্ষণ—এই ধ্যান সকলকল্যাণদায়ক এবং সকল মঙ্গলের সুরতরু (কল্পবৃক্ষ)। কিন্তু তুলসীদাস সকল দেবদেবীকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন—ইহা তাঁহার 'বিনয়পত্রিকা' হইতে জানা যায়। 'বিনয় পত্রিকা'তে তিনি বহু দেবদেবীর বন্দনা দ্বারা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। দোঁহাবলীতেও শিবাদি দেবতার দোঁহা আছে। তুলসী শ্রীভগবানের রামরূপ ইষ্টরূপে ধ্যানপূজা করিলেও তিনি ঈশ্বরের সগুণ নিগুণ উভয়রূপই মানিতেন। তাঁহার রামায়ণের একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"জে ব্রহ্ম অজ অদ্বৈত অনুভবগম্য মনপর ধ্যাবহি।
তে কহঁহি জানহি নাথ, হম্ তব সগুণ যশনিত গাবহি॥

অনুবাদ—হে নাথ, যাঁহারা তোমার অজ অদ্বৈত নিগুর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান ও অনুভব করেন, তাঁহারাই সে সম্বন্ধে জানেন ও বলিতে পারেন। আমি তোমার সগুণ সাকার রামরূপের মাহাত্ম্য নিত্য গান করিব। দোঁহাবলীতে একস্থানে তুলসীদাস সগুণ মহিমা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"গ্যান কহৈ অজ্ঞান বিনু, তম বিনু কহৈ প্রকাশ।
নিরগুণ কহৈ জো সগুণ বিনু, সো গুরু তুলসীদাস॥
অংক অগুণ আখর সগুণ সমুঝিয উভয় প্রকার।
খোয়ে রাখে আপু ভল তুলসী চারু বিচার॥"

অনুবাদ—অজ্ঞান বর্ণন না করিয়া যিনি জ্ঞান ব্যাখ্যা করেন, অন্ধকার বর্ণন না করিয়া যিনি আলোক ব্যাখ্যা করেন, যিনি সগুণ ঈশ্বর না বলিয়া নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলেন তিনি আমার গুরু। অর্থাৎ এইরূপ বর্ণনা করা ঠিক নহে; উহাতে শ্রোতার সত্য ধারণা হওয়া কঠিন। নিগুর্ণ ব্রহ্ম ১, ২, ৩ ইত্যাদি অংকের মত বোধগম্য

করা কঠিন এবং সগুণ ঈশ্বর অ, আ, প্রভৃতি অক্ষরের মত সহজে বুদ্ধিগত হয়। যাহাতে যাহার মন লাগে তাহাই তাহার ধ্যান করা উচিত।

সন্ত তুলসীদাস নাম-মাহাত্ম্য অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মন যখন নির্গুণ ধ্যানে অক্ষম এবং সগুণ চিন্তায় প্রাণহীন তখন নাম জপ করা দরকার। ভগবানের নাম করিতে করিতে চিত্তের ময়লা ধুইয়া যাইবে, হৃদয় শুদ্ধ হইবে এবং মনে ভক্তির উদয় হইবে। তিনি বলেন—

"পয অহার ফল খাই জপু রাম নাম ষটমাস।
সকল সুমঙ্গল সিদ্ধি সব করতল তুলসীদাস।।"

অনুবাদ—দুধ ও ফল খাইয়া যদি ছয় মাস রাম নাম কর, হে তুলসী, সকল সুমঙ্গল ও সকল সিদ্ধি তোমার করতলগত হইবে। তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, 'ইসমে ন হরি মিলে ত জামিন তুলসীদাসে'। অর্থাৎ ইহাতে যদি হরি না মিলে ত তুলসীদাস জামিন (সাক্ষী)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, এই কলিযুগে তিন দিন ভগবানের জন্য যে কাঁদিবে, সে তাঁহার দর্শন পাইবেই। সন্ত তুলসীদাসের কয়েকটী দোহা সানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইগুলিতে তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তির গভীরতা এবং অসাধারণ কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"দুঃখমে সব কোই সুমিরণ করে, সুখমে করে ন কোই।
জো জন সুখ মে সুমিরণ করে, দুঃখ কাহেকো হোই।।"

অনুবাদ—দুঃখের সময় সকলেই ঈশ্বরের স্মরণ করে। কিন্তু হায়। সুখের সময় কেহ করে না। যে সুখের সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করে তাহার দুঃখ কেন হইবে?

"হরি মায়াকৃত দোষ গুণ বিনু হরি ভজন ন যাই।
ভজিয় রাম সকল কাম তজি, অস বিচারি মনমাহি।।"

অনুবাদ—মানবের দোষসমূহ হরির মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের এই সকল দোষ একমাত্র হরিভজন দ্বারাই কাটিয়া যায়, অন্য উপায়ে দূর হয় না। এই বিষয়টী আমাদের বিচার করিয়া ভালরূপে বোঝা দরকার। ইহা যখন সত্য তখন সব কাজ ছাড়িয়া ঈশ্বরের চিন্তা সকাল সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে করা উচিত।

"তুলসী অসময়কে সখা ধৈরজ, ধর্ম, বিবেক।
সাহিত্য, সাহস, সত্যব্রত, রামভরোসা এক।।"

অনুবাদ—হে তুলসী, দুঃসময় (বিপদ) মানবজীবনে আসেই আসে। এমন মানুষ নাই, যাহার জীবনে বিপদ আসে নাই। সাধারণতঃ মানুষ বিপদের সময় মানুষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু বিপদের শ্রেষ্ঠ মিত্র মানুষ নহে। ধৈর্য্য, ধর্মসাধন, ধর্মাধর্মবিবেক (ভালমন্দ বিচার), ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে নির্ভরতাই বিপদের সহায়। ঈশ্বরকে ভুলিয়া মানুষের উপর নির্ভর করিলে বিপদ যায় না। যখনই মানুষ জগৎ হইতে মুখ ফিরাইয়া ঈশ্বরের দিকে তাকায় এবং তাঁহার শরণাগত হয় তখন বিপদান্ধকার কাটিয়া সুসময়ের অরুণালোক দৃষ্ট হয়।

চোদ্দ

জ্ঞানেশ্বর

গীতার উপর যত ভাষ্যটীকাদি রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সংস্কৃতে। একমাত্র মারাঠী নামক ভারতীয় ভাষায় গীতার উপর দুইটী টীকা আছে—একটী জ্ঞানেশ্বরের, অপরটী বালগঙ্গাধর তিলকের। মারাঠী ব্যতীত অন্য কোন ভাষাতেই গীতার টীকা নাই। মারাঠী ভাষা সমধিক সমৃদ্ধ। এই ভাষা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। মহারাষ্ট্রে অনেক সাধু সন্তের আবির্ভাব হইয়াছে। তিলকের 'গীতারহস্য' একটী মৌলিক রচনা এবং আধুনিক গীতাভাষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা স্বর্গগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকাও বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকায় উক্ত অনুবাদের সমালোচনা পড়িয়াছিলাম। জ্ঞানেশ্বরী টীকা হিন্দী, ইংরাজী, গুজরাতী ও সংস্কৃতাদিতে ভাষান্তরিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রে ভ্রমণ কালে দেখিয়াছি, জ্ঞানেশ্বরী টীকার এই দেশে কী প্রভাব! বাংলায় 'চণ্ডীর' যেমন অখণ্ড পাঠ

নানা মন্দিরে ও গৃহে হইয়া থাকে মহারাষ্ট্রে তেমনি জ্ঞানেশ্বরীর অখণ্ড পাঠ ও ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে হয়। জ্ঞানেশ্বরী গীতাই মহারাষ্ট্রে সর্বজনপ্রিয় ধর্মপুস্তক। সন্ত জ্ঞানেশ্বর মাত্র একুশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং তৎপূর্বেই তাঁহার গীতা-ভাষ্যরচনা সমাপ্ত হয়। জ্ঞানেশ্বরের মত স্বল্পায়ু সন্ত জগতে বোধ হয় আর হয় নাই।

মহারাষ্ট্রে আলন্দী নামক গ্রামে ছয় শত বৎসর পূর্বে বিঠ্ঠলপন্থ নামে এক যুবক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিবাহ করিবার পরে তিনি কাশী গমনপূর্বক কোন গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভ্রমণোদ্দেশ্যে শিষ্যগৃহে আগমন করিলে বিঠ্ঠলপন্থের যুবতী স্ত্রী রুক্মিণী গুরুর চরণপ্রান্তে পড়িয়া স্বীয় দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিলে গুরু শিষ্যকে সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ করিয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন। শিষ্য গুরুর আজ্ঞা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিরোধার্য করিলেন। বিঠ্ঠল পন্থ আবার সংসারী হইলেন। তাঁহার মুক্তা নামে একটী কন্যা এবং নিবৃত্তি, জ্ঞানেশ্বর এবং সোপান নামে তিনটী পুত্র লাভ হইল। আলন্দী গ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ বিঠ্ঠল ও রুক্মিণীকে ভীষণ অত্যাচার ও অবমাননা করিতে লাগিল। তাহারা বিঠ্ঠলকে জাতিচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইল না, তাঁহাকে গ্রাম হইতে নির্বাসিত করিল। বিঠ্ঠল দরিদ্র ছিলেন। ভিক্ষায় তাঁহাদের জীবিকানির্বাহ হইত। গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে ভিক্ষাদানও বন্ধ করিল। গোঁড়ামী এই ভাবেই হিন্দু সমাজের সর্বনাশ করিয়াছে মধ্যযুগে। বিসোবা নামক ব্রাহ্মণ ছিল বিঠ্ঠলের প্রধান বিরোধী। বিসোবার কন্যা গঙ্গা জ্ঞানেশ্বরকে শ্রদ্ধা করিত। একদিন বিঠ্ঠল রোগে শয্যাশায়ী হওয়ায় জ্ঞানেশ্বর ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন। পথে জ্ঞানেশ্বর এই গানটী গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন :—

সব হ্যায় সমান, সব মেঁ এক প্রাণ।
ত্যজকে অভিমান হরি গুন গাও ॥১
হরি নাম গাও, দয়া অপনাও।
অপনে হৃদয় মেঁ হরি কো বসাও ॥২
হরি নাম প্যারা, সব কা সহারা।
হরি নাম জপকে সুখ শান্তি পাও ॥৩

গঙ্গা জ্ঞানেশ্বরের মধুর সঙ্গীত শুনিয়া বাহিরে আসিল। সে জ্ঞানেশ্বরকে ভিক্ষা দিতে যাইতে ছিল এমন সময় উহা দেখিয়া বিসোবা তাহাকে ভর্ৎসনাপূর্বক নিষেধ করিল এবং জ্ঞানেশ্বরকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিল। জ্ঞানেশ্বর অন্য বাড়াতে যাইয়া ভিক্ষা চাহিল। গৃহিণী আসিয়া তাহাকে ভিক্ষা দিলে পর শ্বাশুড়ীর আদেশে সে স্নান করিয়া আসিল। ব্রতভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর পুত্রকে ভিক্ষাপ্রদান করিলে মানুষ অশুদ্ধ হয়। তাহাকে যে স্পর্শ করিবে সে পতিত হইবে। হিন্দু সমাজ তখন এত অধঃপতিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছিলেন যে, বর্তমান যুগে আমাদের হিন্দুধর্ম অস্পৃশ্যতায় পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বরের ভিক্ষার ঝুলি আংশিক পূর্ণও হইল না। তিনি বিষন্ন মনে ও শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিতেছেন এমন সময় ইন্দ্রাণী নদীর ঘাটে মাতা রুক্মিণী ও ভগ্নী মুক্তাকে কলসী হাতে তথায় দেখিলেন। গৃহে এক বিন্দুও পাণি নাই, বিঠ্ঠল পন্থ রুগ্ন শয্যাশায়ী ও পিপাসার্ত। রুক্মিণী জল আনিবার জন্য ঘাটের সিড়িতে নাবিতেছে। কিন্তু তাহাকে জলে নামিতে কেহই রাস্তা দিতেছে না। সকলে তাকে রূঢ়স্বরে বলিতেছে, 'আমাকে ছুঁইও না।' গোড়ামীর প্রতিমূর্তি বিসোবাও তখন স্নানার্থে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রুক্মিণীর কলসীকে ছিদ্র করিয়া রুক্মিণীকে ক্ষুব্ধ করিলেন। জননী পুত্রকন্যা সহিত রিক্তহস্তে ক্ষুন্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিঠ্ঠলপন্থ মুক্তার মুখে সকল সংবাদ অবগত হইয়া অস্থির হইলেন। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অপমানের যন্ত্রণায় তাহার ব্যাধিগ্রস্ত শরীরও আর শয্যায় থাকিতে পারিল না। গ্রামের ব্রাহ্মণগণের নিকট যাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে এবং স্বীয় সন্তানগণকে উপবীত দিবার অনুমতি চাহিতে তিনি চলিলেন। স্ত্রী পুত্র-কন্যাদির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রাহ্মণ শিরোমণি গঙ্গাধর শাস্ত্রীর নিকট শুদ্ধির পরামর্শ চাহিলেন। শাস্ত্রীজি নানা শাস্ত্র উল্টাইয়া দেখিলেন। শেষে বলিলেন, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আত্মহত্যা! এই পতিতাধমের শুদ্ধি কোন শাস্ত্রমতে হইতে পারে না। যে ধর্মে মানবাত্মাকে নিত্যশুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ বলিয়াছেন সেই ধর্মের শাস্ত্রে নাকি ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর শুদ্ধির বিধান নাই! সত্যই বিবেকানন্দ স্বামিজী বলেছেন, 'হিন্দুর ধর্ম ভাতের হাঁড়িতে ঢুকেছে।'

বিঠ্‌ঠল নিরাশ হৃদয়ে কুটীরে ফিরিলেন। তিনি বুঝিলেন, নিষ্ঠুর হিন্দু সমাজে তাঁহার স্থান নাই, এই বিশাল জগতে সে আর থাকিতে পারিবে না। পুত্রকন্যার কল্যাণ চিন্তা করিয়া বিঠ্‌ঠল আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পত্নীর নিকট তিনি স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পত্নীও পতির অনুগমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। গভীর রাত্রিতে যখন জগৎ নিস্তব্ধ এবং সন্তানচতুষ্টয় গভীর নিদ্রামগ্ন তখন পিতামাতা অশেষ স্নেহভরে সন্তানগণকে শেষ দর্শন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং নদীর তীরে আসিয়া অগাধ সলিলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিলেন। সমাজ এইরূপে হৃদয়হীন হইয়া মানবকে শাস্তি দান করে। সত্যই কবি বলেছেন—'মানুষ মানুষের প্রতি কি দুর্ব্যবহারই না করে?"

প্রাতে জ্ঞানেশ্বরপ্রমুখ চারিজন শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন—মাতাপিতা গৃহে নাই। পিতামাতাশূন্য গৃহ ত অরণ্য! সমগ্র গ্রাম খুঁজিয়া যখন তাহাদের কোন সন্ধান মিলিল না তখন 'কী ঘটিয়াছে' তাঁহাদের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। দুঃখাভিভূত জ্ঞানেশ্বর দুঃখহারী হরির স্মরণ করিতে করিতে গান ধরিলেন—

মাতা পিতা বন্ধু, তুমহী হো হামারে।
জীবন সহারে, কৃষ্ণ প্যারে ॥১
সুখ দুঃখ দোনো হী, হমেঁ দেনে আয়।
চরণোঁ আয়ে, ভক্ত তুমহারে ॥২
কৃষ্ণ নাম মন্ত্র, মোহ মায়া হারী।
শান্তি সুখকারী দুঃখ নিবারী ॥৩
মন মে আয় কৃষ্ণ, তন মে আয় কৃষ্ণ।
কন কন মে আয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥৪
নির্বুদ্ধিকে মনকে খুলে আয় কিবারে।
তুম মেঁ বসে আয় নন্দদুলারে ॥৫

গান গাহিতে গাহিতে জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞানচক্ষু খুলিল। মৃত্যুর পূর্বে বিঠ্‌ঠলপন্থ জ্ঞানেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, "গীতোক্ত ধর্ম প্রকৃত সনাতন ধর্ম। এই ধর্ম আজ ব্রাহ্মণগণের হস্তে কলঙ্কিত ও কলুষিত। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বিলুপ্ত। ধর্ম যখন আদর্শচ্যুত হইয়া পতিত হয় তখনই সামাজিক আচারের অক্টোপাশে

(Octopus) বিজড়িত ও প্রাণহীন হয়। গীতোক্ত উদার ধর্ম প্রচার করিয়া হিন্দু সমাজের উদ্ধার কর।" পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জ্ঞানেশ্বর শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণপুত্রের ন্যায় উপবীত গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু আলন্দী গ্রামের কোন ব্রাহ্মণই উহা অনুমোদন করিলেন না। জনৈক ব্রাহ্মণের পরামর্শে জ্ঞানেশ্বর পঠন গ্রামে বিদ্যাধর শাস্ত্রীর নিকট যাইলেন। বিদ্যাধর বলিলেন "পতিত সন্ন্যাসীর পুত্রের শুদ্ধি অসম্ভব। তোমাকে ব্রাহ্মণ সমাজে লওয়া যাইতে পারে না।" জ্ঞানেশ্বর—"আপনি সমাজের ধর্মগুরু। ধর্মশাস্ত্র আপনার ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ নরম করিয়া আমাকে সমাজে কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে মানবধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন তদনুযায়ী আপনি আমাকে শুদ্ধ করিয়া আপনার মহিমা বৃদ্ধি করুন। এই বিশ্ব পরমাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ। সর্ব জীবে তিনি পূর্ণভাবে বিরাজিত।" বিদ্যাধর শাস্ত্রী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তুই আমাকে বেদান্ত শিখাতে এসেছিস্! সকলের মধ্যে একই পরমাত্মা আছে কে এই যে মহিষটা রাস্তায় যাইতেছে তুই আর এইটা এক।' জ্ঞানেশ্বর— "সত্যই দেখিতেছি, আমার ও উহার ভিতর একই আত্মা অবস্থিত।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাধর বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে তুই যা বলিস্ ওকেও তাই বলাও। জ্ঞানেশ্বর তখন হাত জোড় করিয়া ভগবানকে প্রার্থনা করিতে করিতে বেদমন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ ইত্যাদি।' শাস্ত্রীজী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন—"মুখ বন্ধ কর। বেদপাঠে তোর অধিকার নাই।" জ্ঞানেশ্বর কহিলেন যে, পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিবার সকলের অধিকার আছে। জ্ঞানেশ্বর পুনরায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলে একজন হাত দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল। তখন মহিষ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শাস্ত্রীর সভামণ্ডপ নরনারীতে ভরিয়া গেল। বয়োবৃদ্ধ বিদ্যাধর জ্ঞানবৃদ্ধ জ্ঞানেশ্বরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং জ্ঞানেশ্বরকে কোলে উঠাইয়া স্বীয় আসনে বসাইয়া মালাচন্দন পরাইয়া সৎকার পূর্বক বলিলেন—"তোমার ভিতর পরমাত্মা অবতীর্ণ হইয়াছেন আমাদের

কল্যাণের জন্য। আমি তোমাকে শুদ্ধ করিবার কে? তুমি ত চিরশুদ্ধ।” এই বলিয়া তাঁহাকে শুদ্ধিপত্র দিলেন।

শুদ্ধিপত্র লইয়া জ্ঞানেশ্বর স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু গঙ্গা (বিসোবার কন্যা) এই সংবাদ শ্রবণে পরমানন্দিতা। কিন্তু গঙ্গাধর ও বিসোবাপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের মন ভিজিল না। তাহারা জ্ঞানেশ্বরাদিকে সমাজে স্থান দিলেন না। সকলে মনের দুঃখে বনের দিকে যাইতেছেন। এমন সময় একটী ধর্মপ্রাণ কৃষক তাহাদের দেখিয়া দয়ার্দ্র হইল এবং তাহাদিগকে স্বীয় গরুর গাড়ীতে চড়াইয়া নিজ গৃহে লইয়া গেল। জঙ্গলের মধ্যে এক গ্রামে তাহার পর্ণকুটীর। গ্রামে একটী জলকুণ্ড ছিল। কিন্তু ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসের অধিকারে উহা আছে এবং উহার জল পান করিলে লোকে মরিবে—এই ভয়ে কুণ্ড হইতে কেহ জল আনিত না। এক ক্রোশ দূরস্থিত নদী হইতে লোকে জল আনিত এবং তথায় স্নান করিতে যাইত। জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি সকলে এই কুণ্ডের জলপান করিয়া দেখিলেন যে, উহা স্বচ্ছ, নির্মল ও সুস্বাদু। তখন গ্রামের সকলে নির্ভয় হইয়া উক্ত কুণ্ড হইতে জল লইতে এবং স্নান করিতে লাগিল। জ্ঞানেশ্বর এইরূপে গ্রামের জলকষ্ট দূর করায় সকলে তাঁহাকে দেবতুল্য ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল।

জনৈক গ্রামবাসী জ্ঞানেশ্বরকে করজোড় করিয়া ভক্তিভরে বলিলেন, “আপনি আমাদের জীবনদান করিলেন। আপনি দেবতা।” জ্ঞানেশ্বর—“তুমিও দেবতা। কৃষ্ণ পরমাত্মা সকল মানুষের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত। ইহা বিশ্বাস কর, ইহা ধ্যান কর, ইহা অনুভব কর। ইহাই ধর্মের সারতত্ত্ব। ধর্মকে সামাজিক আচাররূপ জগদ্দল পাথরে শিকল দিয়া বাঁধিয়া মারিও না। আগে ছিল সমাজের শীর্ষে ধর্ম, আর এখন ধর্মের স্কন্ধে সমাজ আরূঢ়। ঘটে ঘটে যে যে পরমাত্মা অবস্থিত তাঁহার চিন্তা করিলে সকল সঙ্কট দূর হয়।” এই বলিয়া জ্ঞানেশ্বর গান ধরিলেন—

“এক সার নাম হরি ভজ হরি।
হৃদে হরি তেরী চিন্তা সারী॥১

যে নাম সীখেনে রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ।
জগকে আনন্দ পায় মনা ॥২
পড় ভোর সারে ছোড় দুসরে বে ।
কৃষ্ণ নাম গারে প্যারে প্যারে ॥৩
কহে জ্ঞানদেব হরি নাম মালা ।
হৃদয় নিরালা পাযা পাযা ॥৪

সমবেত সকলে 'রামকৃষ্ণ গোবিন্দ' ধ্বনি করিয়া এবং ভজনে মগ্ন হইল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞানেশ্বরের নিকট লোকসমাগম বাড়িল। তিনি সকলকে গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। মন্দিরে মন্দিরে জ্ঞানেশ্বরের প্রবচন হইতে লাগিল। শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা জ্ঞানেশ্বরের গীতা ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। একদিন কোন মন্দিরে সমবেত জনরাশিকে জ্ঞানেশ্বর উপদেশ দিতেছেন—"গীতোক্ত ধর্মই প্রকৃত ভাগবত ধর্ম, আসল সনাতন ধর্ম। স্ত্রী, পুরুষ, শুদ্র ব্রাহ্মণ সকলেরই পরমাত্মার চিন্তা করিবার অধিকার আছে। সামাজিক বৈষম্য দ্বারা ধর্মের সত্যস্বরূপ ঢাকিয়া রাখিও না, তোমার হৃদয়ে এবং অন্য সকলের হৃদয়ে যে পরমাত্মা আছেন তাঁহাকে ভক্তি কর। ভক্তি দ্বারা হৃদয়ের মোহ, লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি অধর্ম দূর হয়—হৃদয় পবিত্র হয়। ভক্তিলাভ হইলে নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়।" জ্ঞানেশ্বর স্বীয় মাতৃভাষা মারাঠীতে পদ্য রচনা করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। মারাঠীতে রচিত জ্ঞানেশ্বরী গীতা সমগ্র মহারাষ্ট্রে বেদের স্থান অধিকার করিয়াছে। উক্ত গীতার কয়েকটী পদ্য নমুনাস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

প্রথম অধ্যায়

যে মারাঠী বাণী কী নগরী, ব্রহ্মবিদ্যা কো প্রকটকরী ।
হোবে হে দেব, সুখভরী, কীজে অ্যাসা দয়া ॥
কীজে দেব দয়া পসারী, কীজে পূরণ আস হামারী ।
মরাঠীমেঁ করু সুখারী, অনুবাদ গীতা কা ॥

ওঁ নমো আদিদেব, নমো নমো বেদ গেয় ।
জয় জয় সৌখ্য দেব, আত্মরূপ ॥
বিঘ্নহারী গণেশ, সকলার্থ মতি প্রকাশ ।
কহে নিবৃত্তি দাস্, বুদ্ধি দীজিয়ে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগমে জীবন মরণ হ্যায় মাযা কে কারণ ।
মরে ন জোয়ে পাবন অবিনাশী আত্মা ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ভক্তোঁ কী রক্ষা করনে, ধর্ম কর্ম কো রখনে ।
অধম নষ্ট করনে অবতার মেরা ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

মেরে মারাঠী কে বোল রসভরে ।
অমৃত কো ভী পরাজিত করে ।
আসী রসিক রচনা করে নিবৃত্তি দাস্ ॥

সপ্তম অধ্যায়

জৈসে সুত মেঁ সোণেকে, পিরে হোতে বীজ সোনেকে ।
আসে ভীতর বাহর জগকে বাস মেরা ॥

নবম অধ্যায়

মেরী ভক্তি কে বীন, পার্থ যে নর জীবন ।
জগমে পথর কে সমান, ব্যর্থ জানো ॥

দশম অধ্যায়

জো জো মিলে প্রাণী, মিলনা ভগবান মানী ।
যে ভক্তি যোগ বরবাণী, পার্থ মৈঁনে ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

জীব পরমাত্মা হে অর্জুন, বৈঠ দোনোঁ এক আসন।
ভক্তকে হৃদয়-ভুবন বিরাজতে ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ইস্‌লিয়ে মায় পিতা, মহদবৃক্ষ হায় মাতা।
হম দোনো সেঁ জন্ম লেতা, জগকা আডম্বর ॥

ষোড়শ অধ্যায়

জিস্ সে চিত কো জগত কা, ইস চেত তন মন বচন কা।
অর্পণ কর না, অহিংসা কা রূপ জানো ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শাস্ত্রো কা কর মথন, নিকলা শ্রীগীতা ধন।
জিস্‌মেঁ সে আত্মরত্ন হাথ আয়ে ॥
হায় প্রার্থনা ভগবান সে, ইস বাণীরূপ যজ্ঞ সে।
হো তুষ্ট অরু মুঝ দাস সে বরদান দোয়ে ॥
খোটে কর্ম সব বিসেঁার, সদা সৎকর্ম ধর্ম ধাবেঁ।
জাগে জগত মে সারে, ভাব মিত্রতা কে ॥

নিবাস গ্রামে জ্ঞানেশ্বরের গীতাব্যাখ্যা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল যে, আলন্দী গ্রাম হইতেও অসংখ্য নরনারী নিবাসে আগমন করিল। আলন্দীর ব্রাহ্মণ-চূড়ামণি নিবাসে জ্ঞানেশ্বরের প্রবচন শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি জ্ঞানেশ্বরের পায় ধরিয়া বলিলেন, "তুমি সামান্য বালক নহ। তুমি জ্ঞানের দেবতা। তাই তোমার অমৃত বাণী শ্রবণে তাপিত প্রাণ জুড়ায়। তুমি আলন্দীবাসিদের ক্ষমা কর এবং আলন্দী চলো"। জ্ঞানেশ্বর ভ্রাতাভগ্নীগণ সহ আলন্দী আসিলে সকলে তাঁহাকে লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিল। যিনি কয়েক দিন পূর্বে গ্রাম

হইতে জাতিচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়াছিলেন তাঁহাকেই সকলে দেবতাবৎ পূজা করিল। শোভাযাত্রার নরনারীগণ গান ধরিল—

হরি আয়া রে, হরি আয়া রে।
আজ হাম নে জীবন কা সুখ পায়া রে॥
হরি যহা হাসেঁ, হরি বহা হসে।
হম জায়ে যহা, হরি উহা বসে॥
হরি নাচে রে, হরি গায় রে।
হরি শান্তি সুধা বরষায়ে রে॥
হরি মেরা রে, হরি তেরা রে।
হরি সব্‌কা সরস সবেরা রে॥
হরি কায়া রে, হরি ছায়া রে।
হরি জনম মরণ কী মায়া রে॥

জ্ঞানেশ্বরের গীতাব্যাখ্যায় আলন্দীতে ধর্মের মহাজাগরণ আসিল। সেই জাগরণের স্রোত সমগ্র মহারাষ্ট্রকে প্লাবিত করিল। সেই জাগরণের জের আজও মহারাষ্ট্রে দৃষ্ট হয়। একদিন গীতার প্রবচনপ্রসঙ্গে সন্ত জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায় আদর্শ সন্তের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভেদ ভাব কী করে ন চর্চা, মানে নহীঁ কিসী কো উর্চা।
সমঝেঁ নহীঁ কিসী কো নীচা, সন্ত চৈতন্য সমান॥
হম্‌কো সব্‌কো ধরতী ধরতী, উচঁ নীচ কা ভেদ ন করতী।
সব পর ভাব একহী রখতী, সন্ত ধরতী সমান॥
দেখো জলকে এক ভাবকো, জ্যাদা মীঠা নহীঁ গায় কো।
কড়বা বনতা নহিঁ সের কো, সন্ত জলকে সমান॥

পাথর দ্রবীভূত হইল; কিন্তু বিসোবাপ্রমুখ পাষণ্ডের হৃদয় গলিল না। তাহারা যোগীরাজ চাঙ্গদেবকে সংবাদ দিলেন এবং আলন্দীতে আসিয়া জ্ঞানেশ্বরকে পরাস্ত

করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। এদিকে আলন্দী গ্রামে মহামারী উপস্থিত। বিসোবাপ্রমুখ ব্যক্তিব প্রচাব করিল যে, জ্ঞানেশ্বরের পাপে গ্রামের এই দুর্দশা! চাঙ্গদেবেব এক শিষ্য আসিয়া জ্ঞানেশ্বরকে সাবধান করিল এবং চাঙ্গদেবের আগমন সংবাদ জানাইয়া বলিল যে, তোমাকে যোগাগ্নিতে জ্বালাইয়া মারিবার জন্য চাঙ্গদেব আসিতেছেন। জ্ঞানেশ্বব তৎশ্রবণে স্বীয় ঝোপড়ীতে আগুণ দিলেন। জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে বসিয়া জ্ঞানেশ্বব গান গাহিতেছেন। তাঁহাকে অগ্নি স্পর্শ কবিল না। গ্রামের নবনাবী তথায় সমবেত। ঝোপড়ী পোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের মহামাবী দূব হইল, সকলে আরোগ্য লাভ করিল। এই সংবাদ চাঙ্গদেবের নিকট পৌছিলে তিনি জ্ঞানেশ্বরকে স্বীয় যৌগিক শক্তি দ্বারা পরাস্ত কবিতে দৃঢ় সংকল্প কবিলেন। একদিন প্রাতে কয়েকজন শিষ্য সহ একটি বৃহৎ ব্যাঘ্রের উপর চড়িয়া চাঙ্গদেব আলন্দী গ্রামে আসিলেন। জ্ঞানেশ্বরের নিকট এই সংবাদ আসিতে দেবী হইল না। তিনি তখন স্বীয় কুটীরের ভগ্ন বারান্দায় ভাইভগ্নীসহ উপবিষ্ট ছিলেন। সংবাদ শ্রবণে তিনি জড় মৃত্তিকাময় বাবান্দাকে বলিলেন, 'চল্‌রে, আমাকে নিয়ে চল'। বারান্দা জানোয়ারের মত চলিতে লাগিল এবং চাঙ্গদেবের নিকট উপস্থিত হইল! চাঙ্গদেবের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি না হয় একটা জানোয়ারকে বশীভূত করিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানেশ্বব যে জড়কে বশীভূত করিয়াছেন! ইহাতে আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি জ্ঞানেশ্বরের পায় পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। জ্ঞানেশ্বরের জয় হইল। তাঁহার পিতামাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ধর্মের জয় নিশ্চিত। আলন্দীতে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। জ্ঞানেশ্বর স্বেচ্ছায় সমাধি লইলেন। তখন তাঁহাব বয়স মাত্র একুশ বৎসর। সমাধিতে বসিয়া জ্ঞানেশ্বর গান ধরিলেন—

আজ কা সুন হরা দিন হ্যায অমৃত সে নৃহায়া।
নাম কে লিয়ে সে তূনে প্রভো! হ্যায় দিখায়া॥
গোপাল যে তেরো ধ্যান, ধ্যান মন মায়া।
তন, মন, ধন সব হ্যায় তুম্হী মে লগায়া॥

শুনো! শুনো! বিঠঠল বিনতী বার বার মেরী।
মন মোবে মঙ্গল মূরত বসে সদা তেরী॥

জ্ঞানেশ্বরের আত্মা ব্রহ্মলীন হইল। জ্যোতি জ্যোতিতে মিলাইল। বৈদিক ঋষি সত্যই বলেছেন। যথা—শুদ্ধে শুদ্ধং আসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।

এবং মুর্নেবিজানতঃ আত্মা ভবতি গৌতম॥

পনের
মনিয়ার উইলিয়ামস্ *

পাশ্চাত্যে যাঁহারা অসাধারণ সংস্কৃতবিৎ হইয়াছেন স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। যাঁহারা তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধান পাঠ করেন, তাঁহারাই জানেন মনিয়ার উইলিয়ামসের সংস্কৃত-জ্ঞান কী বিশাল! ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি আরও যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন সেইগুলিও তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন।

মনিয়ার উইলিয়ামস্ জাতিতে ইংরাজ হইলেও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই বৎসরই এইচ. এইচ. উইলিসনের প্রথম সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধান প্রকাশিত হয়। স্যার মনিয়ার ইংলণ্ডে শিক্ষালাভপূর্বক ১৮৩৯ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে কেরানিপদে নিযুক্ত হন। তিনি হেইলেবেরিস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ভারতে যাইয়া চাকুরী গ্রহণের ইচ্ছা না থাকায় অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ করেন। 'পুরাতন হেইলেবেরি কলেজের স্মৃতিকথা' শীর্ষক তিনি যে

---

* দেশ, ১৪ বৈশাখ, ১৩৬৩

ইংরাজি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টে উপরোক্ত অধ্যাপক উইলসনের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। ১৮৪৪—১৮৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি হেইলেবেরি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজে সংস্কৃত, ফার্সী ও হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হেইলেবেরী কলেজ উঠিয়া যায়। ১৮৪৩ খ্রীঃ সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে তিনি বোডেন বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৬০ খ্রীঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার বোডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মনিয়ার ছিলেন দ্বিতীয় বোডেন অধ্যাপক এবং তাহার গুরু উইলসন বোডেন অধ্যাপক পদে প্রথম সংবৃত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যাপক উইলসনের নিকট মনিয়ার সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন অধ্যাপক-পদ বিশেষ সম্মানীয় ও উচ্চ। লেপ্টেনান্ট কর্ণেল বোডেন কর্তৃক এই পদ স্থাপিত হয়। বোডেন বোম্বাইতে মিলিটারী অফিসার ছিলেন। তিনি ১৮০৭ খৃঃ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৮১১ খ্রীঃ ২১শে নভেম্বর লিসবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যারও মৃত্যু হয় ১৮২৭ খ্রীঃ ২৪শে আগষ্ট। তিনি ১৮১১ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট এই উইল করেন যে, তাঁহার সকল সম্পদ ও অর্থ দ্বারা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার নামানুসারে একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্ট হইবে। উক্ত পদের উদ্দেশ্য হইবে—'খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা যাহার সাহায্যে পাদ্রীগণ ভারতীয়গণকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কার্যে সচ্ছে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে।' নানা কারণে উক্ত পদে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেহ নিযুক্ত হন নাই। এই পদে উইলসন প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন ১৮৩২ খৃঃ এবং দ্বিতীয় অধ্যাপক হন মনিয়ার উইলিয়ামস্ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতাধ্যাপক থাকিবার কালে মনিয়ার স্বীয় ব্যয়ে তিন বার ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি প্রথম বার আসেন ১৮৭৫-৭৬ খৃঃ, দ্বিতীয় বার ১৮৭৬-৭৭ খৃঃ এবং তৃতীয় বার ১৮৮৩-৮৪ খৃঃ। এই তিন সময়ে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন যথাক্রমে লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপণ এবং লর্ড লিটন। দ্বিতীয় বারে মনিয়ার উইলিয়ামস্ কলিকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড রিপণের অতিথি হন। তাঁহার প্রথম আগমনকালে প্রিন্স অব ওয়েলস্

ভারতে ভ্রমণ করিতেছি।" এইবার স্যার রিচার্ড টেম্পল কলিকাতার বেলভিডিয়ার গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। স্যার জেমস ফার্গুসন কর্তৃক ১৮৮৪ খৃঃ স্যার মনিয়ার বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট হাউসে সমাদৃত হন। এই তিন বারেই স্যার মনিয়ার ভারত এবং সিংহলের বহু নগর ও গ্রাম পরিভ্রমণ-পূর্বক স্থানীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানের উপাদান সংগ্রহ করেন। ভারতের সকল বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং সংস্কৃতে কথা বলিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। দার্জিলিংএ অবস্থানকালে মনিয়ার সাহেব তিব্বত ভ্রমণকারী রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের নিকট হইতে সংস্কৃত গবেষণায় বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মনিয়ার ১৮৮৩ খৃঃ অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হন। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে এবং ইউনিভার্সিটি কলেজে তিনি যথাক্রমে ১৮৮২-৮৮ এবং ১৮৯২ খৃঃ ফেলো ছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর অব ল (ডি. সি. এল) ডিগ্রি প্রদানপূর্বক সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ খৃঃ তিনি স্যার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৭ খৃঃ কে. সি. এস. আই হন। ১৮৯৯ খৃঃ ১১ই এপ্রিল ফ্রান্সের কানেস নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের শেষ প্রুফটি পর্য্যন্ত তিনি দেখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ মধ্যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হইতে প্রকাশিত হয়।

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামসের প্রথম গ্রন্থ একখানি বৃহৎ ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান। তাঁহার সংস্কৃত-শিক্ষক উইলসনের আগ্রহেই তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সাত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ-রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহাই সর্বপ্রথম ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান এবং ইহা ১৮৫১ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানই তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। উহার প্রথম সংস্করণ ১৮৭২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে প্রায় এক হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল এবং এইগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিক্রীত হয়। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণে অন্যাধিক এক লক্ষ বিশ হাজার শব্দ ছিল। আরও

ষাট হাজার শব্দ সংযোগ করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত হয়। নূতন সংস্করণটি এক খণ্ডে ১৩৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং বিশেষ উপযোগী। জার্মেনির জেনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. কাপেলার ও ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ই. লিউমান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহাকে এই অভিধান প্রণয়নে সাহায্য করেন। অটো বহ্‌টলিংক, রডলফ রথ, আলব্রেকত ওয়েবার এবং অন্যান্য জার্মান সংস্কৃতজ্ঞগণ সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ যে সংস্কৃত-জার্মান অভিধান প্রস্তুত করেন উক্ত অভিধানের নিকট মনিয়ার উইলিয়ামস্ স্বীয় সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানের অশোধ্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। মনিয়ার সাহেব স্বীয় অভিধানের নব সংস্করণে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। তিনি এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "Every particle of its detail was thought out in my own mind অর্থাৎ এই সুবৃহৎ গ্রন্থের খুটিনাটি টুকরাটি পর্যন্ত আমি নিজ মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি।"

উক্ত অভিধানের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, অক্সফোর্ডে প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাকালে জানিয়াছি যে, সংস্কৃত অভিধানের উদ্দেশ্য হইবে এই ভাষার ধাতুগত সরল শব্দার্থসমূহ ক্রমান্বয়ে সজ্জিত করা। কারণ, সংস্কৃত গ্রীক ভাষারও অগ্রজা এবং গ্রীক ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তিও সংস্কৃত। এই জন্য তিনি যে অভিধান রচনা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত সংস্কৃত শব্দের ইংরাজি এবং সদৃশ ইন্দো-আর্য ভাষা-সমূহের অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে। মনিয়ার উইলিয়ামস উক্ত ভূমিকায় আরও বলেন, "আর্য ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃতই প্রাচীনতম এবং ইংরাজী অন্যতম আধুনিক ভাষা। আর্য ভাষাসমূহ কোন সাধারণ নামহীন অজ্ঞাত ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহাদের এক জন্মস্থান সম্ভবতঃ ব্যাক্ট্রিয়া (বাল্ক)। এই কেন্দ্র হইতে আটটি ভাষাস্রোত প্রবাহিত হয়, দুইটী এশিয়াতে এবং ছয়টি ইউরোপে। এশিয়ার ভাষাস্রোত দুটির একটী ভারতীয়, অপরটি ইরাণীয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, অর্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা এবং হিন্দি, মারাঠী, গুজরাতি, বাঙলা, উড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভাষা ভারতীয় প্রবাহের অন্তর্গত। জেন্দ, প্রাচীন

ফার্সী, পহ্লবী, আর্মেণীয়, আধুনিক ফার্সী এবং পুস্তু প্রভৃতি ভাষা ইরাণীয় প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী। কেল্টিক, হেলেনিক, ইটালীয়, টিউটনিক, শ্লাভানিক ও লিথুয়ানিয়ান—এই ছয়টি ইউরোপীয় ভাষা-স্রোত। সংস্কৃত শব্দের ধাত্বর্থ জানিলে এই সকল ভাষার গঠন-প্রণালী বোঝা সহজ হয়। গ্রীক, জার্মান বা অন্য কোন আর্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার-শক্তি অনেক বেশী।" মনিয়ারের মতে গ্রীক বা লাটিন ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য বহুগুণ বেশী। তাঁহার অভিধানে বহু সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখও আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তিনি প্রায় দশ হাজার সংস্কৃত গ্রন্থের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ হইতে প্রকাশিত বিশাল সংস্কৃত অভিধানে শত শত সংস্কৃত (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সার মনিয়ার বলেন, "সংস্কৃত গ্রন্থের বৃহত্ত্বদর্শনে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। ভার্জিলের ইনিডে নয় হাজার লাইন এবং হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসিতে যথাক্রমে বার হাজার ও পনের হাজার লাইন আছে। কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতে কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ লাইন আছে। কতকগুলি বিষয়ে, যথা পারিবারিক স্নেহ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায়, সংস্কৃত গ্রীস ও রোমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর সহিত তুলনায় উচ্চতর স্থান অধিকার করিবে। নৈতিক জ্ঞানের গভীরতায় সংস্কৃত সাহিত্য অতুলনীয়। শিক্ষিত হিন্দুগণ এলজেব্রা, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও উদ্ভিতবিদ্যা প্রভৃতিতে সম্ভবতঃ আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের আর কথা কি? সংস্কৃতের মত অন্য কোন ভাষায় ব্যাকরণ এত সমৃদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক নহে। ইউরোপের প্রাচীনতম জাতিগণ উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা করিবার অনেক পূর্বে ভারতে এই সকল বিষয় সমধিক উন্নত হইয়াছিল।" সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য স্যার মনিয়ার ইংরাজিতে যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহাও চমৎকার। এতদ্ব্যতীত তিনি 'নলোপাখ্যান' এবং 'শকুন্তলা'র এক একটি সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার একটি সুলিখিত গ্রন্থ আছে।

'ভারতের ধর্ম' শীর্ষক তাঁহার যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আছে তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"ভারতে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আজীবন

অধ্যয়ন দ্বারা ভারতীয় ধর্মের এই বিবরণ আমি লিখিতেছি।" "ইণ্ডিয়ান উইসডম্" (ভারতীয় প্রজ্ঞা) শীর্ষক বইথানির দ্বারা তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বইটিতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বর্ণনা আছে। এই পুস্তকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, পারিবারিক জীবন ও আচারের চিত্র অংকনে সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয় গ্রীক ও রোমান কাব্য অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব ও সত্য। নারীর রূপ ও গুণ বর্ণনায় হিন্দু কবি সকল অতিরঞ্জন উপেক্ষা করিয়া ব্যবহারিক জগৎ হইতে কৈকেয়ী ও কৌশল্যা, মন্দোদরী ও মন্থরা প্রভৃতি বাস্তব জীবন গ্রহণ করিয়াছেন। হেলেন বা এমন কি পেনিলোপ অপেক্ষা সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ হিন্দু নারীগণ আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য। মহান পতিভক্তিতে এবং দুঃখ ও প্রলোভনের মধ্যে অদম্য ধৈর্য ও সহনশীলতায় সীতা হেলেন বা পেনিলোপের অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিতা। সাধারণভাবে হিন্দু নারীগণ দাম্পত্যজীবনের পরিপূর্ণ আদর্শ। অতীতকালে হিন্দুর গৃহে যে সরলতা ও পবিত্রতা বিরাজ করিত, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পতিব্রতাগণের জীবন। সর্বকালে, সর্বদেশে মানবচরিত্রে যে প্রীতি, মমতা, স্নেহ প্রভৃতি কোমল গুণ বিকশিত হয় সেইগুলির বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্য গ্রীক কাব্যকে পরাস্ত করে। সংস্কৃত সাহিত্য এখন বহু সমৃদ্ধি পরিপূর্ণ যাহা হইতে জানা যায়, প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও পবিত্রতা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা ছিল। হিন্দু নারীদের কর্মমূলক সামাজিক কর্তব্য পালনে যে গভীর নিষ্ঠা ছিল তাহা অন্য দেশে দুর্লভ। হোমারের কাব্যে যে সভ্যতার চিত্র আছে তাহা সংস্কৃত কাব্যে চিত্রিত সভ্যতার নিকট নিষ্প্রভ। অযোধ্যা ও লংকায় যে বিলাসিতার বর্ণনা আছে তাহা স্পার্টা ও ট্রয়ে কখনও সম্ভব হয় নাই। রাম একাধারে আদর্শ পতি, আদর্শ পুত্র ও আদর্শ ভ্রাতা। লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম মানবজাতির কাম্য। দশরথ আদর্শ পিতা এবং কৌশল্যা আদর্শ মাতা। রামায়ণের নৈতিক ভাব নিশ্চিতই ইলিয়াড অপেক্ষা গভীরতর। রামায়ণ বা মহাভারত পাঠান্তে প্রত্যেকের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিবে যে, উহা হোমারীয় কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত কাব্যের প্রত্যেক বর্ণনায় যে গভীর ধর্মভাব নিহিত তাহা হোমারের কাব্যে অদৃষ্ট।"

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে স্যার মনিয়ার উচ্চ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'মৃচ্ছকটিকম্' সম্বন্ধে তিনি বলেন, "যে দক্ষতার সহিত আখ্যায়িকাটি উদ্ভাবিত, যে কৌশলে উহার ঘটনা-পরম্পরা ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত, যে নৈপুণ্যের সহিত চরিত্রগুলি চিত্রিত এবং যে ভাষার পারিপাট্য উহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে তাহার দ্বারা উহা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকের সমকক্ষ।" সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রের অকপট প্রশংসায় মনিয়ারের পুস্তকখানি মুখরিত। তাহার ধারণা, পাঠকমাত্রেই এই সকল গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত নৈতিক ভাবে অভিভূত হইবেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, প্রভৃতি সংস্কৃত পুস্তক উপদেশপ্রদ এবং নীতিগত বাক্যে পরিপূর্ণ এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানে ও দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত।" হিন্দুধর্ম নামক তাঁহার বইখানিতে তিনি আমাদের ধর্মের ঐতিহাসিক বিকাশ দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন, "হিন্দু ধর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তে সকল ধর্মের সারসম্পন্ন হইয়াছে। সকল প্রকার মানব মনের উপযোগী ভাবরাশি ইহার মধ্যে বিদ্যমান। ইহা উদার, সারগ্রাহী, সর্বভাবসম্পন্ন ও গতিশীল। ভারতে পাঁচ শত কথিত ভাষা থাকিলেও উহার একটিমাত্র দেবভাষা, একটিমাত্র দেবসাহিত্য আছে। জাতি, ধর্মমত, বর্ণ, আশ্রম ও ভাষা নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই এই সাহিত্য ও ভাষাকে শ্রদ্ধা করেন। এই ভাষার নাম সংস্কৃত, এই সাহিত্যের নাম সংস্কৃত সাহিত্য। এই দেবসাহিত্যই অনন্ত জ্ঞানরাশির আকর এবং হিন্দু ধর্ম, দর্শন, নীতি প্রভৃতির বাহন। হিন্দু ধর্মের সকল তত্ত্ব, সকল মত, সকল প্রথা, সকল বিধি এই দর্পণে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত। এই সংস্কৃত সাহিত্য প্রস্তরখনিতুল্য। ভারতের কথিত ভাষাগুলিকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করিবার ও বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিক ভাব প্রকাশের অসীম মালমশলা উহার অন্তরে বিদ্যমান।"

স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্ কালিদাসের শকুন্তলার একটি সরল ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদটি মৌলিক ও প্রাঞ্জল। উহার ভূমিকায় তিনি বলেন "এই নাটকের একটিমাত্র অংক যিনি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিবেন, তিনিই মহাকবির অলৌকিক প্রতিভার এবং কল্পনার প্রাচুর্যতায় মুগ্ধ হইবেন। যে

সৌন্দর্য-প্রীতি, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, মানব হৃদয়ের গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্মতম ভাবের প্রকাশ ও প্রশংসা প্রভৃতি ভাব-সংঘর্ষের পরিচয় কালিদাসে দৃষ্ট হয় তাহা অসাধারণ ও বিস্ময়কর। জগতের সাহিত্যে 'শকুন্তলা' একটি উজ্জ্বল ও অমূল্য রত্ন। বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলেন, উহা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে তিনি বলেন, "তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় যে বাগ্মিতা আছে তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত; নিশ্চয়ই আমার সেইরূপ বাগ্মিতা বা সংস্কৃতজ্ঞান নাই।" 'বর্ত্তমান ভারত' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরাজির সহিত গ্রীক ভাষার যে সম্বন্ধ, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সহিত সংস্কৃতেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। সংস্কৃত ব্যাকরণই ভারতের সকল ভাষার ব্যাকরণের জননী। সাধারণ শিক্ষার জন্য জ্যামিতি পাঠ যেমন আবশ্যক, সংস্কৃতের সমন্বয়-ভাবটি সাহিত্য সাধনার পক্ষে তেমনি উপযোগী। সংস্কৃত সাহিত্যে যে আদর্শ কবিতা, গভীর দর্শন, সুচিন্তিত বিজ্ঞান ও সংনীতি পাওয়া যায়, তাহা জগতের অন্য কোন ভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতই হিন্দুদের সকল কথিত ভাষার স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও জীবনীশক্তির উৎস। সংস্কৃতই হিন্দুধর্মের সকল ভাবের আকর-ভূমি।"

সংস্কৃতের সেবায় মনিয়ার উইলিয়ামস্ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত ভারত-মিত্র, অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ ও উদারচেতা মহাপুরুষ। তিনি ভারতেই জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবাসীরূপেও আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি। আজীবন পাশ্চাত্যে সংস্কৃত প্রচার করিয়া তিনি ভারতের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে প্রীতির আলোকে জাগরূক থাকুক।

ষোল

শঙ্করাচার্য্য

"Western people can hardly imagine a personality such as that of Sankaracharya. To have acquired such a mass of Sanskrit learning as to creat a distinct philosophy, and to impress himself on the scholarly imagination of India in a pre-eminence that twelve hundred years have not sufficed to shake; to have written poems whose grandeur makes them unmistaken even to the foreign and unlearned ear; and in the same time to have lived with his disciples in all the radiant joy and simple pathos of the saints—this greatness that we may appreciate but cannot understand."—Sister Nivedita.

"What shall we say, then, of Master Sankar? Is he not the Guardian of sacred waters, who by his commentaries, has hemmed about, against all impurities or Time's jealousy, first the mountain tarns of the Upanishads, then the serene forest lake of the Bhagavad Gita, and last the deep reservoir of the Brahmasutras; adding from the generous riches of his wisdom, lovely fountains and lakelets of his own, the crest Jewel, the Awakening, the Discernment."—Charles Johnston.

শঙ্কর, রামানুজ ও মাধ্ব ছিলেন বেদান্তের প্রধান আচার্য্যত্রয়। তিনজনই দক্ষিণ দেশে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রাচীনতম। তিনি মালাবার প্রদেশে কালাডি গ্রামে নাম্বুদরী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম আর্য্যাম্বা। ব্রাহ্মণ দম্পতীর দীর্ঘকাল কোন পুত্রলাভ না হওয়ায় উভয়ে মহাদেবের আরাধনা করেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া মহাদেব স্বপ্নে তাঁহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"এই দেখ দুটী শিশু,—একটী দীর্ঘায়ু কিন্তু মূর্খ, অপরটী অল্পায়ু অথচ জ্ঞানী। তোমরা কোন শিশুটী চাও?" ব্রাহ্মণী দ্বিতীয় শিশুটীকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করিলেন। যথাসময়ে আর্য্যাম্বার একটী পুত্ররত্ন লাভ হয়। শিবের বরে এই সন্তান প্রাপ্ত হওয়ায় মাতা পুত্রের নাম রাখিলেন শঙ্কর। আচার্য্য শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্ট ও শঙ্কর উভয়েরই সমান আয়ুষ্কাল ছিল। মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরু জ্ঞানেশ্বর অধিকতর অল্পায়ু ছিলেন, তিনি মাত্র একুশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তৎপূর্বেই জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায় গীতার উপর যে টীকা রচনা করেন তাহা মহারাষ্ট্রে অদ্যাবধি বেদতুল্য পূজিত ও পঠিত হয়।

শঙ্করাচার্য্যের জীবন-কাহিনী বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। মাধব বিদ্যারণ্য কৃত 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থেই আচার্য্যের জীবন-ঘটনা যৎকিঞ্চিৎ জানা যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণের মতে উক্ত গ্রন্থ বিশ্বাসযোগ্য নহে, উহাতে বহু বিষয় প্রক্ষিপ্ত ও অনৈতিহাসিক। উক্ত গ্রন্থে আছে যে, শঙ্কর স্বীয় জীবনে কুমারিল্ল, উদয়ন, শ্রীহর্ষ এবং শ্রীকণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ ও বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারো মতে ইহা সম্ভব নহে। কারণ এই চারিজন মনীষির কেহই শঙ্করের সমসাময়িক ছিলেন না। শঙ্কর শিবাবতাররূপে অসংখ্য হিন্দু কর্তৃক পূজিত। প্রথমে তাঁহার বয়স মাত্র ষোড়শ বর্ষ ছিল, কিন্তু ব্যাসদেবের আশীর্বাদে তিনি আরও ষোড়শ বর্ষ আয়ুষ্কাল লাভ করেন। পণ্ডিত টাইলে এবং পাঠকের মতে শঙ্করের জন্ম ৭৮৮ খ্রীঃ এবং মৃত্যু ৮২০ খ্রীঃ। এই মত সমধিক প্রচলিত ও অধিকাংশ পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত। বৃহত্তর ভারতের এক শিলালিপিতে উক্ত মতের অনুকূল সংবাদ পাওয়া যায়। কাম্বোডিয়ার (Cambodia) এক শিলালিপিমতে ভগবান শঙ্করের শিষ্য শিবসোম রাজা ইন্দ্রবর্মন (৮৭৮—৮৮৮ খ্রীঃ)-এর গুরু ছিলেন। শিবসোম জয়বর্মণের মাতুলের পৌত্র এবং ৮০২ হইতে ৭৭৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। শঙ্করের জীবনকাল সম্বন্ধে ৪০০ খ্রীঃ হইতে ৮০৫ পর্য্যন্ত বহু

তারিখ পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তেলাং সপ্তম শতাব্দীকে শঙ্করের আবির্ভাবকালরূপে নির্ণয় করেন। কারণ শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পাটলীপুত্র সহরের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নদীর বন্যায় এই সহরটী ৭৫০ খ্রীঃ বিধ্বস্ত হয়। শঙ্কর তৎপূর্ব্বে নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন। শঙ্করের আবির্ভাব ভর্তৃহরির পরে। চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিং এর মতে ভর্তৃহরির আবির্ভাবকাল ৬০০ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। আবার বাচস্পতি মিশ্র ছিলেন শঙ্করের পরবর্ত্তী। বাচস্পতি শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর ভামতী নামক বিখ্যাত টীকার রচয়িতা। বাচস্পতির আবির্ভাব ৮৪১ খ্রীঃ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ক্যাতারো মতে শঙ্করের তারিখের ঊর্দ্ধতম ও অধস্তম সীমা সপ্তম হইতে অষ্টম শতাব্দী। মান্দ্রাজের অধ্যাপক সূর্য্যনারায়ণ শাস্ত্রী বলেন যে, শঙ্করের সময় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে নির্দেশ করাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান লেখকের এই মত সমর্থনে যথেষ্ট আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তি এই—শঙ্করের সময়ে যে সকল বেদবিরোধী ধর্ম্মমত ভারতে বর্ত্তমান ছিল তিনি তাঁহার ভাষ্যাদিতে সেই সকলের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের কোনও প্রকার উল্লেখ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ খ্রীষ্টধর্ম্ম তখন দক্ষিণ ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টের নবধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হয়। এমন কি ব্রিটেনের পূর্ব্বেই ভারতে খ্রীষ্টবাণী প্রচারিত হয়। কথিত আছে যে, যিশু খ্রীষ্টের স্বশিষ্য সেণ্ট টমাস্ ভারতে আগমনপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। শঙ্করের আবির্ভাবের ছয় সাত শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে যে অঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল সেই দেশে (মালাবারে) আবির্ভূত হইয়াও শঙ্কর উক্ত মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন নাই কেন? ইহাতে মনে হয়, ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে শঙ্করের আবির্ভাব হয়েছিল।

দ্বিতীয় আপত্তি এই—শঙ্কর যে বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা বিকৃত। বৌদ্ধমত জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যখন সিংহলাদি ভারতেতর প্রদেশে গমন করে তখনই উহা ভারতে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের সময়ই ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব দেশব্যাপী হয় এবং উক্ত শতাব্দীতেই

সঙ্ঘমিত্রা ও মহেন্দ্র ধর্মপ্রচারার্থ অশোক কর্তৃক সিংহলে প্রেরিত হন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহলের মাতালে নামক স্থানে আলুবিহারে থাকিয়া বুদ্ধ ঘোষ পালি ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করেন। (বর্তমান লেখকের এই প্রসিদ্ধ ও পবিত্র বিহার দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল।) ততদিন পর্যন্ত বৌদ্ধমত সিংহলে নিশ্চয়ই প্রভাবশালী ছিল এবং ব্রহ্মদেশ সিংহল হইতেই বৌদ্ধধর্ম প্রাপ্ত হয়। সনাতন ধর্ম হইতে স্বীয় অস্তিত্ব পৃথক্ রাখিবার জন্যই বৌদ্ধাচার্যগণ স্বধর্মে ভাবেই অনাত্মবাদ ও নাস্তিকবাদ সৃষ্ট করেন এবং তাহা সিংহলে প্রচারিত ও পুষ্ট হয়। সুতরাং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্বে শঙ্করের আবির্ভাবের সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ শঙ্কর-বেদান্ত ও মহাযান বেদান্তের সাদৃশ্য সমকালীনতা সূচনা করে।

শঙ্করাচার্য্য অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। বিধবা মাতা একমাত্র পুত্রকে প্রতিপালন ও শিক্ষাপ্রদান করেন। শঙ্করের অসাধারণ মেধা ছিল। কোন বিষয় একবার পড়িয়া বা শুনিয়া তিনি মনে রাখিতে পারিতেন। বিস্মৃতি কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। উপনয়নান্তে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর। কিন্তু মাতা তাহাতে আদৌ সম্মত হইলেন না। একমাত্র পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে দিয়া গর্ভধারিণী বাঁচিবেন কিরূপে? মাতাকে রাজী করবার জন্য পুত্র এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। কালাডি গ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিতা আলোয়াই নদীতে স্নানার্থে মাতাপুত্র একদিন গিয়াছেন। গভীর জলে ডুব দিয়া পুত্র চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমাকে কুম্ভীর ধরেছে। সন্ন্যাসের অনুমতি পাইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা'। মাতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। পুত্রকে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি দিয়া মাতা শোকাতুরা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। পুত্র মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, মাতার অন্তিম কালে তাঁহাকে তিনি দর্শন দিবেন ও সেবা করিবেন। শঙ্কর বলিলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন মাতার শেষ সময়ে মুখে মাতৃস্তনের আস্বাদ পাইবেন। মাতাকে এই প্রকার সান্ত্বনা দিয়া শঙ্কর সংসার ত্যাগ করিয়া

নর্মদাতীরে সমাধিমগ্ন যোগী গোবিন্দভগবৎপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে নর্মদা নদী উচ্ছ্বসিতা হইয়া গুরু গোবিন্দপাদের কুটীর ভাসাইয়া দিতে চাহিলে শঙ্করের আদেশে নিরস্তা হন। শঙ্কর নর্মদাদেবীকে ভয় দেখান যে, গুরুর কুটীর প্লাবিত করিলে তিনি দেবীকে তাঁহার কমণ্ডলুতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। গোবিন্দ ভগবৎপাদ একজন প্রসিদ্ধ বেদান্তী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। মাণ্ডুক্য-কারিকার লেখক গৌড়পাদাচার্য্য ছিলেন তাঁহার গুরু। গোবিন্দপাদ কঠোর তপস্বী ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। বালক শিষ্য শঙ্কর আসিবামাত্রই চক্ষু উন্মিলিত করিয়া বলিলেন, "বৎস এসো, তোমার জন্যই এতকাল, এখানে অপেক্ষা করিতেছি।" ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় সম্পদ শিষ্যের হস্তে করামলকবৎ প্রদানপূর্বক এই বেদভূমিতে বেদান্ত প্রচারের গুরু দায়ীত্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে সমগ্র জগতে সনাতন ধর্ম প্রচারের ভার দিয়া যান গোবিন্দপাদ তেমনি শঙ্করকে এই মহাব্রতে দীক্ষিত করেন। শঙ্কর গৌড়পাদের প্রশিষ্য হইলেও উভয়ের মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। অবশ্য, উভয়েই বেদান্তদর্শনের প্রচারক। গৌড়পাদ উপনিষদের সর্বপ্রথম টীকাকার এবং তাঁহার মতকে 'অজাতবাদ' বলা হয়। শঙ্কর মায়া স্বীকার করেন। কিন্তু বলেন যে, উহার কোন প্রকার সংজ্ঞা বা ব্যাখা দেওয়া যায় না। তিনি অধ্যাস মানিয়া লন। কিন্তু গৌড়পাদ উহা অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে মায়া জাত হয় নাই, কেবলমাত্র ব্রহ্মই আছেন, নামরূপ দৃষ্টই হয় না। গোবিন্দপাদের যে কী মত ছিল, তিনি মায়াবাদী কি অজাতবাদী ছিলেন—তাহা জানিবার উপায় নাই। শঙ্কর মাণ্ডুক্য-কারিকার উপরে যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহাতে গোবিন্দপাদকে গুরুরূপে এবং গৌড়পাদকে পরমগুরুরূপে প্রণাম করিয়াছেন। কাহারো মতে গৌড়পাদের কারিকায় বৌদ্ধপ্রভাব লক্ষিত হয়। উহাতে 'ধর্ম' প্রমুখ যে কয়েকটী শব্দ আছে সেগুলির অর্থ অন্যথা ঠিক ঠিক হয় না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 'গৌড়পাদ' শীর্ষক তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহে

গৌড়পাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দার্শনিকরূপেই প্র[illegible] করিয়াছেন। শুনা যায়, জনৈক বৌদ্ধ কর্তৃক লিখিত মাণ্ডুক্য-কারিকার একটী টীকাও পাওয়া গিয়াছে। গৌড়পাদ ছিলেন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের সমসাময়িক। নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক-কারিকা' এবং গৌড়পাদের 'মাণ্ডুক্য-কারিকা' সম্ভবতঃ একই সময়ের। মাধ্যমিক-কারিকার টীকাকার চন্দ্রকীর্তি। গৌড়পাদ এবং নাগার্জুনের দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য প্রচুর। শঙ্করাচার্য্যকেও কেহ কেহ 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' বলেন। উপনিষদ যুগ এবং শঙ্করযুগের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান ছিল সেই সময় বৌদ্ধদর্শন প্রবৃদ্ধ হয়। শঙ্করবেদান্ত উহার পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিয়া স্বভাবতঃই বেদান্তে বৌদ্ধপ্রভাব-পরিলক্ষিত হয়। বেদান্তকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদর্শন হইতে অনেক ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অবশ্য তাঁহার নিজস্ব মৌলিকতা অসীম। কোনও স্থান হইতে কাঠখড় আনিয়া ঘর তৈয়ার করিলে পূর্বগৃহই যে নির্মিত হইবে এমন নহে। বেদান্ত শঙ্করের স্বসৃষ্ট নহে। বেদান্ত বেদেই, উপনিষদেই বিরাজিত। বৃক্ষ শঙ্করের নহে। তিনি জলসেচন ও সারদান করিয়া উহাকে পুষ্ট, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং বেদান্ত শঙ্করের সৃষ্টি, বেদে উহা নাই—এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রকৃত বেদপাঠক কখনও উক্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হন না। আর্য্য সমাজের প্রচারকগণ উপরোক্ত ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। কিন্তু আর্য্য সমাজীগণ ত বেদ বলিতে 'সংহিতা' অংশকেই বোঝেন। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—বেদের এই সমাজীগণের প্রধান অংশত্রয় তাঁহারা গ্রহণ করেন না। আবার ব্রাহ্ম সমাজীগণের মতে উপনিষদাংশই বেদ, বেদের সংহিতাদি অংশ তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কিন্তু সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—বেদের এই চারিটী ভাগ বেদের চারিটী অধ্যায় তুল্য। একটী পুস্তকের চারিটী অধ্যায় থাকিলে যেমন একটী বা একাধিক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া অপরটী গ্রহণ করিলে পুস্তকের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া যায় না, বেদেরও তেমনি এই চারিটী অংশের একটীকে গ্রহণ এবং অন্যটীকে ত্যাগ করিলে বেদতত্ত্ব বোঝা যাইবে না। শঙ্কর তাই উপনিষদাংশের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও অপরাংশকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মতে

বৈদিক দর্শনের ক্রমবিক... সংহিতা হইতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইতে আরণ্যক এবং আরণ্যক হইতে উপনিষদে। উপনিষদে বৈদিক দর্শন পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতালাভ করিয়াছে।

গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্কর কাশীধামে পদার্পণ করেন। বর্ত্তমানের মত অতীতেও কাশী পুণ্যক্ষেত্র ছিল। কাশী পৃথিবীর প্রাচীনতম সহর এবং ভগবান বুদ্ধদেবের সময় হইতে অদ্যাবধি প্রায় পঁচিশ শতক সমভাবে পুণ্য তীর্থরূপে পরিগণিত। এই দিব্যকান্তি বালক সন্ন্যাসী কাশীতে আগমন করিলে তাঁহার চিহ্নিত শিষ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বৃদ্ধ শিষ্য পরিবেষ্টিত বালক সন্ন্যাসীবরের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা উক্ত হইয়াছে—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

অনুবাদ—"বট বৃক্ষের পাদদেশে এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে; এক যুবক গুরু বৃদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে বিরাজমান। গুরু মৌনভাবে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় বিচ্ছিন্ন হইতেছে।" কাশীক্ষেত্রে শিষ্যগণকে বেদান্ত পড়াইতে পড়াইতে একদিন শঙ্করাচার্য্য মুখে স্বীয় মাতৃস্তন্যের আস্বাদানুভব করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার গর্ভধারিণী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। স্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষাকল্পে নিজ গর্ভধারিণীর সকাশে যাইবার অভিপ্রায় শিষ্যগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া শঙ্কর অদৃশ্য হইলেন এবং যোগবলে আকাশপথে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অন্তিমকালে পুত্রকে স্বসমীপে পাইয়া মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। প্রাণপণে গর্ভধারিণীর সেবাশুশ্রূষা করিয়া শঙ্কর মাতৃঋণ শোধ করিলেন এবং দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক মাতাকে সংসারচক্র হইতে মুক্ত করিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে শঙ্কর সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে কোনও প্রকার সাহায্য করেন নাই। মাতার মৃতদেহ একাকী বহনে অসমর্থ হইয়া শঙ্কর উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বহন করেন। চিতা জ্বালাইবার কাট না পাইয়া তিনি স্বীয় উদ্যানস্থিত কলাগাছের শুক্‌নো পাতা ও

বাগলা কাটিয়া মাতার শবদাহ করেন। জ্ঞাতিগণের অসহযোগিতার জন্য শঙ্কর তাহাদিগকে এই অভিসম্পাদ প্রদান করেন যে, তাঁহাদিগকেও তাঁহার ন্যায় মৃতদেহ স্বীয় বাগানে দাহ করিতে হইবে। বহুকাল উক্ত অভিশাপ ক্রিয়াশীল থাকার পর শৃঙ্গেরী পীঠের কোন মঠাধীশ উহা সম্প্রতি অপসারণ করিয়াছেন।

শঙ্করের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা জানা যায় তন্মধ্যে একটী এইরূপ। একদা আচার্য্য শিষ্যগণ সহিত বদ্রীনারায়ণের অভিমুখে যাইতেছেন। হিমালয়ের ঐ পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা অতিশয় উচ্চনীচ। পথে একটী উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হইবে। অবশ্য পর্বতটী পরিক্রমা করিয়া যাইবার দীর্ঘ পথও আছে। আর চড়াই পথে যাইলে পথ অল্প হয় বটে, কিন্তু পরিশ্রম অধিক হয়। পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইবার অভিপ্রায় শিষ্যগণ প্রকাশ করিলে তিনি তাহাদিগকে অগ্রগামী হইতে আদেশ করিয়া অপেক্ষা ও বিশ্রাম করিলেন এবং যোগবলে অলৌকিক ভাবে পর্বতের অপর পার্শ্বে পৌছিলেন। শিষ্যগণ কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন গুরুদেব তাঁহাদের পূর্বেই আসিয়াছেন। শঙ্করের উপনয়নান্তে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। তিনি প্রথানুযায়ী উপনয়নের পর এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার্থ গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র। শঙ্কর দ্বারে ভিক্ষা চাহিলে ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটী আমলকী প্রদানপূর্বক কাতর ভাবে বলিল, 'বাবা, গৃহে ত অন্য কিছু নাই। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইয়াছেন। তাই নিরুপায় হইয়া তোমাকে আমলকীটী দিলাম। আমার অপরাধ লইও না।' শঙ্কর ব্যথিত হইলেন এবং দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণ দম্পতীর অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, অল্পবয়সে শঙ্কর অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা গ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিতা নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধি হেতু তাঁহার চলনশক্তি হ্রাস হওয়ায় আর এতদূর যাইতে পারিতেন না বলিয়া বিশেষ দুঃখ করিতেন। পুত্রের নিকট মনোভাব প্রকাশ করায় পুত্র মাতাকে আশ্বাস দেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় নদী বাটীর পার্শ্ব দিয়াই অদূর ভবিষ্যতে প্রবাহিত

হইবে। কয়েকদিন পরে . .নদীর জল স্ফীত হইয়া যায় এবং নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া শঙ্করের গৃহের পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হয়। তখন শঙ্করের জননী ইহাতে স্নান করিয়া পরমানন্দিতা হন।

মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনান্তে শঙ্করাচার্য্য কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন। তখন তিনি মাত্র ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করেছেন। একদিন জীর্ণবস্ত্রপরিহিত, শীর্ণকায় এবং শিখাসূত্রধারী এক ব্রাহ্মণ আসিয়া আচার্য্যের সহিত বেদান্ত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আলোচনা গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী চলিল। শিষ্যসেবক পদ্মপাদ আচার্য্যের পশ্চাতে ছায়ার মত উপস্থিত থাকিয়া তুমুল তর্কের গতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কেহই তর্ক হইতে বিরত হইতেছেন না দেখিয়া পদ্মপাদ নিম্নোক্ত শ্লোকটী আবৃত্তিপূর্বক উভয়কে তর্ক বন্ধ করিতে করযোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন—

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে ন জানে কিং করোম্যহং॥

অনুবাদ—"শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং মহাদেব শিব, আর এই ব্রাহ্মণবর ছদ্মবেশী ব্যাসদেব। সাক্ষাৎ বিষ্ণুই আবার ব্যাসরূপে অবতীর্ণ। বিষ্ণু ও শিব বিবাদে প্রবৃত্ত। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি।" তর্ক বন্ধ হইলে ব্যাসদেব শঙ্করকে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "তোমার বেদান্তবোধে আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। তুমি প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কর।" শঙ্কর তাঁহাকে স্বীয় আয়ুর স্বল্পতা জ্ঞাপন করিলে ব্যাসদেব তাঁহাকে আরও ষোড়শবর্ষ আয়ু প্রদান করেন। শঙ্কর সনাতন ধর্মের অভেদ্য দুর্গরূপে যে চারিটী মঠ ভারতের চারিদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের একটী অবস্থিত বদ্রীকাশ্রমে হিমালয়ের মধ্যে। সেই মঠের নাম জ্যোতির্মঠ। চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের মধ্যে নিভৃত গুহায় বসিয়া শঙ্কর প্রস্থানত্রয়ের* উপর

* প্রস্থানত্রয়ের নাম গীতা ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদাবলী। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তীরেয়, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ প্রধান উপনিষদ এবং গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করভাষ্য আছে। কেহ কেহ শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যকে শঙ্করকৃত নহে—এইরূপ সন্দেহ করেন।

ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করভাষ্যই অদ্বৈত বেদা... প্রধান ও মৌলিক গ্রন্থ। উহাদের ভাব ও ভাষা গুরুগম্ভীর। শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের অন্য তিনটী পুরীতে, মহীশূরে ও দ্বারকায় অবস্থিত এবং তাঁহাদের নাম যথাক্রমে গোবর্ধন মঠ, শৃঙ্গেরী মঠ ও সারদামঠ। আচার্য্য নিজে চারিজন প্রধান শিষ্যকে চারি মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই চারি মঠ হইতে দশটী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের নাম যথা—গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বন, পর্বত, সাগর, অরণ্য, আশ্রম এবং তীর্থ। এই সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণকে দশনামী সন্ন্যাসী বলে। ইহারাই প্রকৃত বৈদিক সন্ন্যাসী এবং হিন্দু ধর্মের অদ্যাপি বর্তমান প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসঙ্ঘ। উদাসী, কবীরপন্থী প্রভৃতি যে সকল সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আধুনিক দেখা যায় উহারা দশনামী নহে, যদিও তাঁহাদের অধিকাংশই বৈদান্তিক।

শঙ্কর যখন কাশীতে অবস্থান করিতে ছিলেন তখন উহা সংস্কৃত-বিদ্যার অন্যতম প্রধান পীঠ ছিল। আজ পর্য্যন্তও হরিদ্বার, নাসিক, নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানের ন্যায় কাশী তাহার পূর্বগৌরব রক্ষা করিয়াছে। কাশীতে তখন ছাত্রগণ প্রধানতঃ ব্যাকরণাধ্যয়নই করিত। কাশীর নানা স্থানে পাঠশালা এবং প্রত্যেক পাঠশালায় অধিকাংশ ছাত্র ব্যাকরণের সূত্রগুলি উচ্চরবে কণ্ঠস্থ করিত। ব্যাকরণের একটী সূত্রে আছে—'ডুকৃঞ্ করণে'। বহুস্থানে ছাত্রগণ এই সূত্রটী মুখস্থ করিতেছে শুনিয়া শঙ্কর বিরক্ত হন এবং সকলকে গোবিন্দভজন করিতে উপদেশ দিয়া একটী মনোহর স্তোত্র রচনা করেন। নিম্নে উহার কয়েকটী শ্লোক সানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

দিবসযামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতি আয়ুঃ তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥১

অনুবাদ—দিবা ও রাত্রি, সকাল ও সন্ধ্যা, শিশির ও বসন্তাদি ঋতু আসিতেছে আবার যাইতেছে। এইভাবে কাল ক্রীড়া করিতেছে এবং আয়ুক্ষয় হইতেছে। তথাপি মানুষ আশাত্যাগ করে না। হে মূঢ়মতি মানব, ভগবানের ভজন কর,

চিন্তা কর ও ধ্যান কর। নিকটবর্তী হইলে ব্যাকরণের সূত্রপাঠ তোমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজো পরিবারো রক্ত।
তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে বার্ত্তাং কোপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥২
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি··· ··

অনুবাদ—যতদিন মানব উপার্জনক্ষম থাকে ততদিন তাহার আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গ তাহার প্রতি অর্থের আশায় তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে যখন তাহার শরীর জরাজীর্ণ হওয়ায় সে উপার্জনে অক্ষম হয় তখন কেহ ফিরিয়া তাহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসাও করে না। হে মূঢ়গতি মানব! ভগবানের ভজন কর ইত্যাদি।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং ॥৩
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি··· ··

অনুবাদ—বার্দ্ধক্যবশতঃ চর্ম শিথিল, কেশ সুপক্ক ও মুখ দন্তশূন্য হইয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধ দণ্ড ধরিয়া কম্পিত কলেবরে চলিতেছে। তথাপি আশাত্যাগ করে না। হে মূঢ়মতি মানব, ভগবানের ভজনা কর ইত্যাদি।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণি রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ ॥৪
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ·· ···

অনুবাদ—বালক খেলায় আসক্ত, যুবক যুবতীতে অনুরক্ত, আর বৃদ্ধ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন। কিন্তু হায়! পরব্রহ্মের চিন্তায় কেহই নিযুক্ত নহে। হে মূঢ়মতি মানব, ভগবানের ভজনা কর ইত্যাদি।

যাবজ্জননং তাবৎ মরণং তাবৎ জননী জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরঃ দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥৫
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি··· ·

অনুবাদ—জন্মের পর আসে মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পরে জীবের মাতৃগর্ভে প্রবেশ হয়। এই জন্মমৃত্যুর চক্রে মানব ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইয়া দুঃখ ভোগ

করিতেছে। সুতরাং হে মানব, তোমার সন্তোষ[illegible]। হে মূঢ়মতি মানব, ভগবানের ভজনা কর ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তকেশরী ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার নিকট ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জগৎ মিথ্যা ছিল। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পারমার্থিক সত্তা তিনি স্বীকার করিতেন না। কাশীধামে অবস্থানকালে শিষ্যগণসহ তিনি ভিক্ষা করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না—এইরূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু শঙ্কর ত ব্রহ্মশক্তি স্বীকার করেন না। তিনি সেইজন্য অন্নপূর্ণা দেবীর অর্চনা করেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরও ব্রহ্মশক্তির সত্তা স্বীকার করিতে হয়, জীবন্মুক্তি লাভের পরও মানব প্রারব্ধাধীন থাকে—এই শিক্ষা তাঁহাকে দিবার জন্য মাতা অন্নপূর্ণা এক উপায় অবলম্বন করিলেন। সশিষ্য শঙ্কর কয়েকদিন আর ভিক্ষা পান না। অনাহারে শরীর দুর্বল। তিনি শিষ্যগণসহ একস্থানে শুইয়া আছেন এমন সময় এক বৃদ্ধা নারী আসিয়া তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকল বিষয় বিবৃত করেন। তখন ছদ্মবেশী বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমার আবার দুর্বলতা, সবলতা কি? তুমিত শক্তিই স্বীকার কর না। তুমি যখন ব্রহ্মস্বরূপ তোমার আবার আহারের আবশ্যকতাই বা কী?" তখন শঙ্করের মনে এই মহাসত্য প্রতিভাত হইল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীকে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে যতদিন শরীর থাকিবে। তিনি ভক্তিভরে তখন যে অপূর্ব অন্নপূর্ণা স্তোত্র রচনা করেছিলেন তাহার একটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

> ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
> সাক্ষাৎমোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
> দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
> ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
> মাতা মে পার্বতীদেবী পিতাদেবো মহেশ্বরঃ।
> বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশভুবনত্রয়ং॥

অনুবাদ—"মা অন্নপূর্ণা, তুমি ক্ষত্রিয়গণের রক্ষাকারিণী, অশেষ অভয়দাত্রী, করুণাসিন্ধুস্বরূপা, মুক্তিদায়িনী, শুভকরী, জগতের জননী শ্রীরূপিণী, দক্ষের

ক্রন্দনের কারণ, যোগানন্দকারিণী, কাশীধামের অধীশ্বরী। হে কৃপাময়ী জননী, হে অন্নপূর্ণাদেবী, আমায় ভিক্ষা দাও। শিব আমার পিতা, অন্নপূর্ণা আমার মাতা। শিবভক্তগণই আমার বন্ধু এবং ত্রিভুবন আমার স্বদেশ।" শঙ্কর যেমন উক্ত ঘটনা হইতে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্ব মানিয়া নেন, শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীও স্বশিষ্যের নিকট জগন্মাতার অস্তিত্ব শিক্ষা করেন। পঞ্চবটীর তলায় তোতাপুরী আসন পাতিয়াছেন। সন্ধ্যা সমাগত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় অভ্যাসমত হাততালি দিয়া জগন্মাতার নাম করিতে লাগিলেন। তোতাপুরী ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুর সত্তা মানেন না। তিনি বিদ্রূপ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "ক্যা, তুম রোটী ঠোক্‌তে হো।" শিষ্য স্বীয় গুরুবাক্যে অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে জগদম্বার কথা বলিলেন। তোতাপুরী তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তোতাপুরীর পেটের অসুখ হইয়াছে, কিছুতেই আরাম হইতেছে না। একদিন রাত্রে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—'আমার ত দেহধারণের কোন আবশ্যকতা নাই। মনুষ্য শরীর ধারণের যে উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তাহা আমার সিদ্ধ হইয়াছে। এখন দেহধারণ কেবল প্রারব্ধভোগ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।' তিনি সমাধিভঙ্গের পরে গঙ্গায় ডুবিয়া দেহত্যাগ করিতে যাইলেন। মধ্যগঙ্গা পর্য্যন্ত যাইয়া দেখেন, ডুবিয়া মরিবার জল নাই। ওপার পর্য্যন্ত যাইয়া একই অনুভব হইল। বুঝিলেন, এ দৈবী মায়া। শিষ্যের নিকট গুরুর শিক্ষালাভ হইল। তোতাপুরী ব্রহ্মশক্তি বিশ্বাস করিলেন। শঙ্করের ব্রাহ্মণ শরীর ছিল, তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের কিঞ্চিৎ অভিমান ছিল। একদিন কাশীতে তিনি গঙ্গাস্নানান্তে ফিরিতেছেন। সম্মুখে এক চণ্ডাল পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া শায়িত। কাশীর গলি খুব ছোট। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে একজন গমন করিলে আর একজন আসিলে তাহার গাত্রস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী। শঙ্কর চণ্ডালকে বলিলেন, "আমাদিগকে ছুঁইও না, পা গুটাইয়া লও"। চণ্ডাল ছিলেন ছদ্মবেশী ব্রহ্মজ্ঞ। তিনি বলিলেন, "মহাত্মাজী, তুমি ও আমি অভেদ। আমি তুমির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তুমি অজ্ঞানের পরিচয় দিতেছ। আমিও যাহা, তুমিও তাহাই। জ্ঞানীর ভেদজ্ঞান সর্বথা পরিত্যাজ্য।" শঙ্করের অস্পৃশ্যতারূপ অজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, তাঁহার

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। প্রকৃত জ্ঞানীর সর্বদা সমদৃষ্টি থাকিবে। শঙ্কর চণ্ডালকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিয়া স্বীয় আস্তানায় চলিলেন।

শঙ্করের সেবক ছিলেন পদ্মপাদ। পদ্মপাদের নামকরণ সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা শোনা যায়। পদ্মপাদ গুরুর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং গুরুকে শিবজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তিনি বেদান্তশাস্ত্র পাঠে তত মনোযোগী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, গুরুভক্তি জীবন্মুক্তি প্রদানে সমর্থ। একদিন তিনি গঙ্গার অপরপারে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছেন। এমন সময় সুরেশ্বরপ্রমুখ অন্যান্য শিষ্য বেদান্তাধ্যয়নে গুরুসমীপে আগমন করিলেন। গুরু তাঁহাদিগকে পদ্মপাদের আগমন অপেক্ষা করিতে বলিলে সুরেশ্বর একটু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "ও আবার বেদান্ত কি বুঝবে?" শঙ্কর মনে মনে দুঃখিত হইলেন এবং তাহাদিগের পাণ্ডিত্যাভিমান নষ্ট করিবার জন্য একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটাইলেন। তিনি পদ্মপাদকে তৎক্ষণাৎ আসিবার জন্য আদেশ করিলে গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদ তৎমুহূর্তে গুরুসমীপে আসিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। তিনি গঙ্গাবক্ষে পদক্ষেপ করিবামাত্রই এক একটী পদ্ম তাঁহার পদধারণ করিল। এইরূপে যেখানে তিনি পদস্থাপন করেন সেইখানেই একটী পদ্ম ভাসিয়া উঠিল। তিনি গুরুস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে গুরুপদে উপস্থিত ও প্রণত হইলেন। উক্ত গুরুস্তোত্র স্বরচিত। গুরুকৃপায় তাঁহার কবিত্বশক্তিও লাভ হয়েছিল। তাঁহার প্রত্যেক পদে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল পদ্মপাদ। পদ্মপাদের এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া সুরেশ্বরের পূর্ব ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল, তিনি পদ্মপাদকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিলেন। পদ্মপাদ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের উপর যে বার্তিক রচনা করেছিলেন তাহার মাত্র পঞ্চ পাদ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, তিনি স্বরচিত ভাষ্য লইয়া ৺রামেশ্বরতীর্থ দর্শনে যান। পথে মামার বাড়ীতে ভাষ্যখানি মামার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। মামা ভাষ্য পড়িয়া দেখিলেন, উহা অতি অদ্ভুত। তখন তাহার ঈর্ষা হইল। তিনি উহা পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং ভাগ্নেকে বলিলেন যে, উহা দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হইয়াছে। পদ্মপাদ ভগ্ন হৃদয়ে গুরুসন্নিধানে আসিয়া সকল কাহিনী নিবেদন করিলেন। উক্ত ভাষ্যটীর পঞ্চপাদ শ্রুতিধর

শঙ্কর শিষ্যের নিকট পূর্বে শুনেছিলেন। সেই অংশটুকু তাঁহার মনে ছিল। তিনি তাহা যথাযথ আবৃত্তি করিলে শিষ্য তাহা লিখিয়া লইলেন। এই গ্রন্থের নাম 'পঞ্চপাদিকা'। 'পঞ্চপাদিকা'র উপর যে বিখ্যাত ও বিস্তৃত টীকা আছে, তাহার নাম পঞ্চপাদিকাবিবরণ। বিবরণের উপর আর একটী টীকা আছে তাহার নাম 'বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ'। উহা বেদান্তের এক বৃহৎ গ্রন্থ। সম্প্রতি অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহার মূল ও ইংরাজি অনুবাদ দুই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

শঙ্কর-বেদান্তের যে দুইটী পৃথক মতবাদ আছে তাহার একটী বিবরণ প্রস্থান। পঞ্চপাদিকার টীকার নামানুযায়ী উহার উক্ত নাম হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর যে বৃহৎ ভাষ্য রচনা করেছেন তাহার উপর সুরেশ্বরাচার্য্যের বার্তিক শ্লোকে রচিত। উক্ত বার্তিকে প্রায় ষোল সহস্রাধিক শ্লোক আছে। বিদ্যারণ্য উক্ত বার্তিক সংক্ষিপ্ত করিয়া 'বার্তিকসার' লিখিয়াছেন। শঙ্করের একটী শিষ্যের নাম ছিল হস্তামলক। হস্তামলক আজন্ম মৌন ছিলেন, এমনকি মাতাপিতার সহিতও কথা বলিতেন না। মাতাপিতা পুত্রকে মূক ও মূর্খ ভাবিয়া শঙ্করের পদে সমর্পণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আজন্ম জ্ঞানী। শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন করিয়াই মূক বালক মুখর হইলেন এবং একটী সংস্কৃত স্তোত্র রচনা ও আবৃত্তি করিয়া অদ্বৈত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। শঙ্কর তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

শঙ্কর যে যুগে আবির্ভূত হন তাহাতে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তখন লোকে যাগযজ্ঞই অধিক করিত। উক্ত প্রাধান্য নষ্ট করিয়া শঙ্কর বেদান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। এইজন্য তাহাকে কর্মকাণ্ডের আচার্য্যগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে হয়। তখন কর্মকাণ্ডের এক প্রধান পুরোহিত ছিলেন কুমারিল্ল ভট্ট। কুমারিল্লের সহিত বিচার করিবার জন্য শঙ্কর তাঁহার নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তুষানলে প্রবেশ করিতেছেন। কুমারিল্ল তৎশিষ্য মণ্ডনমিশ্রের নিকট শঙ্করকে যাইতে নির্দেশ দিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর যখন মণ্ডনমিশ্রের গৃহে গেলেন তখন মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধে উপবিষ্ট। সেই সময় একজন মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীকে স্বগৃহে উপস্থিত দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন এবং বিবাদ গণিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। মণ্ডনের

সহধর্মিণী বিদুষী উভয়ভারতীর উপর জয়প[illegible] নির্ণয়ের ভার পড়িল। উভয়ভারতী উভয়ের গলায় দুইটী পুষ্পমাল্য পরাইয়া বলিলেন, 'যাঁহার তপ্ত শ্বাসে মাল্য প্রথমে শুষ্ক হইবে তিনিই পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন। সুদীর্ঘ তর্কযুদ্ধের পর মণ্ডনের মালা পরিশুষ্ক হইল এবং তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম হইল সুরেশ্বরাচার্য্য। সুরেশ্বর মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার 'ভাষ্যবার্তিক,' 'ব্রহ্মসিদ্ধি' ও 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ আছে। ভাষ্যবার্তিকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'ব্রহ্মসিদ্ধি' এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ রাসবিহারী দাস 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জগদানন্দ 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। উহা অবশ্য অপ্রকাশিত। মণ্ডন পরাজিত হইলে উভয়ভারতী শঙ্করের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সহধর্মিণী স্বামীর অর্ধাঙ্গিণী, স্ত্রীকে পরাস্ত না করিলে স্বামীর পরাজয় সমাপ্ত হয় না। শঙ্কর কামশাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন। উভয়-ভারতী কামশাস্ত্রে বিচার করিতে চাহিলে শঙ্কর বিচার বন্ধ করিয়া কামশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অন্যত্র গমন করিলেন। কোন রাজার মৃত শরীরে প্রবেশপূর্বক তিনি স্বকার্য্যসাধনে রত হইলেন। শিষ্যগণ গুরুর দেহ কোন নির্জনস্থানে রক্ষা করিলেন। কামশাস্ত্র শিক্ষা পূর্ণ হইলে শঙ্কর স্বশরীরে প্রবেশপূর্বক উভয়ভারতীকে তর্কে পরাজিত করিলেন। উভয়ভারতী ছিলেন সারদাদেবীর অবতার। তিনি স্বর্গে গমন করিতে উদ্যত হইলে শঙ্কর তাঁহাকে মহীশূর প্রদেশে শৃঙ্গেরী মঠে জগদ্ধিতায় অবস্থান করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সারদা দেবী স্বীকৃতা হইলে শঙ্কর তাঁহাকে তথায় লইয়া যান এবং সারদামন্দির নির্মাণ করিয়া দেবীকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শঙ্কর দিগ্বিজয়ার্থ কাশ্মীরও গমন করিয়াছিলেন। কাশ্মীর তখন সংস্কৃতবিদ্যার প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল। সংস্কৃত ভাষা ছিল তখন উক্ত প্রদেশের কথিত ভাষা। প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতগণের গৃহে যে শুকপাখী থাকিত তাহারাও সংস্কৃতে কথা বলিত। সারদাপীঠ ছিল তখন কাশ্মীরের প্রধান বিদ্যাস্থান। তথায় একটী

আসন ছিল সেই আসনে সর্বজ্ঞ পণ্ডিতগণই বসিতে সমর্থ হইতেন। শঙ্কর উক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইতেই দৈববাণী হইল 'ইনি সর্বজ্ঞ'। সারদাপীঠের নামানুসারে কাশ্মীরের প্রাচীন অক্ষরমালার নাম সারদা, উহা দেবনাগরী হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক। শ্রীনগরে একটী পাহাড়ে শঙ্কর কিছুদিন অবস্থান করেন। সেইজন্য পাহাড়টীর নাম শঙ্করাচার্য্য পর্বত। শঙ্কর তথায় যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন তাহা অদ্যাপি বর্তমান। শঙ্কর কাশ্মীর হইতে আসামে কামরূপে যায়। কামরূপ (বর্তমান কামাখ্যা, গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী তীর্থস্থান) প্রসিদ্ধ তন্ত্রপীঠ। তান্ত্রিকদিগকে পরাজয় করিবার জন্য তিনি তথায় যান। তাঁহার সঙ্গে বিচারে সকলে হার মানিলেন বটে, কিন্তু অভিনব গুপ্ত নামক জনৈক তন্ত্রসাধক শঙ্করশরীরে ভগন্দর-রোগ অভিচার করিয়া দেন। সেই রোগ হইতে তিনি আর সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাই শেষে তাঁহার দেহান্তের কারণ হয়। শুনা যায়, শঙ্কর হিমালয়স্থিত স্বপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিমঠে দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া দেহের প্রতি তাঁহার আদৌ মমতা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ যেমন ছাগশিশুর প্রাণরক্ষার্থ স্বপ্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েছিলেন শঙ্কর তেমনি কোন কাপালিকের সিদ্ধিলাভার্থ স্বদেহ বলিরূপে উৎসর্গ করিবার জন্য রাজী হন। কাপালিক তাঁহাকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় সেবক পদ্মপাদ গুরুর অন্বেষণে সেইস্থানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। পদ্মপাদ নৃসিংহদেবকে আরাধনা করিলে তিনি আবির্ভূত হইয়া উক্ত খড়্গ দ্বারা কাপালিকের মস্তক ছেদন করেন।

লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতাররূপে পুজা করেন। তিনি বৌদ্ধ ভারতকে বৈদিক ভাবতে পরিণত করেন। নাস্তিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া তিনি সমগ্র ভারতে, আসমুদ্রহিমাচল হিন্দু স্থানে বৈদিক ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। তাঁহারই প্রভাবে বেদবিরোধী বিকৃত বৌদ্ধধর্ম বর্তমান হিন্দুধর্মের আকার ধারণ করে। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত ভারতে হিন্দুধর্মের প্রভাব অপ্রতিহত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সততবিবদমান, শতধাবিভক্ত হিন্দু সমাজে তিনি যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অপূর্ব। হিন্দুজাতির ঐক্যসংস্থাপন

এবং বেদগুপ্তি ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। তিনি [illegible] বেদান্ত প্রচার করিলেও সমগ্র হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। দেবদেবীর প্রতি যে সুন্দর স্তোত্রাদি তিনি রচনা করেছেন তাহা কবিত্বে ও ভক্তিতে অতুলনীয়। প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্যরচনা ব্যতীত তিনি 'উপদেশসাহস্রী', 'বিবেকচূড়ামণি' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেছেন। 'উপদেশসাহস্রী'র ইংরাজি অনুবাদ স্বামী জগদানন্দজী করিয়াছেন এবং মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলায় দুইটী শঙ্কর মঠ আছে—একটী হাওড়া জেলার রামরাজাতলায়, অপরটী বরিশাল সহরে। বরিশালের শঙ্কর মঠ স্থাপন করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী। প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' বাংলা ভাষায় বেদান্তের একটী অমূল্য গ্রন্থ। শঙ্করের জীবনী ও দর্শন বিষয়ে শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষের 'শঙ্কর ও রামানুজ' এবং শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-কৃত 'শঙ্কর চরিত' পঠিতব্য। শঙ্করবেদান্তের মূলসূত্র এই—ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই। আত্মারূপে জীব ব্রহ্মই। এক সূর্য্য বা চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিফলিত হইয়া বহু সূর্য্য বা চন্দ্ররূপে প্রতীয়মান হয়, ব্রহ্ম তেমনি বিভিন্ন শরীরে বহু রূপ ও বহু নাম ধারণ করিয়াছেন। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় বা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে পরমার্থিক সত্তা অবাধিত থাকে, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয়। পরমাত্মা বা ব্রহ্মই জীব ও জগতের প্রকৃত স্বরূপ বা পারমার্থিক সত্তা। দেশ, কাল ও নিমিত্ত মনের সৃষ্টি—উহাদের স্বতন্ত্র স্থিতি নাই।

শঙ্কররচিত 'মোহমুদ্গর' হইতে কয়েকটী বৈরাগ্যপূর্ণ শ্লোক পাঠককে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বেদান্তকেশরী শঙ্করাচার্য্য ছিলেন বৈরাগের, ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি। তাঁহার সকল উপদেশ ত্যাগের, বিবেকবৈরাগ্যের ভাবে উদ্দীপ্ত। 'মোহমুদ্গরে' তিনি বৈরাগ্যের উদ্দীপক উপদেশই এইভাবে দিয়াছেন—

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥১

অনুবাদ—রে মূর্খ, ধনার্জনের ইচ্ছা ত্যাগ কর ; দেহ, মনবুদ্ধিতে অনাসক্ত হও। স্বকর্ম দ্বারা যে সামান্য অর্থ উপার্জিত হয় তাহার দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ কর। অধিক অর্থের তৃষ্ণা করিলে দুঃখ পাইবে। ধনে প্রকৃত সুখ নাই।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাৎ অপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ ॥২

অনুবাদ—ধনই সকল অশান্তির মূল—ইহা সদা চিন্তা কর। ধনে সত্যই বিন্দুমাত্র সুখ নাই। পুত্র হইতেও ধনীগণের ভয় আছে। এই বিধি সর্বত্র প্রচলিত।

কা তব কান্তা কঃ তে পুত্র, সংসারোঽয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥৩

অনুবাদ—হে ভ্রাতঃ, কে তোমার স্ত্রী, কেই বা তোমার পুত্র। এই সংসার অতীব বিচিত্র। তুমি কাহার? কোথা হইতে তুমি আসিয়াছ এবং কোথায় তুমি যাইবে। তুমি ইহা সর্বদা চিন্তা কর।

মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং হরতি নিমেষাৎ কাল সর্বং।
মায়াময়ম্ ইদম্ অখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥৪

অনুবাদ—ধন, আত্মীয়স্বজন এবং যৌবনের গর্ব করিও না। কাল মুহূর্ত মধ্যে এই সকল হরণ করিতে পারে। মায়াময় এই জগৎপ্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদলাভের জন্য প্রস্তুত হও এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া পরম শান্তির অধিকারী হও।

নলিনীদলগতজলম্ অতিতরলং, তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয়চপলং।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তং ॥৫

অনুবাদ—পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন অস্থায়ী, মানব জীবনও তদ্রূপ নশ্বর। সুতরাং জীবনের প্রতি মমতা বিসর্জন কর। নিশ্চয় জানিও—মানব রোগ,

অহঙ্কার ও শোকে অভিভূত। শান্তির আস্বাদ তাহারা পায় নাই। এই জগতে, এই মনুষ্য জীবনে সুখের আকাঙ্ক্ষা করিও না।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্ত সর্বত্র ত্বং, বাঞ্ছসি আচরাৎ যদি বিষ্ণু ত্বং ॥৬

অনুবাদ—শত্রু, মিত্র, বন্ধু, যুদ্ধ ও সন্ধিতে রাগ বা দ্বেষ করিও না। এই সকলে সমদৃষ্টি করিবে। সর্বত্র সমচিত্ত হইতে পারিলে বিষ্ণুপদ লাভ করা সম্ভব। সমচিত্ততা ব্যতীত বিষ্ণুপদ লাভ অসম্ভব।

সুরবর-মন্দির তরুতলবাসঃ, শয্যাভূতলম্ অজিনং বাসঃ।
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥৭

অনুবাদ—দেবমন্দিরে বা তরুতলে বাস, ভূশয্যায় শয়ন, মৃগচর্ম পরিধান, সকল প্রকার গ্রহণ ও ভোগ পরিত্যাগ করিলে কাহার না সুখ লাভ হয়? অর্থাৎ বৈরাগ্যেই অভয়প্রাপ্তি ও সুখলাভ সম্ভব; অন্য উপায় নাই।

সতের

জোশী রিজাল*

খুকী, তোমার নাচের মত এত সুন্দর নাচ আমি দেখি নি। তোমার নাচ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। কি উপহার আমি তোমাকে দেব বলতো।

ছোট্ট খুকী তৎক্ষণাৎ বললে, আমার মাকে জেল হতে মুক্তি দিন।

ফিলিপাইনের বড লাটের আদেশে খুকীর জননী মুক্তি পেলেন। জননীর অপরাধ ছিল—তিনি জনৈক সৈনিককে তাঁর ধান খেত মাড়িয়ে যেতে বারণ করেছিলেন। সে তাহা অপমানকর বলে মনে করে। স্পেনের আমলে ফিলিপাইনে পাদ্রী ও সৈনিকের ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। তাই বিনা দোষেও যদি তারা গুরুদণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন, তাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইত, আইনও তাদের

* কিশোর বাংলা, কার্তিক, ১৩৩৯

সায় দিত। এই বালি ... র কেউ নন, ফিলিপাইনের স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত জোশী রিজাল।

ফিলিপাইন প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে একটি ক্ষুদ্র দেশ। কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টিই সেই দেশ। একবার আমেরিকার কাছ থেকে জাপান ইহা অধিকার করেছিল। আমেরিকার আগে ছিল ইহা স্পেনের অধীন। পরাধীনতার বন্ধন হতে ফিলিপাইনবাসীর মুক্তির সংগ্রাম বহুদিনের। স্পেনের আমল থেকে শুরু হয়ে আজও সংগ্রাম চলেছে, অমানিশার অবসান এখনও হয় নি, কবে হবে কে জানে। আজ আর এক নতুন প্রভু তার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। জোশী রিজালই প্রথম ফিলিপাইনের বুকে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দেন। তিনি বুঝেছিলেন—যদিও দেশশাসকেরা বোঝাতেন তাদের দেশ স্পেন, তবু স্পেন তাদের দেশ নয়, মাদ্রিদ নয়, তার রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, এমনকি ফিলিপাইনও তাদের নয়। যদি তাদেরই হত, তাহলে ফিলিপাইনে কেন এত দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও মহামারী। সে দেশ তো সুজলা, সুফলা, শ্যামলা—কত ধনে সে ধনী। কিন্তু এত ধন তার যায় কোথায়? এ ধন চলে যায় সমুদ্রপারে, সুদূর স্পেনে। বালক রিজাল বুঝেছিলেন, যে ক্ষমতা আমাদের সব শুষে নিচ্ছে, সেই ক্ষমতার নাশ ছাড়া দেশের মুক্তির অন্য পথ নেই।

কিন্তু ফিলিপাইনবাসী তখনও কিছু বোঝে নি। তারা যে কি ও কোথায় আছে, এত দারিদ্র্য ও দুঃখের কি যে কারণ, এতকাল তো কেউ বলে নি। দুঃখ যে বোঝে না, দুঃখের জ্বালাও তার নেই। কি করেই বা তারা জানবে। বালক জোশী রিজাল তাই এদের মুখে ভাষা দেবার, তাদের দুঃখটা কোথায় আর তা দূর করবারই বা কি উপায়, তা বুঝিয়ে বলার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

রাত্রির অবসানের বাণী বয়ে আনে পাখির গান। তেমনই জাতি মুক্তির গান শোনে কবির কণ্ঠে। কবি আগেই জানিয়ে দিয়ে যান—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
—ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই॥

এমনই অভয় বাণী শুনিয়ে মুক্তিপথের নি[illegible]য়ে কবি কোন নেপথ্য-লোকে সরে পড়েন—জাতি নতুন আশায়, নতুন আলোকে নব জীবনের পথে যাত্রা করে।

আঠার বছর বয়সে রিজাল ফিলিপাইনের যুবকগণকে জীবন বলি দেবার জন্য আহ্বান করে যে কবিতা লিখেছিলেন আজও তা অমর হয়ে আছে। এই প্রাণমাতানো কবিতা স্পেনের সাহিত্য-সভা হতে পর্য্যন্ত প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। তবে তার এই আগুন-ঝরা কলমের খবর কর্তৃপক্ষের পেতে তো দেরি হয় নি। তাই তখন রিজালের গা ঢাকা দিয়ে স্পেনে পালিয়ে আসা ছাড়া প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। ছদ্ম নামে এক গভীর রাতে তিনি পুলিশের চক্ষে ধুলো দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেলেন কেউ জানলে না।

অনেক দিন পর। স্পেনের মাদ্রিদ শহর হতে একখানা বই বেরিয়েছে। দেশবিদেশের সমালোচকেরা বলছেন যে, বিগত পঞ্চাশ বছরের মাঝে না কি এরূপ বই পাওয়া যায় নি। বই খানির নাম—আমায় ছুঁয়ো না! এটি ইবারা নামে এক বিদ্রোহীর জীবনের ইতিহাস। ইবারার মাতা রাজবন্দী। স্পেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিল পাদ্রীরা। এদের স্বরূপ এ বইতে এত সুন্দর করে প্রকাশিত হয়েছে যে বলবার নয়।

স্পেন সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বইটীর এত চাহিদা হল যে, দোকানদারের তা মেটানো কষ্টকর হয়ে উঠল। ফিলিপাইন সরকার আইনের সাহায্যে এই পুস্তক প্রচার বন্ধ করে দিলেন। তাতে কিন্তু বইটীর প্রচার আরও বেড়ে গেল। চারদিকে পড়ে গেল জাগরণের সাড়া। স্পেনীয় পাদ্রী ও রাজশাসনের উপর জনগণ সকল আস্থা হারালে। ইবারাই যে রিজাল, সে কথা তখন ফিলিপাইনের ছেলে বুড়ো কে না জানে।

বহু বছর পরে রিজাল দেশে ফিরে এলেন। বাড়িতে এসে মাকে ডাকলেন মা। তখন অন্ধ, আর কারাগারের অত্যাচারে অবিচারে তাঁর শরীর ও মন ভগ্ন, অবসন্ন, শিথিল।—কে, আমার জোশী, এসেছ, এসেছ। মা চোখে মুখে হাত বুলিয়ে ছেলেকে চিনলেন। আনন্দে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

মাদ্রিদে রিজাল চি. ৎ-বিদ্যা খুব ভাল করে পড়ে চোখের চিকিৎসায় অতি বড় ডাক্তার হয়ে উঠেছিলেন। মাদ্রিদের পড়া শেষ করে তিনি গিয়েছিলেন প্যারীসে। প্যারীসে এক প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে অনেক দিন থেকে সকল রকম চিকিৎসা শিখে রিজাল আজ দেশে ফিরে এসেছেন। মায়ের অন্ধ চোখকে আলো দিতে তার মোটেই বেগ পেতে হয় নি, আর বেশী দিন লাগেও নি।

এই অসাধারণ সফলতার কথা দেশ বিদেশে রটে গেল। সুদূর চীন জাপান হতে পর্যন্ত কত হাজার রোগী চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে রোজ আসত। এত লোকের যাওয়া আসা, এযে কেবল চিকিৎসার জন্যই, ফিলিপাইন সরকারের তাতে বিশ্বাস হল না। ফিলিপাইনের গবর্নর-জেনারেল তাঁকে তাঁর স্বদেশ ছেড়ে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ যে আদেশেরই নামান্তর।

রিজাল আমেরিকা হয়ে আবার মাদ্রিদে এলেন। মাদ্রিদে এসে তিনি আবার ফিলিপাইনের যুবজনকে ডেকে বললেন—আমার দেশের সেই যুবজনেরা কোথায়, যাদের বুকের রক্ত জন্মভূমির শত লাঞ্ছনা, শত অপমান অত্যাচারের কালিমা ধুইয়ে মুছে দেবে। স্বাধীনতার সাধকদল, তোমরা বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, সুখশয্যা, ও আরামের মোহ ছেড়ে। মা যে তোমাদের ডাকছেন।

যুবজনেরা মাতৃভূমির এই আহ্বানে সাড়া দিলে। ফলে রিজাল সরকার কর্তৃক জনহীন মরুভূমিতে নির্বাসিত হলেন।

সত্যিকার মানুষের স্পর্শে মরুভূমিতেও ফুল ফোটে, সাহারাও সুজলা সুফলা হয়ে ওঠে। সেই জনহীন মরভূমিতে রিজালের আগমনে সহস্রলোকের সমাগম হল। সরকার এই আশ্চর্য মানুষের কাণ্ড দেখে ভীত হয়ে তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত করলেন। ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। রিজালের বিরুদ্ধে সরকার রাজদ্রোহের অপরাধ আনলেন, মিথ্যাসাক্ষীর ব্যবস্থা হল। তাঁর বড় ভাই আফিযোনোকে ছোট ভাইএর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য

সরকার খুব অত্যাচার করলেন। কিন্তু সত্যিকারের ভাই কি ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, আর রিজালের মত ভাই কজন আছে।

বিচারে রিজালের ফাঁসির হুকুম হল। কয়েকঘণ্টার পরেই ফাঁসি হবে। তাঁর মা ও বোন তাঁর কাছে শেষ বিদায় নিতে এলেন। মার হাতে একটি ছোট কৌটো দিয়ে বললেন—মা, তোমরা আমার জন্য চোখের জল ফেলো না। আমি যে দেশমাতার জন্য প্রাণ দানের সৌভাগ্য পেয়েছি, এইতো আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ। আর তোমার দুঃখই বা কি, তোমার কত হাজার ছেলেই তো রইল।

মা কৌটোটি খুলে দেখলেন, এতে লেখা আছে তার জন্মভূমির প্রতি শেষ আহ্বান—জননী, আমার তরুণ বক্তের রঙে তোমার স্বাধীনতার আকাশ রাঙিয়ে দেবে, তোমার হবে নব জীবনের অভ্যুদয়, তোমার জয় হোক।

রিজাল তখন ৩৬ বৎসরের যুবক। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে বেগাম বায়াম ময়দানে হত্যার জন্য আনা হল। ডাক্তার তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন--আপনার নাড়ির গতি স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়। কি আশ্চর্য! এ তো বড় দেখা যায় না। কিন্তু রিজালের তখন কি আনন্দ। আট জন সৈনিক এক সংগে গুলি করলে। দেশ-সেবকের দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। ১৮৯৬, ৩০ ডিসেম্বর। রিজাল দেশমাতার মুক্তির জন্য আত্মবলি দিলেন।

সেই স্থান আজও ফিলিপাইনবাসীর পুণ্য তীর্থ। রিজালের স্মৃতি ফিলিপাইনের প্রতি নগরে, প্রতি শহরে আছে। তাঁর মৃত্যুতে যে আগুন জ্বলল, তাতে স্পেনীয় পাদ্রীগণ গির্জা ছেড়ে স্বদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। এই গির্জাগুলিই ছিল তখনকার সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আশ্রয়।

সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে রিজালের মৃত্যুর ১৮ মাস পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ ম্যানিলা উপসাগরে ঢুকে স্পেনীয় যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে সে দেশ অধিকার করলে।

আঠার

আনন্দ কুমারস্বামী *

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার ডক্টর আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী সত্তর বৎসর বয়সে আমেরিকার বোষ্টন শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ২২শে আগষ্ট শুক্রবার তাঁহার সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলম্বো, লণ্ডন, নিউইয়র্ক এবং আমেরিকার কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রে সভা হইয়াছিল। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর তিনি বোষ্টন সহরের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসের সহিত সংযুক্ত ছিলেন—প্রথমে প্রাচ্য শিল্পের গবেষকরূপে এবং পরে ভারতীয় ও সুদূর প্রাচ্য শিল্প বিভাগের ডিরেক্টররূপে। তাঁহার দেহাবসানের পরে মিউজিয়ামের অফিসারগণ ডাঃ কুমারস্বামীকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষিরূপে বর্ণনা করেন। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় ষাট খানি পুস্তক ও পুস্তিকার প্রণেতা।

১৮৭৭ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট আনন্দ কেন্টিশ কলম্বো সহরের কলুপিটিয়া নামক অংশে 'রাইনল্যাণ্ড' ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্যার মুথু কুমারস্বামী সিংহলের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছিলেন। স্যার মুথু ছিলেন এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম স্যার উপাধিধারী এবং লণ্ডনের প্রথম হিন্দু ব্যারিষ্টার। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'দাতবংশ' নামক পালি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ভগবান্ বুদ্ধের একটী দন্তের ইতিবৃত্ত এহ পুস্তকে বর্ণিত। ইংরেজীতে অনূদিত ইহাই প্রথম পালি পুস্তক। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে স্যার মুথু লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ডিসরেলী প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ মনীষিগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ডিসরেলী তাঁহার একখানি উপন্যাসে স্যার মুথুকে 'কুশীনর' নামে অভিহিত করেন। উপন্যাসখানি ১৯০৫ খ্রীঃ ডিসরেলীর মৃত্যুর

* উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৪

পর প্রকাশিত হয়। স্যার মুথুর পত্নী ছিলেন এলিজাবেথ ক্লে বীবাই নাম্নী ইংরেজ মহিলা। শ্রীমতী বীবাই শিক্ষিতা ও শিল্পতত্ত্বজ্ঞা রমণী ছিলেন। পুত্র আনন্দ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেই মাতা তাঁহাকে লইয়া সিংহল হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইহার কয়েক মাস পরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্যার মুথু কলম্বোতে দেহত্যাগ করেন। যে দিন তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার কথা ছিল সেইদিনেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী বীবাই ১৯৪২ খ্রীঃ বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন।

বালক আনন্দ প্রথমে ইংলণ্ডে গ্লাউসেষ্টার-সায়ারের অন্তঃপাতী ষ্টোনহাউস নামক স্থানের ওয়াইক্লিফ কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উদ্ভিদতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্বে বি-এ পাশ করিবার পর ভূতত্ত্বে ডি-এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি নানা প্রসিদ্ধ পত্রিকায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে সম্ভবতঃ ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তরুণ হইয়াও উক্ত দ্বীপের 'ডিরেক্টর অব মিনারোলজিকাল সার্ভে' নিযুক্ত হন। ডক্টর আনন্দ এই উচ্চ পদে তিন বৎসর কৃতিত্বের সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই তিন বৎসর উক্ত বিভাগে কাজ করিবার সময় তিনি যে বিভাগীয় সরকারী বিবৃতি লিখিতেন তাহাতে সিংহলের প্রাচীন পর্ব্বতাদির ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে যে তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা এখনও অনতিক্রান্ত। এই সময় সিংহলে সকল পুরাতন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শিল্পসম্বন্ধীয় যে মূল্যবান গবেষণা করেন তাহাই পরে ইংরেজি পুস্তকে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নাম 'মধ্যযুগীয় সিংহলীয় শিল্প' (Medeival Singalese Art)। ইহাই ডাঃ কুমারস্বামীর প্রথম বিখ্যাত গ্রন্থ। উক্ত বিষয়ে এখনও এই পুস্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুস্তক-প্রকাশের পরে ভগ্নী নিবেদিতা ইহার পরিচয় এইভাবে দিয়াছিলেন—"ইহা একটী উচ্চ শ্রেণীর শিল্পশাস্ত্র এবং প্রাচ্য মতে লিখিত। লেখক এমন সুযোগ্য পণ্ডিত যে, তিনি পাশ্চাত্য শিল্পেও সমান ভাবে বিশেষজ্ঞ।" ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব ডাঃ কুমারস্বামীর পুস্তকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। বহুর মধ্যে এক অদ্বিতীয় পরমার্থ সত্তার দর্শন, সর্ব্বপ্রকার জীবনের মধ্যে এক অবিভক্ত অখণ্ড জীবনের

অনুভূতিই কুমারস্বামীর মতে ভারতীয় শিল্পের মূল উদ্দেশ্য। ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, "এই চরম সত্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মের ন্যায়, বিজ্ঞানের ন্যায়, চারুকলার দৃষ্টিও দৃশ্য জগতের অতীত অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর উপর নিবদ্ধ। ভারতের শিল্প, কলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিদ্যা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত যে, ভাবরাজ্যই সত্য এবং জড়জগৎ, ভৌতিক বিশ্ব মায়িক।"

সিংহলে অবস্থান-কালে ডাঃ আনন্দ পাশ্চাত্য আচার, ব্যবহার ও প্রথার অনুকরণে দ্বীপবাসিগণের প্রমত্ত স্পৃহা দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হন এবং বিশিষ্ট সিংহলীগণের সাহায্যে 'সিংহল সংস্কার সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতির অধ্যক্ষরূপে তিনি সিংহলের শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনে যত্নপর ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি ডন লুইসা ক্লনষ্টাইন নাম্নী উচ্চশিক্ষিতা এবং শিল্পশাস্ত্র ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শিনী আর্জেন্টাইনদেশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ আনন্দ রাজকুমারতুল্য সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ও কিঞ্চিৎ কৃশ, গৌরবর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, সামান্য শ্মশ্রু এবং হাস্যময় মুখ ছিল। লোকে সহজে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। যিনি তাঁহার সহিত মিশিতেন তিনিই তাঁহার মিষ্ট বাক্য, ভদ্র ব্যবহার এবং অমায়িক ভাবে মুগ্ধ হইতেন। ডাঃ আনন্দের একটী পুত্র আছে। সিংহলের সরকারী কর্ম হইতে ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সমগ্র ভারত ও ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সুদীর্ঘ ভ্রমণ-সমাপনান্তে তিনি ইংলণ্ডে কিছুকাল বাস করেন। ঐ সময় তিনি ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশ্বের সুধীসমাজে সুপরিচিত হন। তাঁহার উদ্যোগে লণ্ডনে 'রয়্যাল ইণ্ডিয়া সোসাইটী' স্থাপিত হয়। ১৯০৭ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন মিউজিয়ামে যোগদানের পর তাঁহার গবেষণা ও রচনা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৭ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর তিনি পাশ্চাত্যে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাবধারা প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার পঞ্চ-ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় তৎরচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলীর বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন।

উক্ত তালিকা হইতে জানা যায়, তিনি তখন পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত নিবন্ধের রচয়িতা। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি আরও অনেক নিবন্ধ রচনা করেন। ভারত, সিংহল, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মেনী, ফিনল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইত।

ভারতীয় শিল্পের ভাবধারা-প্রচারে তাঁহার লেখনী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। প্রসিদ্ধ শিল্পী উইলিয়াম রথেনষ্টাইন সত্যই বলিয়াছেন যে, ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী এবং হ্যাভেল পাশ্চাত্যে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল তৎসমুদয় অনেক পরিমাণে দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বে একমাত্র গ্রীসদেশীয় শিল্পই পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃত শিল্পরূপে পরিগণিত হইত। ভারতীয় বা প্রাচ্য শিল্পের যেখানে যেখানে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হইত কেবল সেইগুলিই পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ভাবস্রোত ডাঃ কুমারস্বামী আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৯০৭ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস করিয়া এই সুমগান ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাজপুতানা এবং কাংড়া উপত্যকার চিত্রাবলীর বিশেষত্ব ও মহিমা তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন এবং ভারতীয় শিল্পের অলৌকিকত্ব এবং অনুপমত্ব সভ্য জগতের সম্মুখে ধরেন। মোগল শিল্পিগণ অপেক্ষা হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পিগণ কত অধিক প্রতিভাশালী এবং পরমার্থদৃষ্টিসম্পন্ন তাহা হ্যাভেলের ন্যায় কুমারস্বামী পাশ্চাত্য জগতে সমগ্র জীবন ধরিয়া প্রচার করেন। উইলিয়াম রথেনষ্টাইন বলেন, ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভারতীয় শিল্পের যথার্থ আবিষ্কারক এবং ভারতীয় সঙ্গীত ও সাহিত্যের দরদী প্রচারক।

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী বহুভাষাবিৎ ছিলেন। সর্ব্বদেশের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বলেন, "এমন দিন যায় না, যে দিন আমি সর্বকালের দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী এবং সর্ব্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠ না করি। তৎ সমুদয় লাটিন, গ্রীক ও সংস্কৃত এই তিন মৃত ভাষায় এবং বহু আধুনিক ভাষায়

নিত্য পাঠ করি।" * এস. চন্দ্রশেখর নামক জনৈক ভারতীয় কুমারস্বামীর সহিত বোষ্টনে ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে সাক্ষাৎ করেন। † কুমারস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিয়াছিলেন, 'তিনি আগামী বৎসর মিউজিয়াম হইতে অবসর-গ্রহণান্তে ভারতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, হিমালয়ের পাদদেশে বা তিব্বতের কোন নির্জন স্থানে বাকী জীবন ধ্যানে ও অধ্যয়নে কাটাইবেন। সমগ্র জীবন ভারতীয় ভাবধারায় অবগাহন করিতে করিতে তিনি ত্যাগাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বোষ্টনের নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়া এখন হিমালয়ের নির্জন কান্তারে কিরূপে থাকিবেন?' ডাঃ আনন্দ উত্তর দিলেন, "শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হিমালয়ের শান্তির তুলনায় তুচ্ছ। আমার গৃহের মধ্যে লক্ষ্য কর। আমি একটী 'রেডিও' রাখি নাই, কারণ এই সকল আমার ভাল লাগে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আমি যতই বাস করিয়াছি ততই আমি ভারতীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছি। সুতরাং ভারতে বাস করিলে আমি সুখী হইব, পরম শান্তি পাইব।" শ্রীমতী ডন লুইসা কুমারস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিয়াছিলেন, 'ডক্টর আনন্দ প্রায় দ্বাদশটী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সপ্তাহের সাত দিন, এমন কি রবিবার পর্য্যন্ত, তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সময় সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন অধ্যাপনা আলোচনা ও রচনায় কাটিত।"

আনন্দ কুমারস্বামীর পরিচালনায় বোষ্টন মিউজিয়মে ভারতীয় প্রাচ্য ও পারস্যদেশীয় শিল্প-সংগ্রহ আশাতীত ভাবে বাড়িয়াছে। সেই জন্য বোষ্টন

---

* The Times of Ceylon নামক ইংরেজি দৈনিকে ২রা শে আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে লিখিত ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী সম্বন্ধে ডক্টর জি. পি. মালালশেখরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† উক্ত সাক্ষাতের বিবরণ ও কথোপকথন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত Aryan Path নামক ইংরেজি মাসিকের ১৯৪৭ আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত।

মিউজিয়মটি আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পভাণ্ডার। শেষ বয়সে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার 'ভারতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ান শিল্পের ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ। ভগিনী নিবেদিতার সহযোগে তিনি 'বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল। তাঁহার 'শিবের নৃত্য' (Dance of Shiva) নামক বইখানিও সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি নানা দেশের শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের ফেলো, লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ভারতের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরামর্শদাতা, গ্রেগব্রিন্দেন দার এশিয়াটিক কুনস্তের সভ্য, বার্লিণ কইস্ন্ ইনিস্টিটিউটের সভ্য এবং পুণা ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের সভ্য। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে যে বিরাট প্রদর্শনী হয় উহার শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ কুমারস্বামী। তিনি যে শুধু গবেষক ও রচয়িতা ছিলেন তাহা নহে, তিনি সুবক্তাও ছিলেন। সিংহল, ভারত, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতীয় শিল্প ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিতেন। সিংহলে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি ১৯০৫—৬ সালে যে আন্দোলন করিয়াছিলেন এতদিনে তাহার সুফল ফলিয়াছে।

ডাঃ কুমারস্বামী অতি সদাশয় ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। উপর্য্যুক্ত চন্দ্রশেখর বোষ্টনে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য যখন ফোন্ করেন তখন কুমারস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যায় মোটরে একত্র বেড়াইতে যাইব এবং আলাপাদি করিব, যদি আপনি আমার জীবনী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করেন।' কুমারস্বামী এত নম্র ও নিরভিমান ছিলেন যে, তিনি আত্মগোপন ভালবাসিতেন এবং আত্মপ্রকাশ ঘৃণা করিতেন। তিনি সিংহলী হইলেও ভারতকে জন্মভূমির মত শ্রদ্ধা করিতেন। ভারতের সর্ব্বপ্রকার সমস্যা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত। চন্দ্রশেখরকে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় মুসলমান-সমস্যার প্রতি বাস্তব দৃষ্টিতে চাহিলে আমার মনে হয়, তাহাদের চাহিদা ন্যায্য নহে। ঐগুলি প্রধানতঃ

ইংরেজের সৃষ্টি এবং মুসলমানগণ দূরদৃষ্টির অভাবে সেগুলি স্বীকার করিয়াছে। ভারতবিভাগ বোধ করা এখন আর সম্ভব নহে, ইহা ভারতের পক্ষে পশ্চাদ্‌অপসরণ মাত্র, অগ্রগতি নহে। যদি মিঃ জিন্না প্রকৃত মুসলমান হইতেন তাহা হইলে তিনি দারাশিকোর সময় স্মরণ করিয়া দেখিতেন, তখন কিরূপে হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্র শান্তিতে বাস করিত। মুসলমান সংস্কৃতি অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব মিঃ জিন্নার উপর অধিক বলিয়া তিনি ভারত-বিভাগের পক্ষপাতী। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দিকে লক্ষ্য কর। তিনি প্রকৃত মুসলমান এবং মুসলমান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই তিনি হিন্দুবিদ্বেষী নহেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে অনিষ্টকর অনৈক্য উপস্থিত, তাহার মূলে আছে রাজনীতি, ধর্ম্ম নহে।" ডাঃ কুমারস্বামী আশা করিতেন, দ্বিখণ্ডিত ভারত অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় একীভূত হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, পারস্যের মুসলমানগণের ন্যায় ভারতের মুসলমানগণ যতই শিক্ষিত হইবে ততই তাহাদের হিন্দুবিদ্বেষ কমিবে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শনবিভাগ উঠিয়া যাওয়ায় কুমারস্বামী দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া যে সকল ছাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন করিতে আসে তাহাদের মধ্যে শতকরা ছয় জনও দর্শন বা সাহিত্য অধ্যয়ন করে না। আমি অনেক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহই ভারতীয় সংস্কৃতির এক কণাও এদেশে আনে নাই। তাহারা স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। এদেশে আসিয়া তাহাদের চোখ খোলে। কিন্তু তখন দেশীয় সংস্কৃতি পড়িবার বা বুঝিবার অবকাশ তাহাদের থাকে না। এই সকল ছাত্র কিরূপে ভারতকে বুঝিবে? কিরূপেই বা তাহারা স্বদেশের সেবা করিবে? এদেশে শিক্ষালাভ ও প্রবাসের ফলে তাহাদের মনে বিদেশীয় প্রভাব গভীর রেখাপাত করে। আরামপ্রিয় ও ব্যয়সাধ্য জীবনের পক্ষপাতী আমি নই। এইরূপ জীবনে সন্তোষের সম্ভাবনা থাকে না। আমার মতে বাথ্‌টব, রেডিও এবং রেফ্রিজারেটার অপেক্ষা জীবন অনেক বড়। জীবনে ভোগস্পৃহা যত বাড়ে, মানসিক শান্তি তত কমে।

যদিও আমেরিকানগণ যে কোন দেশবাসী অপেক্ষা ধনী, তাহাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন জীবনে একখানিও পুস্তক ক্রয় করে নাই! নিরক্ষরতাবর্জনই শিক্ষা নহে, শিক্ষাও সংস্কৃতি নহে।" ডাঃ কুমারস্বামী পাশ্চাত্য প্রবাসে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন, যন্ত্র-প্রভাবের নিমিত্ত আধুনিক জীবনে কৃত্রিমতা বাড়িযাছে ও স্বাভাবিকতা কমিয়াছে।

উনিশ

আলডাশ্ হাক্সলী *

উদীয়মান ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে আলডাশ্ হাক্সলীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বয়স এখন কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর মাত্র, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি পঁচিশ-ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শিক্ষিত জগতে সম্মানিত ও স্মরণীয় হইয়াছেন। সকল দেশের আধুনিক সুলেখকগণ হাক্সলীর বাক্যোদ্ধার-পূর্বক স্ব স্ব রচনাবলীকে উজ্জ্বল করেন। বর্তমান মহাসমরের কিছু পূর্ব হইতেই তিনি আমেরিকার কালিফোর্নিয়া শহরে বাস করিতেছেন। কয়েকখানি নাটক, নভেলও তিনি লিখিয়াছেন; তবে সারগর্ভ গ্রন্থ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রথম জীবনে যখন যৌবনের জোয়ার আসিয়াছিল, তখন তিনি সংশয়বাদী, জড়বাদী ছিলেন। পরে তিনি হিন্দু দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া আস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন। মানব-মনে বহু বিরুদ্ধ মত কিরূপ ভাবে পাশাপাশি বাস করে, সেই তত্ত্বটি তাঁহার বিস্তৃত রচনাবলীতে পরিস্ফুট।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্সলীর তিনি পৌত্র। লিওনার্ড হাক্সলীর তৃতীয় পুত্ররূপে আলডাশ্ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের

---

* দেশ, ১৩ই চৈত্র, ১৩৫১

২৬শে জুলাই ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম জুলিয়া আর্ণল্ড। জুলিয়া বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক ম্যাথিউ আর্ণল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষালয় রাগবী হাই স্কুলের জনপ্রিয় হেডমাষ্টার ও ধর্মযাজক টমাস আর্ণল্ডের পৌত্রী ছিলেন জুলিয়া। আলডাশ্ হাক্সলীর পিতা লিওনার্ড হাক্সলী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লিওনার্ড স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট এণ্ড্রুজ ইউনিভার্সিটিতে গ্রীক ভাষার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে উক্ত অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। লিওনার্ড বহু বৎসর একটি পত্রিকার সম্পাদক ও একটি পুস্তক-প্রকাশকের পরামর্শদাতা ছিলেন। আলডাশ্ হাক্সলীর পিতামহ টমাস হেনরী হাক্সলী বিগত শতাব্দীতে ডারউইনের মতবাদ প্রচার করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আলডাশ্ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা উচ্চ চিন্তা ও সাহিত্য-চর্চায় আলোকিত ছিল। পূর্ব-পুরুষগণের সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকতর বিকাশ আলডাশের জীবনে দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহার বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে তাহা আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুলিয়ান প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরূপে জগদ্বিখ্যাত।

আলডাশ্ অক্সফোর্ডের টাউন স্কুলে ও বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুলিয়ানের মত তাঁহার বিজ্ঞান-চর্চায় অতিশয় আগ্রহ ছিল, কিন্তু নেত্ররোগে প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর অধ্যয়নে অসমর্থ হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান-চর্চা ত্যাগ করিয়া সাহিত্য অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। অক্সফোর্ডের আবহাওয়া তিনি খুব পছন্দ করিতেন, কারণ তথায় স্বাধীনভাবে পুস্তকপাঠের বিশেষ সুযোগ ছিল। তিনি অক্সফোর্ডে সপ্তাহে দুইটির অধিক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন না। তিনি কর্মবিমুখ ও অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রজীবনে নানা বিষয়ের গ্রন্থ পাঠে নিবিষ্ট থাকিতেন। রাস্কিন ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লেখা তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্সের প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষভাবে পতিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আলডাশ্ মেরিয়া নিশ নাম্নী জনৈকা বেলজিয়াম-দেশীয় নারীর

পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্রসন্তান আছে। ইংলণ্ডের বাহিরেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ফ্রান্স, ইতালি, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে অনেক বৎসর কাটাইয়াছেন। ভারত ও ব্রহ্মদেশের ভ্রমণ-কাহিনী তিনি তাঁহার 'জেষ্টিং পাইলেট' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বই লিখিবার সময় তিনি ভারতীয় ভাবধারার সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাই তাহাতে লিখিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর ও ধর্ম লইয়া আছে বলিয়াই পরকাল-সর্বস্ব ভারতের এই দুরবস্থা। আমার যদি কয়েক লক্ষ পাউণ্ড থাকিত, আমি ভারতে একটি নাস্তিক সমিতি স্থাপন করিতাম। উক্ত সমিতি ভারতবাসীর ঐহিক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিত।' কিন্তু কয়েক বৎসরের পরেই তাঁহার সেই মত পরিবর্তিত হয়। তখন তিনি লিখিয়াছেন 'পাশ্চাত্যের উন্মত্তপ্রায় কর্মমূলক উত্তেজনার পরমৌষধ গীতোক্ত অনাসক্তি যোগ। এই যোগ অভ্যাস করিলে পাশ্চাত্য ধ্বংসমুখী কর্মোন্মাদনা হইতে রক্ষা পাইবে।'

পিতার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এবং মাতার সাহিত্য-প্রতিভা মিলিত হইয়া আলডাশের মনে এক অভিনব চিন্তাস্রোত সৃষ্টি করিয়াছে। চিন্তার উদারতা, বহুমুখিতা ও ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি তাঁহার রচনার অলংকার। আকৃতিতে তিনি পুরোপুরি ইংরেজ। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঘন চুল, আজানুলম্বিত বাহু, সুমিষ্ট স্বর এবং অমায়িক ব্যবহার দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথা বলিবার সময় তিনি হাঁটুদ্বয় হাতে বেষ্টন করিয়া বসেন। তাঁহার ভদ্র হাসির মধ্যে হর্ষ অপেক্ষা বিষাদই অধিক প্রকটিত হয়। তিনি অসাধারণ কথা-শিল্পী এবং সাহিত্য-সৃষ্টিই তাঁহার প্রধান সাধনা। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার গদ্য রচনাই সমধিক। যে ধর্মভাব তাঁহার মনে সুপ্ত ছিল, তাহা সম্প্রতি জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের যাহা দোষ, তাহাই বয়োবৃদ্ধির ও অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে গুণে পরিণত হয়। গত পাঁচ ছয় বৎসর আমেরিকার প্রবাসে আলডাশ্ তথায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত বেদান্ত আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তিনি এখন বেদান্তে বিশ্বাসী এবং

ধর্মের গূঢ় রহস্যের বিষয় তিনি প্রায়ই লেখেন। 'এণ্ডস এণ্ড মিনস' (Ends and Means) নামক গ্রন্থই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে হয়। উক্ত পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তিনি 'আদর্শ মানব কে' এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে প্রচলিত আদর্শ-মানবের সংজ্ঞাসমূহ সমালোচনাপূর্বক তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গীতোক্ত অনাসক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই আদর্শ মানব। তাঁহার মতে জীবনে অনাসক্তির ভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানুষ জীবনের উৎকর্ষলাভে অক্ষম হয়। যিনি অনাসক্ত, তাঁহার জীবন ততই উচ্চ ও মহৎ।

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আলডাশ স্বীয় মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'আমি বহির্মুখী, অধ্যয়ননিষ্ঠ মানুষ। জড়বাদিগণ অন্তর্মুখী জীবনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহার মর্ম আমি বুঝি।' ১৯৪৪ সালে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন সমধিক সমৃদ্ধ হইলে তিনি লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বর, গড, আল্লা বা ব্রহ্ম নামক পরম তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছেন। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে জগদ্ব্যাপ্ত। তাঁহাকে জানা ও ভালবাসা সম্ভব। তাঁহার সহিত ঐক্যানুভূতিও লাভ করা যায়। এই অনুভূতিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য।' উক্ত বাক্য হইতে বোঝা যায়, আলডাশ্ কত গভীরভাবে হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। রামকৃষ্ণ মিশনের যে সকল সন্ন্যাসী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলের সঙ্গে আলডাশ্ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। সমগ্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র যে ইংরেজি অনুবাদ গত বৎসর নিউইয়র্কস্থিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলডাশ্ একটি সুন্দর মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলেন, 'পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সুগভীর ও সুস্পষ্ট সরল কথোপকথন পাঠ করিলে নম্রতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতার গভীর শিক্ষালাভ হয়। এইরূপ কথোপকথন জগতের ধর্ম-সাহিত্যে অপূর্ব ও বিরল।'

আলডাশের মনে বহুমুখী ও বিরুদ্ধ ভাবরাশির অসাধারণ সমাবেশ। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানবমনে এইরূপ সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'ডু হোয়াট ইউ উইল' (Do what you will) নামক প্রবন্ধপূর্ণ গ্রন্থে

তিনি জীবন-পূজার কথা লিখিয়াছেন। সংযমরূপ উপচার দ্বারা জীবন-পূজার তিনি আন্তরিক পক্ষপাতী। সংযম জীবনের ভিত্তি হইলে মানব নির্ভীকভাবে জীবনপথে চলিতে ও অগ্রসর হইতে পারে। আলডাশের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও চিন্তাশীলতা অপরিমেয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'ক্রোম ইয়েলো' (Chrome Yellow) গ্রন্থে তাঁহার নৈতিক উৎসাহের প্রতি অনাস্থার পশ্চাতে ভাবগাম্ভীর্য লুক্কায়িত। জীবনের সাবলীল গতি ও স্বাধীন বিকাশের উদার ধর্ম তিনি উক্ত উপন্যাসে প্রচার করিয়াছেন। রিমবাউ, লাফোর্গ, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতি ফরাসী মনীষিগণের চিন্তার প্রভাব তাঁহার 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (Brave New World) ইত্যাদি গ্রন্থে সুস্পষ্ট। তাঁহার বহু রচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি লাজুক, লোক-ব্যবহারে অপটু এবং সমাজের কর্মচাঞ্চল্য হইতে দূরে নিভৃতে থাকিয়া চিন্তাজগতে মগ্ন হইতে তিনি সদা প্রচেষ্ট। দৃষ্টি-ক্ষীণতার জন্য তিনি চশমা ব্যবহার করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার এই অসুখ হইতে সম্পূর্ণ তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। আমেরিকান চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ বেটস প্রাকৃতিক উপায়ে দৃষ্টিক্ষীণতা দূর করিবার ও চশমা পরিত্যাগের যে সহজ সরল পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত উপায়েই আলডাশ্ পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। তিনি "Art of Seeing" নামক বইতে উক্ত পদ্ধতির চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন।

আলডাশের আধুনিকতম উপন্যাসের নাম 'টাইম মাষ্ট হ্যাভ এ ষ্টপ' (Time Must Have a Stop)। পুস্তকের এই নামটি তিনি সেক্সপীয়ারের একটি বাক্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, 'অনন্তের আলোচনা ব্যতীত চিন্তা শৃঙ্খলমুক্ত ও সমৃদ্ধ হয় না। অসীমের দিব্য স্পর্শেই চিন্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়। দৃষ্টি অসীমমুখী হইলে কাল আর আমাদের জীবনকে উদ্দেশ্যহীন ও ব্যর্থ করিতে পারিবে না। অসীমের চিন্তা মনে যতই স্থান পাইবে, ততই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হইবে ও মন জ্ঞানোজ্জ্বল হইবে। পরমতত্ত্ব কালাতীত সত্তাবিশেষ। এই পরমার্থ সত্তার সন্ধানে মন যতই আকুল হয়, ততই কালবদ্ধ জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ও সকল বন্ধন শিথিল হয়।' ঔপন্যাসিক আলডাশ্ বর্তমানে একজন দার্শনিক হইয়াছেন। দার্শনিকগণের মতই তিনি

দর্শনের জটিল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্যে ধর্ম ও দর্শন বিচ্ছিন্ন; কিন্তু ভারতে উহারা একীভূত। স্ব-স্বরূপানুসন্ধানই প্রকৃত ভক্তি।' শঙ্করাচার্যের বেদান্তমতে তিনি প্রগাঢ় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'এই তত্ত্ব আমরা যতদিন বিস্মৃত থাকিব, ততদিন আমাদের জীবন বিপন্ন ও অন্ধকারময় থাকিবে।'

গত বৎসর আলডাশ্ হাক্সলীর একখানি সুচিন্তিত ও সুলিখিত বই প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির নাম 'গ্রে এমিনেন্স' (Grey Eminence)। ইহাতে ফাদার জোসেফ নামক এক ফরাসী দেশীয় পাদ্রীর জীবনচরিত আলোচিত হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজার প্রধান মন্ত্রী রিচেলুর প্রধান সহকারী ও পরামর্শদাতা ছিলেন জোসেফ। জোসেফ সুপণ্ডিত, এবং একনিষ্ঠ সাধক হইয়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন স্বধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে। রাজনীতি ও ধর্ম জোসেফের মনে যে প্রবল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছিল, আলডাশের নিপুণ লেখনীতে তাহাই সুচিত্রিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াও পাদ্রী জোসেফ অন্তিম সময়ে অনুভব করিয়াছিলেন ব্যর্থতার তীব্র যন্ত্রণা। ব্যর্থতার আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। আলডাশ্ জোসেফেরজীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'ধর্মজীবনে রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম অন্তরায়স্বরূপ। কর্ম-ব্যস্ততায় ঈশ্বর-বিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ভাগবত কর্মেও এইরূপ অপকারক ব্যস্ততা আসে। সুতরাং ঈশ্বরসাধনায় কর্মব্যস্ততা পরিহার করিতে হইবে। মানব-মন যতটুকু অন্তর্মুখীন হয়, ততটুকু সৎকর্ম সে করিতে পারে। বহির্মুখ জীবনে সৎকর্ম করিতে যাইলেও অসৎ কর্মই হয়। যে কর্ম ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, তাহা অকর্ম। প্রবর্তকদিগের পক্ষে কর্ম নিরাপদ নহে। উপাসনাময় মন দ্বারাই সৎকর্ম সম্ভব।'

আলডাশ্ বলেন, 'যিনি এক সময় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি সব সময় ভদ্রলোক থাকিবেন।' মানুষ কিরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিশূন্য হয়, তাহা উপহাস করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'ইতিহাসকে আমরা এইভাবে দেখি, যেন গতকল্য উহার আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষ ইতিহাসের এক-একটি ক্ষুদ্র টুকরা। এই টুকরাগুলি অসামান্য এবং ইহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। অধিকাংশ টুকরাই সাধারণ শ্রেণীর।

অসাধারণ টুকরা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু ইতিহাসে অসম্ভব কিছুই নহে।' 'আমাদের হৃদয়ে যে দেবভাব সুপ্ত আছে, তাহা জাগ্রত হইতে যে শক্তি বাধা প্রদান করে এবং যাহা স্বার্থপরতা বা ক্ষুদ্রভাব পুষ্ট করে, তাহাই শয়তান। শয়তান প্রত্যেকের মনে লুক্কায়িত আছে।' আলডাশ্ খৃষ্টান হইয়াও এইভাবে বেদান্তের আলোকে খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের উদার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডার হেণ্ডারসন "Aldous Huxley : An Interpretation" নামক যে ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে আলডাশের গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

———

বিশ

শাহ আবদুল লতিফ*

সম্প্রতি করাচীতে সিন্ধু দেশের শ্রেষ্ঠ কবি শাহ আবদুল লতিফের জন্মবার্ষিকী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান সিন্ধীগণ সমানভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। অবশ্য সরকারী শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগেই প্রধানতঃ অনুষ্ঠানের সব আয়োজন হয়েছিল। এই প্রবন্ধে লতিফের জীবনী ও কবিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'লো।[১]

মরুভূমিময় সিন্ধুপ্রদেশে অনেক সুফী কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। ইনায়েত, শচল, বোহাল, দলপৎ, বেদিল, বেকাস, স্বামি, শাহ আবদুল লতিফ প্রভৃতি সুফী কবিদের গান কৃষক, গাড়োয়ান, উষ্ট্রচালক ও রাখাল বালক, ধনী ও পণ্ডিত

---

*বঙ্গলক্ষ্মী, আষাঢ়, ১৩৪৮

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য—Shah Abdul Latif : His Poetry, Life and Teaching by Dr. H T Sorbey D. Litt. Oxford University Press.

সকলের মুখে শোনা যায়। হিন্দুধর্ম ও ইস্‌লামের ঐক্য এবং রাম ও রহিমের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল সুফীদের প্রধান উদ্দেশ্য। সুফী কবিদের সমাধিস্থানে যে মেলা হয় তাতে হিন্দুগণ ও মুসলমানগণ সমবেত হয়ে উক্ত কবিদের গান সুরযোগে গান করেন। সুফীদের প্রভাবে সিন্ধু প্রদেশে হিন্দুগণ মুসলমানের ধর্মস্থানে এবং মুসলমানগণ হিন্দুর ধর্ম্মস্থানে শ্রদ্ধাবনত হয়। সুফীবাদের ফলে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সাধুর মধ্যে প্রীতির প্রাচুর্য্যও বর্ত্তমান। গিরোটে মুসলমান ফকীর জামালী সুলতান ও হিন্দু সাধু দয়াল ভবনের সমাধিঘর একস্থানে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। জামালী ও দয়াল অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। জামালী যখন গিরোটে প্রথম আসেন তখন দয়াল তাঁকে একটি দুগ্ধ-পূর্ণ পাত্র প্রেরণ করেন। ইহার অর্থ এই যে, গিরোটে ইতিমধ্যে বহু সাধু আস্থানা করেছেন, সুতরাং তাঁর অন্যত্র যাওয়া উচিত।

জামালী সুলতান দয়াল ভবনের অনুমতি লাভের জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি উক্ত দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে কয়েকটি গোলাপ ফুলের পাপড়ি ও পাতা ছাড়িয়া দিয়া তাহা দয়াল ভবনের নিকট ফেরৎ পাঠাইলেন। ইহার অর্থ এই যে, দুগ্ধ পূর্ণপাত্রে যেমন গোলাপ ফুলের স্থান হয়, সেইরূপ সাধুসঙ্কুল স্থানেও অনায়াসে তাহার স্থান হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের সাধুদের মধ্যে এইরূপ প্রীতির সম্বন্ধ পূর্ব্বে যথেষ্ট ছিল এবং বর্ত্তমানেও কিছু আছে। শাহ আবদুল লতিফের পূর্বে মধ্য ভারতে মহম্মদ শাহাদুল্লা প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী ছিল। শাহাদুল্লা উভয় ধর্ম্মের শাস্ত্রসমূহ হইতে সমন্বয়সূচক অংশ উদ্ধার করিয়া একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দুর দেবতা বিষ্ণু ছিলেন তাঁহার ইষ্ট। গঙ্গাস্তব রচয়িতা দরাফ খাঁ ছিলেন গঙ্গাভক্ত।

সিন্ধুদেশ ১৮৫৭ খৃঃ স্যার চার্লস নেপিয়ার কর্ত্তৃক বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নূতন প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রদেশ সুফীবাদের প্রধান তীর্থ। অষ্টম শতক হইতে এই প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামের আদান প্রদান চলিতেছে। প্রায় বার শতাব্দীর ঘনিষ্ঠতার ফলে যে অমৃত ফল প্রসব করেছে তার প্রমাণ শাহ আবদুল লতিফ। লতিফ

এই প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার হলহাবেলী নামক অধুনালুপ্ত একটি গ্রামে ১৬৮৮ খৃঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে ১৭৫২ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। হলহাবেলী হইতে ২৮ মাইল দূরে ভিট্ নামক স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের বৃহৎ স্মৃতিমন্দিরে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভক্তোচিত গান বহুলোক কর্তৃক গীত হয়। তাঁহাকে জনসাধারণে 'ভিটাই ঘট' বলিয়া থাকেন। ভিটাই ঘট শব্দের অর্থ 'ভিটের সাধু'। জন্মলাভের কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা পুত্রকে ভিট গ্রামের চারি মাইল দূরে কোটরী গ্রামে লইয়া যান। এই স্থানে পিতা ও পুত্র বহু কাল বাস করেন।

বাল্যকালে শাহ আবদুল লতিফ উপযুক্ত শিক্ষা লাভে সমর্থ হন নাই। তবে তাঁহার প্রপিতামহ শাহ আবদুল করিমের সিন্ধী কবিতা এবং পারস্যের মৌলানা রুমের বিখ্যাত 'মস্‌নবী'র ফার্সী কবিতানিচয় অত্যন্ত যত্নের সহিত তিনি পাঠ ও মুখস্থ করিয়াছিলেন।

লতিফের প্রপিতামহ শাহ আবদুল করিম সিন্ধুদেশের একজন বিখ্যাত সুফী সাধু ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিতে এখনও একটী বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কোট্‌রীতে অবস্থানকালে লতিফ প্রায় ২০।২৫ বৎসর বয়সে মির্জা মোগল বেগের একমাত্র সুন্দরী কন্যার প্রেমে পতিত হন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। লতিফের পিতা শাহ হবিব ছিলেন মোগল বেগের ধর্মগুরু। সেই জন্য লতিফ মোগল বেগের গৃহে যাইয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার কন্যার সহিত মেলামেশা করিতেন। কিন্তু মোগল বেগের আপত্তি থাকায় লতিফ মোগল বেগের জীবিতাবস্থায় তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মোগল বেগের মৃত্যুর পর বিনা বাধায় অভীপ্সিত বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বালক লতিফের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ঘটনা শোনা যায়। কথিত আছে যে, চারি বৎসরের বালক যখন শিক্ষকের নিকট প্রেরিত হয়, তখন শিক্ষক তাহাকে বর্ণমালা শিখাইবার জন্য সিন্ধী ভাষার প্রথমবর্ণ 'অলিফ' উচ্চারণ করিতে বলেন। বালক তাহা আনন্দের সহিত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু শিক্ষক যখন তাহাকে দ্বিতীয় বর্ণ 'বে' উচ্চারণ করিতে বলেন তখন তাহা অস্বীকারপূর্ব্বক বলেন যে, অলিফ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বর্ণ নাই। কারণ অলিফ বর্ণের অর্থ অদ্বিতীয় আল্লা বা ঈশ্বর। শিক্ষক অদ্ভুত বালককে তাহার পিতার নিকট লইয়া সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করেন। তৎশ্রবণে সুফী পিতা পুত্রকে আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া বলেন—বৎস, তুমিই ঠিক বুঝিয়াছ। বালক লতিফ একদিন অন্যান্য বালকগণের সহিত খেলিতে খেলিতে হঠাৎ অন্তর্হিত হন এবং একটী বিশাল বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-আচ্ছাদিত বৃহৎ গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তথায় তিন দিন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। পিতা বহু অন্বেষণের পর পুত্রের সন্ধান পান। লতিফ বাল্যকালে হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলমান ফকীরগণের সহিত সুযোগ পাইলেই মিশিতেন ও ভ্রমণ করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি জঙ্গলে পলাইয়া নির্জ্জনতা ও নীরবতায় অতিবাহিত করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। অবশেষে তিনি পর্বত-বেষ্টিত, ও হ্রদ-সংযুক্ত জঙ্গলে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কবিত্বের ও সাধুত্বের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার নিকট লোকসমাগম হইতে লাগিল।

লতিফ ছিলেন দীর্ঘকায় ও সবল। তাঁহার কপাল ছিল বিস্তৃত ও বর্ণ সুন্দর। আহারে, পরিধানে ও ব্যবহারে তিনি অতিশয় সরল ছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর দিবসই কয়েক জন শিষ্য দুঃখাতিশয্যে প্রাণত্যাগ করেন। সুফীদিগকে গোঁড়া মুসলমানগণ 'ভণ্ড' বলিয়া অবজ্ঞা করেন এবং সময়ে সময়ে গোঁড়া মুসলমানদিগের হাতে তাঁহারা ভীষণ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। বিখ্যাত সুফী মনসুর অল-হালাজকে 'আমিই ঈশ্বর' এই বাক্য উচ্চারণের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। লতিফ সুফী হইলেও ইস্‌লামের সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রোজ পাঁচ বার করিয়া নমাজ পড়িতেন। মালা জপ, উপবাস ও কোরাণপাঠে তিনি অনুরাগী হইলেও তাঁহার গোঁড়ামি ছিল না। তিনি বলিতেন, উপবাস ও উপাসনার আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু প্রিয়তমকে লাভ করিতে হইলে প্রেম ও পবিত্রতার প্রয়োজন।

কোরাণের একটি আদেশ তিনি পালন করিতে পারেন নাই, নৃত্য ও গীতবর্জন। তিনি নৃত্য ও গীত এত ভালবাসিতেন যে, উহার অভাবে অধীর হইতেন। তিনি বলিতেন, আমাদের হৃদয়ে যে প্রেমবৃক্ষ আছে তাহা সঙ্গীতের অভাবে শুকাইয়া যায়। এখনও ভীটস্থ তাঁহার সমাধিস্থানে প্রতি শুক্রবার ফকীরগণ সমবেত হইয়া আনন্দে নৃত্য ও গীত করেন।

লতিফের কবিতারাশি সিন্ধী ভাষায় লিখিত। সেইগুলির নাম 'রিসালো। ১৮৬৬ খ্রীঃ জার্ম্মাণীর লিপজিগ সহর হইতে ডাক্তার ট্রাম্পের চেষ্টায় তাঁহার রিসালো সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী সালে বোম্বাইতে রিসালোর আর এক সংস্করণ বাহির হয়। বর্ত্তমানে সিন্ধুদেশের সরকারী শিক্ষা বিভাগ হইতে রিসালোর একটী বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। লতিফের কবিতার সামান্য অংশের ইংরাজি অনুবাদও দৃষ্ট হয়। সেক্সপিয়রের সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি মানব জীবনের সকল প্রকার জীবিকা ও বিভাগের রহস্যবিৎ ছিলেন। এই বিষয়ে লতিফকে সেক্সপিয়রের সমকক্ষ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সাধারণ মানুষকে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই লতিফ এই সকল জনপ্রিয় উদাহরণ গ্রহণ করেছিলেন। কখনও তিনি রোগীরূপে চিকিৎসকের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান, কখনও গ্রাম্য বালিকারূপে চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে গান করিতেছেন এবং কখনও বা তিনি নাবিকপত্নীরূপে দূর দেশস্থ পতির বিরহযন্ত্রণায় আকুল। বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিশেষ বিশেষ শব্দ এমন নিপুণতার সহিত তিনি ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহা পড়িলে মনে হয়—কামার, তাঁতি ও কৃষক প্রভৃতির ব্যবসায়তত্ত্বেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। নিম্নে তাঁহার জীবনের কয়েকটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, লতিফ কত গভীর সাধক ও কবি ছিলেন।

একদিন একটী অন্ধ আসিয়া লতিফের নিকট তাঁহার চক্ষুর নষ্ট দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইল। লতিফের মন তখন উচ্চ চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা আসিলে তিনি দেখিতে পাইলেন—অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া আনন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নৃত্য করিতেছে। তিনি অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন উহা অবগত হইলেন তখন বলিলেন—'ঈশ্বরই সকল

কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্তা। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানুষকে না করিয়া ঈশ্বরের নিকটই করিতে হয়।'

আর একদিন লতিফ ও তাঁহার শিষ্যগণের সম্মুখে জনৈক ফকির বলিলেন যে, জনৈকা বিবাহিতা নারী তাহার উপপতির সহিত পলায়ন করিয়াছে। তৎশ্রবণে লতিফ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'সে ঠিকই করিয়াছে'। ইহা বলিয়া তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। উপবিষ্ট ভক্ত ও বন্ধুগণ তাঁহার এই ভাবান্তরের কারণ জানিতে চাহিলে লতিফ বলিলেন 'এই দুর্ব্বল নারী মানুষের উপর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরতা অবলম্বন করেছে আমরা যদি সেইরূপ আমাদের প্রিয়তম অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি তবেই জীবন ধন্য হইবে। ঈশ্বরলাভের ও শান্তিপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।'

লতিফ একদিন গাছের তলায় বসিয়া নিবিষ্টমনে মালা জপ ও ঈশ্বরের নাম লইতেছিলেন। এমন সময় দু'টী গোয়ালিনী মেয়ে দুধ বিক্রয়ান্তর সেই বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছে ও বিশ্রাম করিতেছে। এক জন বলিল—'বোন, এই মাসে অনেক বারই আমি আমার প্রিয়তমের (প্রেমিকের) সঙ্গে মিলনের সুখ পেয়েছি। তুই তোর প্রেমিকের সঙ্গে কতবার মিলিত হয়েছিস্?' তদুত্তরে অপর গোয়ালিনী বলিল—'বোন, তুই প্রেমিকের সঙ্গের মিলনের সংখ্যার কথা কেন প্রশ্ন করিস্? প্রিয়তমের সহিত মিলনের কোন হিসাব রাখিতে নাই।' লতিফ এতক্ষণ উহাদের প্রাণের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয়া গোয়ালিনীর আলাপে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া স্বীয় জপের মালা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন—'সত্যইত, প্রেমিকের সহিত মিলনের হিসাব নিকাশের প্রয়োজন কি?'

একদা একটী ফকির গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন; অদূরে অল্পবয়স্ক বাছুরটী বাঁধা ছিল। লতিফ দেখিলেন—বাছুরটী মায়ের দুগ্ধপানের জন্য লাফাইতেছে, কিন্তু মোটা দড়ি ছিঁড়িতে পারিতেছে না। লতিফ ফকীরকে বাছুরটী ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ফকীর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করায় লতিফ জোর করিয়া বাছুরটী ছাড়িয়া দিলেন। তখন বাছুরটী মহানন্দে দুগ্ধপান

করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লতিফ বলিলেন—'এইরূপ একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সহিত সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বর দর্শন নিশ্চিত।'

আর একদিন কবি লতিফ পথিপার্শ্বে আপন মনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় একদল মক্কাযাত্রী উষ্ট্রপৃষ্ঠে পথের উপর দিয়া যাইতেছিল। তাহারা তীর্থযাত্রী জানিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পিপাসার্ত্ত যাত্রীগণ একটী জলস্রোতের নিকট থামিলেন। তখন একদল ছাগলও উক্ত স্রোতের জল পান করিবার জন্য তথায় উপস্থিত। পিপাসিত ছাগলগুলি জলপানান্তে জলস্রোতের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া লতিফ একটি গান গাহিলেন। গানের মর্ম্ম এই যে, 'আমি চাই, কিন্তু তোমায় পাই না। হে প্রভু! আমায় চাওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিও না। পাওয়াতে চাওয়া বন্ধ হয়। হে প্রেমময়! পাওয়া না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার চাওয়া যেন চিরকাল থাকে।'

সিন্ধীগণ লতিফকে সিন্ধুদেশের সেক্সপীয়র বলিয়া গণ্য করেন। লতিফের গ্রন্থাবলীতে যত শব্দ আছে, তার মধ্যে ১২০০০ (বার হাজার) শব্দই সংস্কৃত। এই সিন্ধীভাষা মাত্র ৪৫ লক্ষ সিন্ধী নরনারীর কথিত ও লিখিত ভাষা। উক্ত ৪৫ লক্ষ সিন্ধীর মধ্যে ১০।১১ লক্ষ হিন্দু এবং অবশিষ্ট মুসলমান। এই ভাষা বর্ত্তমানে উর্দ্দুর ন্যায় আরবী অক্ষরে লিখিত হয়। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র সিন্ধী ভাষাই আরবী অক্ষরে ডানদিক হইতে বামদিকে লিখিত হয়। এই সিন্ধীভাষাকে আরবীভাবাপন্ন (Arabisization) করিবার জন্য মুসলমানগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু সিন্ধীগণ তাহার প্রতিবাদস্বরূপ সিন্ধী ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন (Sanskritise) করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। সিন্ধী হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে সিন্ধীভাষায় শতকরা ৮০টী শব্দ সংস্কৃত এবং সিন্ধীভাষা তাহাদের মত অন্যান্য প্রদেশের ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতম নিকটবর্ত্তী। ১৭৫৭ খ্রীঃ হইতে সিন্ধীভাষা আরবী অক্ষরে লিখিত হইতেছে। তৎপূর্ব্বে উহা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইত। শামী নামক একজন হিন্দু কবি ছিলেন এই প্রদেশে। তিনি গীতা ও উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ভাবাহরণ করিয়া

বহু কবিতা লিখিয়াছেন। লতিফের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনভূমি বা সঙ্গমস্থল। দুখায়ল ও বেওয়াশ্ নামক তরুণ সিন্ধুর হিন্দু কবিগণ লতিফ ও শামীর পদানুসরণ করিতেছেন।

লতিফ কল্পিত আখ্যায়িকা অবলম্বনে কবিতা লিখিতেন। নিম্নলিখিত উপাখ্যান হইতে জানা যাইবে যে, তাঁহার গল্পগুলি কল্পনার সৃষ্টি, সত্য ঘটনা নহে। লাহোরের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তস্থ একটী গ্রামে চুচক নামে এক নবাব ছিলেন। সদাচার সম্পন্না ও সৌন্দর্য্যভূষিতা তাঁহার এক মেয়ে ছিল। মেয়েটীর নাম হীর। উক্ত গ্রামের অদূরে মঞ্জু নামে এক ধনী মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার আটটী ছেলে ছিল। তন্মধ্যে রঞ্জু ছিলেন কনিষ্ঠ ও রূপবান্। রঞ্জুর চৌদ্দবৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হয়। তখন অন্যান্য ভ্রাতাগণ রঞ্জুকে সামান্য অর্থদান করিয়া গৃহহীন করে। রঞ্জু সহোদরদের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া এবং ভগ্ন-হৃদয় না হইয়া নীরবে গৃহত্যাগ করেন। কয়েক দিবস নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রঞ্জু ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া একটী নদী তীরে উপস্থিত হয়। তখন সন্ধ্যাকাল। নদীতীরে নরনারীগণ জলদেবতার আরতি করিতেছিল। দশ দিকে শান্তির হাওয়া বহিতেছিল। নিকটে এক সুসজ্জিত নৌকা দণ্ডায়মান এবং নদীর অপর পারে যাইবার জন্য প্রস্তুত। রঞ্জু নৌকাটীকে ফেরী ভাবিয়া নৌকায় উঠিলেন, এমন সময় নৌকাস্থিতা একটি সুন্দরী যুবতী তাহাকে নৌকা হইতে নামিয়া যাইবার জন্য রূঢ় ভাষায় আদেশ করিল। অনাহূত অতিথি নৌকা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে যুবতী যুবক অতিথির রূপ-রশ্মি-দর্শনে চমৎকৃত হন। যুবতী অন্য কেহই নহেন; ইনি উপরোক্ত নবাব দুহিতা হীর। হীরের ক্রোধ উপশম হইল। উভয়ে উভয়ের প্রেমে আকৃষ্ট ও আবদ্ধ হইলেন। পিতা ইহাতে বিরক্ত হইয়া হীরকে খেবো নামক অন্য কোন যুবকের সহিত বিবাহ দিলেন। হীর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল ও বিবাহিত স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিল। এদিকে রঞ্জু ফকীর বেশে হীরের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ঘুরিতে ঘুরিতে অতিকষ্টে হীরের দর্শন পাইল এবং উভয়ে একত্র নিরুদ্দেশ হইল। হীর ও রঞ্জু ধৃত হইয়া বিচারার্থ

কাজীর নিকট আনীত হইলে কাজী যুবককে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলেন এবং যুবতী পুরুষপারিণীতা স্বামীর নিকট প্রেরিত হইল। রঞ্জু নির্ব্বাসিত হইবার দিনই সমগ্র গ্রামে অগ্নির তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল। সকলেই বলিলেন—ইহার একমাত্র কারণ রঞ্জুর দুঃখ ও অভিশাপ। গ্রামবাসীগণ আবার উক্ত যুবক-যুবতীকে মিলিত হইবার স্বাধীনতা দিলেন। হীরের পিতামাতা রঞ্জুকে গৃহে ফিরিয়া সামাজিক প্রথানুযায়ী বিবাহের শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে বলেন, তৎপরে বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে। রঞ্জু গৃহে গমন করিলে হীরের নিকট মিথ্যা সংবাদ দেওয়া হইল যে, রঞ্জু পথিমধ্যে শত্রুর কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এই সংবাদ শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্রই হীর মূর্চ্ছিতা ও ভূপতিতা হইল এবং রঞ্জুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিল। রঞ্জু শ্বশ্রূগৃহে উপস্থিত হইয়া এই মর্ম্মভেদী খবর পাইল। মৃত্যু অবশেষে হীরকে প্রেমিকারূপে গ্রহণ করিয়াছে জানিয়া শরবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় রঞ্জু যন্ত্রণা অনুভব করিল এবং উন্মাদবৎ হীরের কবরস্থানে যাইয়া হীরের নাম করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। নরওয়ের নাট্যকার ষ্ট্রীণ্ডবার্গ (Strindberg) সত্যই বলিয়াছেন—'প্রথম প্রেমই প্রেম।' উপরোক্ত আখ্যায়িকার হীর সাধকের প্রতীক এবং রঞ্জুই প্রিয়তম বা ঈশ্বর।

সিন্ধুদেশের কবিশ্রেষ্ঠ শাহা আবদুল লতিফের কবিতারাশি শ্রুতিমধুর, ভাবপূর্ণ এবং প্রাণস্পর্শী। আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে লতিফের কবিতার কয়েকটি অংশ উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কিন্তু অনুবাদে তাঁহার কবিতাকুসুমের অপূর্ব্ব সৌরভ অনুপভোগ্য হইবে বলিয়া পাঠকপাঠিকাগণ অনুবাদপাঠে এই সিন্ধী কবির কবিতার মৌলিক আস্বাদ আদৌ পাইবেন না। ইকবাল ছিলেন যেমন উর্দ্দু ভাষার অমর কবি তেমনি লতিফ ছিলেন সিন্ধীভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। ইকবাল পাঞ্জাবী এবং লতিফের বহু পরবর্ত্তী এবং লতিফ সিন্ধী ও ইকবালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

"প্রেমই জীবন-তরীর প্রকৃত মাঝি। অন্যান্য উপায় বিসর্জ্জন দাও, নিজেকে চির-তরে বিস্মৃত হও। তবেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম উদিত হইবে। তরঙ্গাকুল সংসারসমুদ্রের অপর পারে লইয়া যাইবার প্রেমই একমাত্র কর্ণধার। প্রেমই

জীবনের সেরা ধর্ম্ম। প্রেমিক, প্রিয়তম ও প্রেম—এই তিনই এক। তিনই একটির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই রহস্য অবগত হইলেই প্রেম পরিপক্ক হয়। প্রেমকে বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পবিত্র কর, তবেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। প্রেমের রাজ্যে বেচা-কেনার নাম করিও না, প্রেমের স্বর্গে প্রেম ব্যতীত অন্য অবলম্বন আশ্রয় করিও না। প্রেমের প্রতিদান চাহিলেই প্রেম ফল্গু পবিশুদ্ধ হয়। কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ, সমবয়স্কের প্রতি প্রীতি এবং বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি—এক প্রেমের পাত্রানুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। প্রেমরত্ন যতই বিলাইবে ততই ইহার বৃদ্ধি হয়, প্রেমধন যতই বিস্তৃত হইবে ততই ইহা গভীর ও স্থায়ী হয়। প্রেমই জীবন। প্রেমহীনতাই মৃত্যু। প্রেম নামহীন ও রূপহীন। প্রেমের সহিত দেহজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই।"

"এক প্রাসাদের লাখ লাখ দরজা ও কোটী কোটী জানালা। যে জানালা বা দরজার দিকে তাকাই, দেখি যে, আমার প্রিয়তমই উঁকি দিতেছেন। আল্লা বা ঈশ্বর সকল পশু, পক্ষী ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি যেমন এক, তেমনি ভগবান ও ভক্ত এক। এক ঈশ্বরই শত্রু ও মিত্র, সৃষ্ট ও স্রষ্টা, গুরু ও শিষ্য বহুরূপে প্রকাশিত। আল্লা এক, কিন্তু তাঁহার অনন্ত নাম। একই বহুর কেন্দ্র। একত্ব ও অভেদত্বই সত্য, বহুত্ব ও ভেদই মিথ্যা। এক হইতে বহুর আবির্ভাব, একেই বহুর স্থিতি এবং শেষে একেই বহুর বিলয়। একত্ব দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি।"

নদীতীরে বাস করিয়াও যাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হয় তাহারা অন্ধ। আমাদের প্রিয়তম আছেন প্রাণবায়ু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর নিকটে; তথাপি যাহারা তাঁহাকে অন্যত্র খুঁজিয়া বেড়ায় তাহারা অজ্ঞ। প্রিয়তম আছেন আমাদের অতি নিকটে, অথচ তাঁহাকে আমরা অতি দূরে খুঁজিতেছি। তাঁহাকে যে অন্তরের নিভৃত কক্ষে অন্বেষণ করিতে হইবে, দুনিয়ার স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া। তবেই তিনি ধরা দিবেন। তিনি ধরা না দিলে কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তিনি যে সকল স্থানে আছেন আমি সে সকল স্থানে নাই। তিনি আমাদের হৃদয়েই অবস্থিত প্রেমরূপে। যেখানে বিশুদ্ধ প্রেমের বিকাশ সেইখানেই তাঁহার প্রকাশ। যাকে তুমি চাও, রে মন! তিনি বাহিরে কোথাও

নাই। সুতরাং বৃথা কেন তাঁকে বাহিরে খুঁজিয়া মরিতেছ। বহির্জগতে তাঁহার যে রূপ তুমি দেখিতেছ তাহা সত্যরূপ নহে। তাঁহার বিকাশ ভাবরাজ্যেই অধিক। তিনি ভাবরাজ্যের রাজা। তিনি হৃদয়-মন্দিরের দেবতা। ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় জগতে খুঁজিতে হইবে।"

"যদি প্রকৃত যোগী হইতে চাও তবে সংসারের সকল আসক্তি ছিন্ন কর। যদি খাঁটী ফকীর হইতে ইচ্ছা কর তবে নীরবে প্রিয়তমের ধ্যান কর এবং মুখ বন্ধ কর। ভস্ম মাখিয়া ভণ্ড সাজিও না। বৈরাগ্যের বস্ত্র পরিধান কর। বৈরাগ্যের জলে অবগাহন না করিলে দেহ ও মনের ময়লা ধৌত হয় না। বাহিরে মালা জপ ত্যাগ করিয়া মন-মালা প্রেমের সূত্রে গ্রথিত কর, প্রত্যেক নিশ্বাস সেই মন-মালার এক একটী গুটিকা। আসল প্রেমিক ও যোগী হইতে হইলে লোক-দেখানো ভাব সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে। গৃহত্যাগ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের অধীনতা ত্যাগই উচ্চতর ত্যাগ।"

"বিনয় বা নম্রতাই জীবনের প্রধান ভূষণ। অলঙ্কারে প্রিয়তমের সন্তোষ হয় না। বৃক্ষ যেমন ফলভারে অবনত হয় সেইরূপ নিরভিমানিতার অলঙ্কারে জীবনকে সজ্জিত কর। প্রিয়তমকে পাইতে হইলে চাই অসীম ধৈর্য্য। কেহ অনিষ্ট বা নিন্দা করিলে তাহার প্রতিশোধ লইও না। হাওয়ায় থুথু ফেলিলে স্বীয় গাত্রেই তাহা পতিত হয়। অহঙ্কার অস্থিরতার সৃষ্টি করে। প্রেমরাজ্যে অস্থিরতাই প্রধান অন্তরায়। যে অগ্রগামী হইতে চায় সে-ই পশ্চাদগামী হয়; আর যে সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী সে-ই সকলের অগ্রগামী হয়।"

"পতঙ্গের ন্যায় প্রেমের অগ্নিতে ঝাঁপ দাও। পতঙ্গ যেমন বিরহ-বাণে বিদ্ধ হইয়া আত্মহারা হয় এবং আগুনে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে ভূতভবিষ্যতের বিচার করে না প্রেমিককেও সেইরূপ হইতে হইবে। লাভের আশা ও স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ঝাঁপ দেয় তারা শান্ত হয়। প্রেমের অগ্নিতে উত্তাপ নাই কিন্তু আলো আছে। প্রেমে স্বার্থ থাকিলেই জ্বালা আসিবে।"

সিন্ধুদেশের ৪৪ লক্ষ লোকের শ্রেষ্ঠ কবি শাহা আবদুল লতিফ সত্যই জগতের একজন মহামানব। সিন্ধুদেশেও মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুগণই এই মহাকবির

অধিক সমাদর করেন। পাঞ্জাবে ও বাংলাদেশে উক্ত কবির কবিতার ও ভাবরাশির প্রচার হওয়া আবশ্যক। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সঙ্গীতেই তিনি স্বর্গীয়ভাবে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। কোন বাঙ্গালী কবি যদি সিন্ধী ভাষা শিখিয়া লতিফের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন তাহা হইলে তাহা আমাদের সমৃদ্ধিশালী মাতৃভাষার সম্পদ আরও বৃদ্ধি করিবে।

একুশ

জগদীশচন্দ্র *

বরিশালের ধর্মগুরু জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বাংলার সর্বত্র সুবিদিত। যে সকল মহাপুরুষ তরুণ বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বরিশালের কর্মবীর অশ্বিনীকুমার ও সেবাব্রত কালীশচন্দ্রের ন্যায় তিনিও বাংলায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জগদীশ এমন নীরব, আড়ম্বরহীন ও সহজ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বা শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিগণও তাঁহার সুমহান জীবনের নিগূঢ় পরিচয় পান নাই। তাই তাঁহার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে প্রকাশিত তিন খানি[১] পুস্তকেও তাঁহার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অথচ বাংলার নানাস্থানে, এমন কি, রেঙ্গুন, বোম্বাই, নাগপুর ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী জগদীশের সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য এই সামান্য প্রবন্ধ লিখিত হইল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপকরণ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

---

* উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

১ (ক) আচার্য্য জগদীশ-প্রসঙ্গ—শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত।
(খ) জগদীশ সঙ্গে ত্রিশ বৎসর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত।
(গ) Saint Jagadis Mukerjee—By Nibaran Ch. Dasgupta.

ঋষি জগদীশ ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহার বরিশালস্থ আশ্রমে প্রায় ৭১ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি বরিশালে তাঁহার ষষ্ঠ স্মৃতি উৎসব শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও তিনি খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমার অধীন একটী গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার জীবনের শেষ ৪৬ বৎসর অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র কর্মজীবন বরিশালে অতিবাহিত হয়। জগদীশের সহযোগে অশ্বিনীকুমার বরিশালবাসীকে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পিতার নামে ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুল স্থাপন, বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভক্তিযোগ' প্রণয়ন এবং অন্যান্য দেশসেবার দ্বারা অশ্বিনীকুমার অমর হইয়াছেন।

আর জগদীশ প্রায় দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর নীরবে শিক্ষাদান এবং ধর্ম-সাধন ও প্রচার করিয়া গেলেন। তাই বরিশাল তাঁহাকে ধর্মগুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি যে ধর্মানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন তাহা এখনও নির্বাপিত হয় নাই। আর্ত্ত ও রুগ্নের সপ্রেম সেবাশুশ্রূষা দ্বারা কালীশচন্দ্র তরুণদের অনুপ্রাণিত করিয়া "Little Brothers of the Poor" নামক যে সেবাসংঘ স্থাপন করেন তাহার কথা Encyclopaedia Britannicaতে স্থান পাইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার ও কালীশচন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজননীর অনেক সুসন্তান বরিশালে জন্মগ্রহণ করিয়া উহাকে নানাভাবে বিখ্যাত করিয়াছেন। দার্শনিক সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন ও হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং (রামকৃষ্ণ সংঘের) স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দ বরিশালেরই লোক।

আচার্য্য জগদীশ বৈদিক যুগের ঋষির মত ছিলেন। তাঁহাকে গৃহস্থ বলা যায় না। কারণ, তিনি চিরকুমার ছিলেন কিন্তু তিনি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নাই। বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দের ন্যায় মহাপুরুষ জগদীশকে ঋষি আখ্যা দিয়াছিলেন। বরিশালের সিদ্ধসাধক সোনা ঠাকুর (কালীভক্ত ৺সনাতন চক্রবর্তী) জগদীশকে এত অধিক ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইতেন। আদর করিয়া সোনা ঠাকুর

জগদীশকে "রসগোল্লা" বলিয়া ডাকিতেন। অশ্বিনীকুমার যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিতে যান তখন জগদীশ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়াই অশ্বিনীকুমারকে নাকি বলিয়াছিলেন 'অরুণোদয়ের পূর্ব্বে তোলা এই মাখনটুকু কোথা থেকে আনলে?'

তিনি জগদীশকে কাঁচা সোনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বরিশাল জেলার জনসাধারণ তাঁহাকে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন যে, লোকে তাঁহাকে "বাখরগঞ্জের শিব" বলিত। সত্যই তিনি ছিলেন বরিশালের সৌম্য, শান্ত, সুসমাহিত, তপোজ্জ্বল, দিব্যকান্তি শিবঠাকুর। ঋষি জগদীশের দেহখানি এত গৌরবর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল যে, তাঁহাকে শ্বেতমর্ম্মরে খোদিত দেবমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বভাবতঃ মাখনের ন্যায় কোমল ও শুভ্র ছিল। তাঁহার করতল ও পদতলের রক্তিম আভা শাস্ত্রবর্ণিত করকমল ও পাদপদ্মের স্মৃতি জাগ্রত করিত।

শিশুকাল হইতেই ঋষি জগদীশের অসাধারণ মাতৃভক্তি ছিল। ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ লইয়াই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যখন শিবপূজা করিতেন শিশুপুত্র জগদীশ নিবিষ্ট মনে সেই পূজা দর্শন করিতেন। পূজাকালে পিতৃদেবোচ্চারিত স্তব স্তুতি বালকের কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। সেকালের কণ্ঠস্থ গঙ্গাস্তোত্র তিনি শেষ জীবনেও সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা কাশীবাসিনী হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় জীবনপাত করেন। তিনি এত স্নেহময়ী ছিলেন যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মাতৃভক্ত জগদীশ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতা তাঁহাকে বরিশালস্থ শত শত নরনারীকে ধর্ম্মদানরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে নিষেধ করেন। মাতা পুত্রবৎসলা কিন্তু নিঃস্বার্থ ছিলেন, তাই পুত্রকে স্বীয় সকাশে যাইতে দিলেন না। আবার পুত্রের অনুরোধে কাশী ত্যাগ করিয়া পুত্রের কর্ম্মস্থল ও সাধনক্ষেত্রে আসিতেও অস্বীকার করিলেন না। প্রসববেদনায় কোন মহিলাকে নিদারুণ কষ্ট পাইতে দেখিয়া

জগদীশ চিরকুমার থাকিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের সৎসংকল্পে ধর্ম্মপরায়ণা জননী কোনও আপত্তি করিলেন না। একবার একটী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট অনেক কান্নাকাটি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন— যদি এতদিনের মধ্যে আপনার মেয়ের বিবাহ না হয় তবে আমি তাকে বিবাহ করিতে পারি, কিন্তু মেয়ের ভরণ-পোষণ আপনাকেই করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় উক্ত সময়ের মধ্যেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ হয়। ছেলেবেলা হইতে জগদীশের বিবাহে বীতস্পৃহা ছিল। একদিন প্রতিবেশীর গৃহে পুত্রবধু ও শাশুড়ীর ভীষণ ঝগড়া হইতেছিল। যুবক জগদীশ মাতাকে একান্তে ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মা, বিবাহের এই ফল।" জগদীশকে বুঝিতে হইলে তাঁহার মাতার জীবনী জানা আবশ্যক। মাতার আদেশ তিনি জীবনে কখনও লঙ্ঘন করেন নাই এবং মাতার আদর্শেই তাঁহার জীবন যেন গঠিত হইয়াছিল। মাতা 'ওঁ' এর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শারীরিক বেদনার সময় 'উহু' না বলিয়া 'ওঁ' বলিয়া কোঁকাইতেন। তিনি ঋষিতুল্য পুত্রের সঙ্গে প্রণব জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী যখন বরিশালে গমন করেন তখন জগদীশ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি বরাবর যেমন পরেন, একখানা দেশী কাপড় পরিয়াই মহাত্মার নিকট গিয়াছিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর খদ্দরব্রতী মহাত্মা তাঁহার পরিধানে দেশী কাপড় দেখিয়া বলিলেন, তুমি ওখানা কি কাপড় পরিয়াছ? তিনি বলিলেন, এই কাপড়খানা মাতৃদত্ত উপহার। মহাত্মা বলিলেন "তোমার মা যদি তোমাকে বিষ দেন, তুমি খাবে?" মাতৃভক্ত জগদীশ উত্তর করিলেন— "কেন খাব না? মা বিষ দিলে নিশ্চয়ই খাব।" দুইজনেই হাসিলেন।

যশোহর জেলা স্কুল হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তিলাভপূর্বক জগদীশ কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে এফ. এ. এবং সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি যখন যশোহর হাই স্কুলে পড়েন তখন অশ্বিনীকুমার সেই স্কুল দেখিতে যান। "একটী জিনিষ

দেখিবেন ?” এই বলিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয় অনিন্দ্য সুন্দর ননীর পুতুল জগদীশকে দেখান। অশ্বিনীকুমার জগদীশকে একটী শ্লোক লিখিতে দেন। জগদীশ মাত্র একবার সেই শ্লোকটী লিখিয়া তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলেন। অশ্বিনীকুমার তাহাতে অতিশয় মুগ্ধ হন এবং ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী জগদীশের প্রতি আকৃষ্ট হন। অশ্বিনীকুমারের পিতা যশোহরে সবজজ্ ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্নেহের জগদীশকে তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এবং পরে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়া ১৯২১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জগদীশচন্দ্র কার্য্য করেন। জগদীশ ব্রজমোহন কলেজের এফ. এ. ক্লাশে লজিক এবং বি. এ. ক্লাশে এ্যাষ্ট্রনমি পড়াইতেন। তিনি বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইচ্ছা করিলে এম. এ. পাশ বা উচ্চপদ লাভ করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। নৈতিক আদর্শে মানুষ তৈরী করা ছিল তাঁহার জীবনব্রত। তাই তিনি আজীবন শিক্ষকতা কার্য্যই বরণ করিয়াছিলেন। জগদীশ শ্রুতিধর ছিলেন। একবার শুনিলেই তিনি শ্লোক মুখস্থ ও পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। শেষে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে যেন নূতন শ্লোকই বলিতে পারিতেন না। সংস্কৃত শ্লোক রচনায়ও তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। যে কোন বিষয়ে শ্লোক লিখিয়া দিতে বলিলে তিনি কঠিন কঠিন ছন্দে সুললিত শ্লোক লিখিয়া দিতেন। তাঁহার অশেষ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। স্বীয় সাধনবলে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায়ও পারদর্শী হইয়াছিলেন। কখনও কখনও দিনরাত জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত হইত। জটিল অংক লইয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত, আদৌ নিদ্রা হইত না। এক একটী সমস্যার সমাধানে তিনি এক মাস বা ততোধিক সময় কাটাইতেন, কিন্তু নিজে উহার সমাধান না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। এইরূপ অবস্থায় স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ আসিয়া সমাধান বলিয়া দিয়াছেন, এইরূপ অভিজ্ঞতা তাঁহার একাধিবার হইয়াছে। কোন যুবক এম. এ. পাশ করিয়া Imperial Service Examination এর জন্য Higher Mathematics এর Astronomical Survey নামক একটী কঠিন বিষয় পড়িবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসেন। বিষয়

অনধীত হইলেও Wrangler Course এর এই বিষয়টী মাত্র দেড় মাসে তিনি অধ্যয়ন করিয়া যুবকটীকে পড়ান।

ঋষি জগদীশ অশেষ গুণের আকর ছিলেন। তিনি অজাতশত্রু, ন্যায়নিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। পরনিন্দা তাঁহার মুখে কেহ শোনে নাই। জগতে তিনি মিথ্যাকে অত্যধিক ঘৃণা করিতেন। অশ্বিনীকুমার জগদীশ সম্বন্ধে বলিযাছিলেন, "শুধু এদেশে নয়, সারা দুনিয়ায় এরূপ খাঁটি লোক কটা পাবি ? Character এবং Abilityর এরূপ দুর্লভ সমাবেশ খুব কম দেখা যায়।"

অন্য প্রসঙ্গক্রমে অশ্বিনীকুমার আর একবার বলিয়াছিলেন—"দ্যাখ্, জগদীশকে আমিই প্রথমে ভাগবত পড়াই, এখন আমিই তার শাস্ত্র পাঠ শুনতে আসি।" যদিও জগদীশ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন তথাপি অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। অশ্বিনীকুমারের সুপ্রসিদ্ধ 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন কামভাব অত্যন্ত প্রবল হইলে তাঁহার (অশ্বিনীকুমারের) দৃষ্টি জগদীশের রৌদ্রে দেওযা কাপড়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই উত্তেজনা আপনিই থামিয়া গেল। জগদীশ যোগীদের ন্যায় ভূমিবদ্ধদৃষ্টি হইযা ধীর পদবিক্ষেপে চলিতেন, বামে, দক্ষিণে বা সম্মুখে কোন দিকেই লক্ষ্য করিতেন না। ভীষণ রোগ ও যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা চিকিৎসকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। মৃত্যুর প্রাক্কালেও তাঁহার মুখমণ্ডল নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত ও সুশান্ত ছিল। ছয় হস্তপদযুক্ত একটা কিম্ভূতকিমাকার পতঙ্গ হঠাৎ তাঁহার কানে ঢুকিয়া দীর্ঘ দুই সপ্তাহ কাল ছিল। কর্ণকুহরের সেই অসহ্য তীব্র যাতনাও তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি মলিন করিতে পারে নাই। আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত কোন কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। একবার দুইজনে তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মহাতর্ক আরম্ভ করেন। পরে যখন এই বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়—তিনি বলেন যে, তিনি ইহার কিছুই শোনেন নাই। জগদীশের সাধক মন এত অন্তর্মুখীন ছিল যে, বাহ্যজগতের অনাবশ্যকীয় বিষয় তাহাতে স্থান পাইত না। তিনি অতিশয় নির্লোভ ছিলেন। কেহ তাঁহার জন্য রসগোল্লা বা কোন আহার্য্য রাখিয়া গেলে তিনি তাহার কিয়দংশ গ্রহণ

করিয়া অবশিষ্ট অপরকে খাওয়াইতেন। রসগোল্লা বা সন্দেশ তাঁহাকে খাইতে দিলে তিনি একটী গ্রহণ করিয়া পাত্রটী হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং কেহ আসিলে উহার একটী তাহার মুখে দিয়া দিতেন; হাত ধুইবার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া হাতে দিতেন না। আশ্চর্য্য এই যে, বরিশালে তাঁহার কোন নিন্দা কেহ শোনে নাই। তিনি প্রশংসায় কখনও উৎফুল্ল হইতেন না। যেমন তিনি পরনিন্দা কখনও করেন নাই তেমনি নিরর্থক স্তোকবাক্য বা স্তুতিবাদ তাঁহাকে করিতে কেহ শোনে নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এ জীবনে তিনি পিতার পুত্র, শিষ্যের গুরু এবং গ্রন্থের লেখক হইবেন না। ঈশ্বর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাঁহার জীবন জয়যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যদিগকে তিনি তাঁহার কোনও প্রকার স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বরিশালে যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতেন তথায় কয়েকটী স্কুল ও কলেজের ছাত্র থাকিত এবং এখনও থাকে। স্থানটী আশ্রমে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার নামানুসারে উহাকে 'জগদীশ আশ্রম' বলা হয়।

তিনি আশ্রমস্থ ছাত্রদিগের ও স্কুলের বালকদিগের নৈতিক জীবনগঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিতেন। একবার একটী ছাত্রকে আশ্রমে আনাইয়া নির্জ্জনে সৎপ্রসঙ্গান্তে তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, 'বাবা, এই হাতদুটী যেন চিরকাল ঈশ্বরের দিকে থাকে।' তদবধি ছাত্রটীর মনে ধর্ম্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা জাগিল। ছাত্রটী ভবিষ্যতে অবিবাহিত থাকিয়া সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে এমন গাম্ভীর্য্য ও দিব্যশক্তি ছিল যে, কেহ তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। তাঁহার আদেশে কঠোরতাশূন্য দৃঢ়তা এবং প্রশ্রয়হীন স্নেহ ছিল। ছাত্রগণ পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নৈতিক ও দৈহিক অনুশীলন করে সেইভাবে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজে সেতার বা এসরাজ বাজাইতেন। তাঁহার দেখাদেখি ছাত্রগণও সঙ্গীতচর্চ্চায় উৎসুক হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে তিনিই চিরতরে সঙ্গীতচর্চ্চা ত্যাগ করেন।

ছাত্রগণ পাছে তাঁহাকে অনর্থক অনুকরণ করিয়া নিরামিষাশী হয় সেইজন্য তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত মৎস্য খাইতেন। আশ্রিত ছাত্রদিগের মঙ্গল কামনায় তিনি আজীবন এইরূপ কত যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার কুটীর গৃহে বা তাঁহার সম্মুখে কাহারো মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা হইত না। মিথ্যা কথা বলিতে গেলেও সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িত। একবার একটী ছাত্র পায়খানার পথে মলত্যাগ করিয়াছিল, অপরাধী ছেলেটী তাঁহার ঘরের মধ্যে বসা ছিল। আশ্রমের ম্যানেজার এই সংবাদ জগদীশকে দিলেন। ছেলেটী তখন বলিয়া উঠিল—"বাহে করিয়াছি ত আমি, কিন্তু স্বীকার পাইব না কিছুতেই!"

ঋষি জগদীশকে তাঁহার (স্কুলের ও কলেজের) ছাত্রগণ 'স্যার' (Sir) বলিয়া ডাকিত। তাই যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলেই তাঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিতেন। বরিশালের সর্ব্বত্রই তিনি এই নামে পরিচিত। উত্তম স্বাস্থ্যের অভাবে তিনি সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি প্রকৃত সমাজসেবক, স্বদেশভক্ত ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। একবার তিনি বরিশালের প্রতিনিধি হইয়া কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গমন করেন। সমাজসংস্কারেও তিনি খুব অগ্রণী ছিলেন। একটী বাল-বিধবার পুনর্বিবাহের চেষ্টা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রয়োজন হইলে আমি এই বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য করিব।' বরিশালের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ উকিল রায় বাহাদুর গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়ের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ কর্ত্তা ছিলেন চিরকুমার ব্রহ্মচারী জগদীশ। শুদ্ধি, সংগঠন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অভিমত বরিশাল জিলার হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯২৬ খ্রীঃ কলিকাতায় 'পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের' ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছুৎমার্গ মানিতেন না, কিন্তু শুচিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণের মত ছিল; অথচ তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া বা আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

জগদীশের কোন লৌকিক গুরু ছিল না। দীক্ষা ও গুরুকরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মহাপুরুষ যেমন গুরু হইতে পারেন, তদ্রূপ নিজের আত্মাও গুরু হইতে পারেন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন 'বাসনামুক্ত শুদ্ধ মনই শেষে সাধকের গুরু হয়।' মহাত্মা ৺সোনা ঠাকুর তাঁহাকে একটী মন্ত্র জপের উপদেশ দিয়াছিলেন। তবে জগদীশ তাহা অল্প দিনই জপ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট তিনি স্বপ্নে মন্ত্র বা সাধন পথের নির্দ্দেশ পাইয়াছেন—এইরূপ কেহ কেহ বলিতেন। এই বিষয় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। আবার তিনি কাহাকেও মন্ত্র দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি গায়ত্রী জপ করিতে উপদেশ দিতেন। শোনা যায়, তিনি কোন কোন অনুরাগী ভক্তকে গায়ত্রী দীক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন না। তিনি অদ্বৈতবাদী বেদান্তী ছিলেন। তথাপি তাঁহার আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি উপাস্যরূপে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের একটী পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি যাহাতে লোকে তাঁহার আশ্রমে দেখিতে পায় সেইজন্য তাঁহার ভজনালয়টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিতে সুশোভিত।

ভগবৎ নাম সাধনার প্রতীক 'নাম ব্রহ্ম' ও তথায় সজ্জিত আছে। তিনি অতি উদার মতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন ও ধর্ম্মসমন্বয়ে অচল বিশ্বাস করিতেন। একবার জনৈক উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম উভয়েরই যে সমন্বয়মুখী বিশেষ সংস্কার আবশ্যক তাহা কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের তুলনা দ্বারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—"In truth Christianity has to be rechristianisd and Vaishnavism has to be revaishnavised." তাঁহার সকল উপদেশের ভিত্তি ছিল 'গীতা'। নাম সংকীর্ত্তনান্তে তিনি শত শত নরনারীর নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। শেষ বয়সে তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক শাস্ত্রব্যাখ্যা করাইতেন।

তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, 'আমার ঘরে যদি আগুন লাগে এবং এমন অবস্থা দাড়ায় যে, একটী মাত্র জিনিষ লইয়া বাহির হইতে পারি তবে আমি গীতাখানি লইয়া বাহির হইব এবং মনে করিব যে, আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রক্ষিত হইল। আব যদি দুইটী জিনিষ লইয়া বাহির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে গীতা ও ভাগবত এই দুইটী সম্পত্তি লইয়া আত্মরক্ষা করিব।' গীতা যে একাধারে রসাল সাহিত্য, সুযুক্তিপূর্ণ দর্শন ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মশাস্ত্র আচার্য্য জগদীশের ব্যাখ্যার ভিতর তাহা পরিস্ফুট হইযা উঠিত। গীতার উপর শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। গীতা যে, সকল শাস্ত্রের সার এবং মানবজাতির ধর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় গ্রন্থ তাহা তিনি বুঝাইতেন। অবনত হিন্দু জাতির বাঁচিবার উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—তোমরা এখন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ছেড়ে দাও, কুরুক্ষেত্রের পার্থ-সারথির উপাসনা কর।" জীবন-মরণের এই সন্ধিসঙ্কটে বাংলার হিন্দুগণ এই ঋষির আদেশ শিরোধার্য্য করিবে কি? হিন্দুজাতির মর্ম্মবেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিত। বাংলায় যদি হিন্দুগণ বাঁচিতে ও বাস করিতে চায় তবে তাঁহারা অচিরে জাতি-সম্বিতে উদ্বুদ্ধ হউন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন জগদীশের হৃদয়-দেবতা এবং তাঁহাব 'মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃত' গীতার ধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম। গীতাপাঠের সময় তিনি 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"এই জীবনই কুরুক্ষেত্র, 'কুরু', 'কুরু', 'কুরু'; কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর—এই অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে।" তিনি জীবনে কর্ম্মকুণ্ঠতার প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করিতেন।

স্বাস্থ্যেব অভাবে সেবাকার্য্য স্বয়ং না কবিলেও সেবার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। দেশকর্ম্মীদের প্রতি অত্যাচারেব বেদনা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। দেশের দুঃখ কষ্ট শ্রবণে অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইত। আর্ত্ত ও পীড়িতেব সেবক, বালক বা যুবক তাঁহাব নিকট আসিলে তাহাকে অতি কাছে বসাইয়া স্বহস্তে কিছু খাওয়াইতেন। সেবাব্রতের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তজ্জন্যই বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি এ যুগের আদর্শ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। শেষ

জীবনের সুদীর্ঘ ১৯ বৎসর তিনি বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবাপরায়ণতা বাল্যকালেই অতিথিসৎকার-প্রিয়তারূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ অতিথিসেবা হইত। একদিন অতিথিদিগকে খাওয়াইবার সময় ঘরে বেশী চিনি না থাকায় তাহাদিগকে গুড় দেওয়া হয়। অতিথিরা উঠিয়া গেলে জগদীশ তাহাদিগকে চিনি না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, তিনি চিনি ভালবাসেন এবং ঘরে চিনি বেশী না থাকায় অতিথিদেব গুড় দেওয়া হইয়াছে। তিনি ঘব হইতে চিনির পাত্র লইয়া এটোঁ পাত্র ফেলিবাব স্থানে "খা, জগা, চিনি খা," বলিয়া সমস্ত চিনি ঢালিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি তিনি খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং এবং তাঁহাদের 'চাপরাস্' আছে অর্থাৎ তাঁহাবা ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিবার প্রকৃত অধিকারী বলিতেন। বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত সবস্বতীপুজা উপলক্ষে একবার ববিশালে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'সমুদ্র ইব গম্ভীব' মহাপুরুষ জগদীশও হাততালি দিতে লাগিলেন।

জগদীশ উন্নত সাধক ছিলেন। সাধারণ লৌকিক ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া সমস্ত শক্তি তত্ত্বোপলব্ধি ও ভগবৎভজনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে যোগস্থ মনে হইত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় এই দুইটী জগতের মাঝখানে স্থিত হইয়া তিনি যেন সমস্ত কর্ম্ম করিতেন। প্রায়শঃই তাঁহার মুখে শোনা যাইত "তপ, তপ, তপ, নহিলে পত, পত, পত," অর্থাৎ সর্ব্বদা তপস্যা কর, নচেৎ পতন অনিবার্য্য। শাস্ত্রব্যাখ্যাকালে প্রশ্নকর্ত্তা হয়ত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে (যেন স্বীয় কল্যাণের জন্যই) তত্ত্বব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ। তিনি এইরূপ নিরভিমানী অনাসক্ত কর্ম্মযোগী সাধক ছিলেন। তিনি গুপ্তযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। একবার প্রাণায়াম বর্ণনা করিবার সময় একজনের হাত নিজের পেটেব উপর রাখিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার নাভিমূলের নীচ হইতে শ্বাস উঠানামা করিতেছে, কিন্তু নাভির উপরিভাগে কোন শ্বাসক্রিয়া নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের প্রার্থনাটী তিনি বড ভালবাসিতেন। প্রহ্লাদ ভগবান নৃসিংহদেবকে বলিতেছেন—"হে পরমাত্মন্, দুস্তর ভববৈতরণী পার হওয়াব জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই। যাহাদের চিত্ত তোমার প্রেমাস্বাদনে বিমুখ এবং ইন্দ্রিয-রূপ মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে সেইসব মূঢ়দের জন্যই আমাব কষ্ট। আমি এই সব দীন ভাইসকলকে পবিত্যাগ করিযা একাকী মুক্ত হইতে অনিচ্ছুক।" আচার্য্য জগদীশেব মুক্তিব আদর্শ ছিল এই প্রকার। নিম্নলিখিত স্তোত্রটী তাঁগব অতি প্রিয় ছিল এবং তিনি স্বীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিত্য উহা আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিতেন। স্তোত্রটী এই :—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাম্।
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ॥
চেতস্তু ভদ্রং ভজতামধোক্ষজে।
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥

অনুবাদ :—"বিশ্ববাসীব মঙ্গল হউক, খলব্যক্তি প্রসন্নভাব ধাবণ করুক। প্রাণিগণ পবস্পবেব প্রতি মনে মনে মঙ্গল চিন্তা করুক, আমাদের মন ভদ্রোচিত অধোক্ষজ হরির ভজনা করুক এবং আমাদেব মধ্যে অহৈতুকী সুমতি প্রবেশ করুক।" আচার্য্যদেবের কয়েকটী উপদেশ পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধেব উপসংহার কবিব :—"মনঃসংযমই প্রধান সাধন॥ বাসনাই পুনর্জন্মের বীজ॥ সরলতা ধর্ম্মজীবনের প্রথম ও শেষ সোপান॥ জীবন প্রার্থনা-পূর্ণ কর, শান্তি পাইবে॥ মানুষের কাছে কোন আশা করিও না। স্বর্গ নরক এই দেহ, এই দেহেই স্বর্গ নরক ভোগ হইয়া যাব। মানব যখন ভগবৎ প্রেমে বা বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হয় তখনই স্বর্গ। আর শরীরে রোগ কষ্ট এবং মনে হিংসা, দ্বেষ, অপবিত্রতা থাকিলেই নবক॥ হাসি কান্না গাঢ় হইলে গাম্ভীর্য্যে পবিণত হয়। গম্ভীব মানব হাসিকান্নার উপরে॥ যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসে নাম জপ হয় তাহাই করিতে হয়। আসন প্রাণায়াম না করিলে অভ্যাস দৃঢ় ও স্থায়ী হয় না। অণ্ডকোষ তৈলাধার, বীর্য্যই তৈলস্বরূপ। সূক্ষ্ম

শিরারূপ শলিতা দ্বারা ঐ তৈল আকর্ষিত হইয়া সহস্রারে উঠিলেই দিব্য আলো দেখা যায়। সে আলোর তুলনা নাই, অতি স্নিগ্ধ, অতি নির্ম্মল। সহস্রারে যে সূর্য্য উদয় হয় তন্মধ্যে নিজ ইষ্টমূর্ত্তি দেখা যায়॥"

ঋষি জগদীশের আদর্শ জীবন হিন্দুমাত্রকেই অনুধ্যান করিতে অনুরোধ করি। তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক। বাংলার স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ তাঁহার জীবন সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে বাংলায় নবযুগ আসিবে। অন্ততঃ তাঁহার কর্ম্মস্থল বরিশাল জেলায় যে, প্রায় একশত হাই স্কুল আছে এই সব স্কুলে তাঁহার ছবি স্থাপন করিয়া তাঁহার জীবনী ও বাণী আলোচনা হউক। তাহাতে বালকগণ নবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে।

বাইস

কাইসারলিং *

কাউন্ট হারম্যান কাইসারলিং বর্ত্তমান ইউরোপের অন্যতম চিন্তাশীল ও দার্শনিক। অয়কেন, বার্গশোঁ, ক্রোশে প্রভৃতির মত কোন দর্শন প্রবর্ত্তন না করিলেও পশ্চাতের জড়বাদমূলক সভ্যতা ও চিন্তাস্রোতকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি জীবন নীয়োগ করিয়াছেন। মোক্ষমূলর, ডয়সেন, ওল্ডেনবার্গ, স্কাব্‌বাট্‌স্‌কি প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিৎগণের মত তিনি শুধু প্রাচ্যের চিন্তা ও কৃষ্টি পুস্তকাকারে প্রচার না করিয়া তুলনামূলক জ্ঞানদৃষ্টিতে ইউরোপীয় চিন্তা ও সভ্যতার দোষ দর্শন করাইয়া প্রাচ্য জ্ঞানের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই মহৎ কার্য্যে কেহই আর

* উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অগ্রণী হন নাই। ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনা যে একদিন সমগ্র জগৎ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যজাতির অভূতপূর্ব্ব নবযুগের সূচনা করিবে, তাহার শুভ সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যেই উইলিয়ম জেমস্, জোসিয়া রয়েস্, অয়কেন, বার্গশোঁ, সোপেনহয়ার প্রভৃতি দার্শনিক, এবং উইলকক্স, জর্জ্জ রাসেল, টমাস্ ম্যান, রোমাঁ রোঁলা, আনাটোল ফ্রান্স প্রভৃতি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের মনে ভারতীয় চিন্তার আলোক প্রবেশ করিয়াছে।

কাইসারলিং রুশিয়ার লেলিনগ্রাড নগরের নিকটবর্ত্তী এস্থোনিয়া প্রদেশে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি কেস্নো ও রায়কুল্লা নামক গ্রামে গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন; পরে পারনাউ ও ডরপাট্ নামক সহরের বিদ্যালয়ে যান। তৎপরে হিডেলবার্গে তাঁহার পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা নগরীতে তিনি বি এ. পাশ করেন এবং এই সময়েই ভবিষ্যতে দার্শনিক হইবার জন্য পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ তিনি একখানি বই লেখেন এবং উক্ত বই লেখার সময় তিনি শুধু ব্যবসায়গত দার্শনিক না হইয়া আদর্শ জীবন যাপন করিয়া ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভের সংকল্প করেন। ১৯১১ খ্রীঃ তিনি পৃথিবী ভ্রমণ মানসে যাত্রা করেন ও জগতের সমস্ত সভ্যতা ও চিন্তার স্পর্শে আসিয়া তিনি ভবিষ্যৎ সমাজ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতা "দার্শনিকের ভ্রমণকাহিনী" (Travel Diary of a Philosopher) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই বইখানি জার্ম্মান ভাষায় লিখিত এবং ইংরাজীতে অনুদিত। অনুবাদক জে. হলবষ্টেড্ রীশ বলেন যে, কাইসারলিংকে যারা না দেখিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁরা এইটী যেন না ভুলেন যে, তাঁহার বিশেষ গুণাবলীর অধিকাংশই তাঁহার জীবনে ছাড়া পুস্তকে পাওয়া যাইবে না।

১৯০৩ খ্রীঃ তিনি ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া প্যারিসে গমন করেন ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বহুবার ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি ফ্রান্সে অবস্থানকালে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন ও সমাজপত্রে লিখিতেন। রুবার্টের সহিত তখন তিনি

পরিচিত হন ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় কোন মিউনিক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখেন। ক্লবার্টের প্রতি তাঁহাব আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সমাজপত্র সেবায় নিযুক্ত হইয়াও তিনি কাণ্ট্, সোপেনহয়ার ও ল্যাং প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্র গভীরভাবে আয়ত্ত করেন। পরে বিখ্যাত দার্শনিক বার্গশোঁ, সিমেল ও রুশিযার চিত্রশিল্পী উলকফ্ মোরমজফ্ প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০৫ খ্রীঃ রাশিয়ার বিদ্রোহের ফলে সামরিক ভাবে তাঁহার ভূসম্পত্তি ত্যাগ করিতে হয়। তাই দুই বৎসর তিনি বার্লিনে বাস কবেন। এই সময এক্বাব তিনি গ্রীসদেশ ভ্রমণে যান ও হামবার্গে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। কাইসারলিং নিভৃত চিন্তা ও পরিব্রাজকের জীবন খুব ভালবাসেন। তিনি নিজে বলিযাছেন, "আত্মজ্ঞান লাভই আমাব জীবনের একমাত্র আদর্শ।"

১৯০৮ খ্রীঃ পুনরায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তি ফিবিয়া পান ও দেশে বাস করিয়া কৃষকের মত জীবন যাপন কবিতেন। এই সময় তিনি বারট্রাণ্ড রাসেল, বার্গশোঁ, শিলাব, ওয়েভার, বুট্রোফস্, হালডেন, বালফোর, বেনিভিটো, ক্রোশে প্রভৃতি মনীষীদের সহিত পত্রব্যবহার করেন। পুনরায় বিদ্রোহের ফলে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়, তখন তিনি বাধ্য হইয়া জার্মেনিতে পলাতক-জীবন যাপন করেন। ১৯১৯ তিনি খ্রীঃ বিসমার্কেব কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইউবোপীয় মহাসমর তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তাব করিতে পাবে নাই। এই সময় চারি বৎসর তিনি তাহার নিভৃত বাসস্থানে থাকিয়া ধ্যানধারণাদিতে অতিবাহিত করেন।

তিনি "The World in the Making", "The Book of Marriage" "The Understanding of Europe" প্রভৃতি অনেক সারগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বইগুলি পাশ্চাত্যদেশে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়া এক নূতন চিন্তাস্রোত প্রবর্তন করিয়াছে। ১৯২০ খ্রীঃ তাঁহার পুস্তক প্রকাশের পরামর্শে ও গ্র্যাণ্ড-ডিউক আরনেষ্ট লাজ্উইক ভন হেসনের অনুরোধে ডাবমষ্টাড্টে তিনি "জ্ঞানমন্দির" (The School of Wisdom) স্থাপন করিয়াছেন। সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সংগঠন করাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তাঁহার চিন্তা ও শিক্ষার বিশেষত্ব ইউরোপে এক নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছে। কাইসারলিং বক্তারূপে তাঁহার নব চিন্তারাশি প্রচার করিয়া বেড়ান।

তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি একজন গভীর চিন্তাশীল সাধক। ভারতের চিন্তা, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। ১৯১৪ খ্রীঃ তিনি প্রাচ্য চিন্তারাশিতে এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তিনি নিজেকে পাশ্চাত্যদেশীয় বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না। বরং তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার চিন্তারাশি প্রাচ্য চিন্তারই ইউরোপীয় সংস্করণ। পাশ্চাত্য-দেশবাসীগণ প্রাচ্য দর্শন যেমন তেমনটি গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়াই তিনি তাঁহাদের উপযোগী করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন।

পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া কাইসারলিং প্রথমে সিংহলে পদার্পণ করেন। পরে রামেশ্বর, ইলোরা, দিল্লী, কাশী, বুদ্ধ গয়া, কলিকাতা, হিমালয়, রেঙ্গুন, চীন, জাপান ও আমেরিকা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার "পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী" নামক সাত শত পৃষ্ঠাপূর্ণ পুস্তকের অর্দ্ধেক তিনি ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতার বর্ণনার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। ৺কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে একদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। তিনি বলেন 'এমন আনন্দ ও শান্তির হাওয়া কোন হাঁসপাতালে দেখি নাই। এঁরা দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃতই শিষ্য। এদের হৃদয় ভালবাসা ও সহানুভূতিতে ভরা, অথচ এঁদের গোড়ামী নাই। মানবমিত্রের আদর্শ যেমনটি হওয়া উচিত এঁরা ঠিক তাই। এদের দেখিয়া আমি খ্রীষ্টান ও ভারতীয় করুণার পার্থক্য বুঝিয়াছি—খ্রীষ্টানদের দয়ায়, জীবে মানুষ-জ্ঞান ও তজ্জনিত পার্থক্য আছে। কিন্তু হিন্দুদের প্রেমে, জীবে দেবতা-জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক একত্ববোধ আছে।'

কলিকাতায় তিনি যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে যান এবং শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া অতিশয় আনন্দিত এবং ভারতীয় কলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

কাইসারলিং নিজেকে দার্শনিক অপেক্ষা জ্ঞানী বা যোগী বলিতে ভালবাসেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ভারতীয় চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। তাই উপনিষদ যখন প্রথম পড়িলেন তখন কিছুমাত্রও বিস্মিত হইলেন না। ধর্ম্ম বা দর্শন হিসাবে তিনি নিজে অদ্বৈত বৈদান্তিক এবং জ্ঞানযোগের সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, 'আমার সন্ন্যাসীর জীবন বড় ভাল লাগে এবং যে জন্য লোকে গৃহত্যাগ করিয়া মঠে যোগদান করে, আমি সেই জন্যই অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই পৃথিবী পর্য্যটনে যাই। কারণ আমাকে ইউরোপের আর কিছুই দিবার নাই। আমি মুক্তির চিন্তাতেই আনন্দ পাই। যখন আমি শরীর ও মনের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিব তখনই মুক্ত হইতে পারিব।' পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া ও তদনুযায়ী চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, কলা, দর্শন প্রভৃতির তত্ত্ব তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা একেবারে খাঁটী হিন্দু সিদ্ধান্ত। ইহাই তাঁহার চিন্তার বিশেষত্ব।

তিনি বলেন, "আমি বহির্জগতের ঘটনাতে বেশী মূল্য দেই না; ঘটনার পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহাই লক্ষ্য করি। জীবনীশক্তি যদি নিঃশেষিত না হইয়া থাকে তবে জীবনের গতি কখনও বন্ধ হইতে পারে না। ব্যক্তিগত পূর্ণতা জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। যিনি নিজের ব্যক্তিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া জগতের সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তিনিই মহৎ। ঈশ্বরের চক্ষে ইহা এবং সন্তান প্রতিপালন প্রায় একই জিনিষ।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "পাশ্চাত্য দর্শন সত্তা বা কারণকে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তির সহিত অভেদ ভাবিয়াছে, তাই তারা মনের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। আমরা এত স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন যে, শরীরতত্ত্ব হিসাবেও আমরা খ্রীষ্টান। তাই কর্ম্ম আমাদের আদর্শ। অপর পক্ষে হিন্দুদের সূক্ষ্ম বা কারণ রাজ্য স্বাভাবিক বলিয়া তারা কর্ম্মবিমুখ অর্থাৎ জ্ঞানচিন্তাকে আদর্শ করিয়াছে। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বঘোষ, যাহা বুদ্ধদেবের ৬০০ বৎসর পরে বলিয়াছেন, বার্গশোঁ আজ তাহা আমাকে বলিলেন। জেম্‌স, ম্যাক্, কম্‌টে, স্পেন্‌সার প্রভৃতি কেহই

বৌদ্ধ দর্শনের বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় মতে দয়া অপরের উপকার করা, আর বৌদ্ধ মতে নিজ অবস্থায় অপরকে তুলিয়া লওয়াই দয়া। অদ্যাবধিও খ্রীষ্টান জগৎ ভগবান ঈশার বাণী বুঝিতে পারে নাই। তিনি তাদের হৃদয়ে স্থান পান নাই, বাহিরেই আছেন। তাই তাঁর ধর্ম্ম আজ ক্রিয়াকলাপে পর্য্যবসিত। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁর শান্তির ধর্ম্ম জগতে এত অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। তাই জগতের যে কোন প্রকৃত সাধু হিন্দুর আদর্শ গ্রহণ করিবে। টমাস্ এ কেম্পিসের 'ঈশানুকরণ' নামক পুস্তক খ্রীষ্টান জগতের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠগ্রন্থ হইলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, উহাকে যত বড় বলা হয়, উহা তত বড় নহে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এই অনুসরণ ব্যতীত আরও অনেক উচ্চ তত্ত্ব আছে। আমি একজন বৌদ্ধকে একজন খ্রীষ্টান অপেক্ষা মহৎ ভাবি। গ্রীক প্রতিভা অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রতিভা আমার বেশী অন্তরস্পর্শ করিয়াছে। বহির্জগতের বস্তু যেমন বাস্তব, মনোজগতের চিন্তাও ঠিক তেমনি বাস্তব।" তিনি বলেন, "সৌন্দর্য্য কখনও ব্যক্তিগত নহে, উহাতে জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। সৌন্দর্য্য আমাদের জীবনের জ্ঞান স্থায়ী ও বিস্তৃত করিয়া দেয়, তাই উহাকে আমরা এত ভালবাসি।" হিন্দুরা মনের নীচ বৃত্তিগুলিকেও এমন দেবভাব দিয়াছে যে, যাহা জগতের আর কোন জাতি তাহা পারে নাই। একমাত্র হিন্দু কলাই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য জগতে প্রকাশ করিতে সমর্থ। একটি নটরাজ শিবে যে দেবত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহা সমগ্র আলাম্পিয়দের মধ্যে নাই। সমগ্র গ্রীক, লাটিন ও জার্ম্মেনি ভাষায় যত দার্শনিক শব্দ আছে, এক সংস্কৃত ভাষায় তদপেক্ষা অনেক বেশী আছে।" "ন্যায়শাস্ত্রেও হিন্দুরা ইউরোপীয়দের পশ্চাদ্বর্ত্তী নহে। থিওজফির (Theosophy) মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা খ্রীষ্টান প্রভাব বেশী। তারা হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের ছলে নিজেদের ভাবই প্রচার করে। কিন্তু হিন্দুর জ্ঞানই জগতের সর্ব্বোত্তম। এদের ধর্মবিজ্ঞান এত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যে, জগতে অন্য কোথায়ও এমন হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করায় পাশ্চাত্যে এত ইহকাল সর্ব্বস্ব সাংসারিক ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহাদের হিন্দু মত গ্রহণ করা উচিত।" "বিশ্বাস অর্থে কোন জিনিষকে সত্য মনে করা নয়, কোন আদর্শে

মন প্রাণ দিয়া উহা লাভের চেষ্টা"। "উর্দ্ধদৃষ্টি থাকিলেই মানুষ উন্নত হয়, তার আদর্শ তত পূর্ণ না হইলেও ক্ষতি নাই। একজন প্রকৃত সাধুর জীবন জগতের সমস্ত সৎকর্ম্ম অপেক্ষা বেশী। স্থূলভোগ আমাদের কমিয়াছে বলিয়াই এখন প্রাচ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি। আর জড়বাদের চূড়ান্ত আমরা করিয়াছি বলিয়াই আমাদের ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক উন্নতি আমরা বেশী বুঝিতে ও লাভ করিতে পারিব। যাহাই বলুন না আমি বলিতে বাধ্য যে, বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দু ধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে। বৌদ্ধ যুগে ভারতের গৌরবরবি যেন অস্তমিত হইয়াছে। উহা ভারতকে কোন নূতন আলোক দিতে না পারিয়া জন্মস্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।" "যে সাধু নিয়মাধীন, তিনি উচ্চ সাধু নহেন। আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে নিয়মের বাহিরে যাইতে হইবে। যে যত শরীরে আবদ্ধ সে তত নিয়ম চায়। আর যখন কোন নিয়ম স্বভাবে পরিণত হয়, তখন উহার শক্তি নষ্ট হয়। তাই জ্ঞানী ব্যক্তি নিয়ম অনিয়ম, ভাল মন্দের অতীত। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়েই খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা বেশী সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছে।" "ইস্‌লাম যোদ্ধাদের ধর্ম্ম, ইহাতে উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব নাই, উহা পাশ্চাত্যভাবান্বিত। কিন্তু ভারতের ইস্‌লাম হিন্দু ভাবান্বিত হইয়া যাইতেছে।"

"তাজমহল জগতের মধ্যে বৃহত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন। পার্থিনিয়ান, গথিক বা মুসলমান, দ্রাবিড় শিল্পের সহিত উহার তুলনা হয় না।" "কোন তীর্থস্থান পবিত্র কিনা উহার ঐতিহাসিক কোন উত্তর নাই। কোন স্থান বহুকাল পবিত্র বিবেচিত হইলে সেখানে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হয়। বাতাস যেমন বাস্তব, তেমনি যুগের প্রভাবও মূর্ত্ত হইয়া উঠে। কাশীতে ভক্তি বিশ্বাসের মূর্ত হাওয়া দেখিলাম। এমনটি জগতের কোন চার্চ্চে আর দেখি নাই। পাদরীগণ তাহাদের ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যয়নান্তে এক বৎসর এখানে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিলে অধিক ধর্ম্ম শিক্ষা পাইবে। কারণ, ইউরোপে তাহারা ইহার ছায়ামাত্র দেখিতে পান। হিন্দুরা সূর্য্যোপাসক বলিয়া আমরা তাহাদের পৌত্তলিক বলি। তাহা ভুল; কারণ তারা সূর্য্যকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া পূজা করে।" "শ্রীরাম কৃষ্ণের পার্শ্বে টমাস্ এ কেম্পিসের প্রভাব কিছুই নহে। খ্রীষ্টানদের অন্তরের

বিকাশ অতি অল্পই হইয়াছে। তাহাদের Love অপেক্ষা এদের ভক্তি অনেক উচ্চ। হিন্দুদের দর্শন, ক্রিয়াকাণ্ড ও মনোবিজ্ঞান উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের আকর। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ক্রিয়াকলাপ খুব অগভীর। তন্ত্র এক উচ্চ সাধনপথ দেখাইয়াছে। খ্রীষ্টান ক্যাথলিক মতবাদ অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মে শতগুণে অধিক গভীরতা আছে। মানুষের মনের এমন অবস্থা নাই যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম একটা পথ সত্যের দিকে না দেখাইতে পারে। তাই ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম মানব জাতির এক বিশাল অংশকে অন্ধকারে রাখিয়াছে, মুক্তির আলোক দিতে পারে নাই।" কাইসারলিং ৪।৫ স্থানে তাঁহার পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় লিখিয়াছেন। ২।৩ স্থানে স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" বাণী তাঁহার অন্তর খুব স্পর্শ করিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, পুণ্য পাপ, ভাল মন্দ, জীবন মৃত্যু, সুন্দর ভীষণ সকলের ভিতরই সত্যের আলোক দেখিয়াছে। ইহা তাঁহার মত।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ভারতে এবং ভারতেতর প্রদেশে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয় তাহাকে নিন্দা করিবেন, না হয় প্রশংসা করিবেন। "Historicity of Jesus" গ্রন্থের লেখক বলেন যে, ওয়াণ্ট হুইট্‌ম্যান ও বিবেকানন্দ খুব মন্দ লোক, কারণ তাঁরা পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। আর আজ তাঁর দেশের কাইসারলিংই বেদান্তের এই মত শিরোধার্য্য করিতেছেন। কাইসারলিং তাঁহার পুস্তকের ১০।১৫ স্থানে গীতার শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "গীতা বোধ হয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ, উহাতে সর্ব্ব মতের সমন্বয় আছে। আমি রাজযোগমতে সাধন করিয়া ছিলাম। যে স্থান হইতে চিন্তা ও শব্দ আসে, আমি সেই স্তরে মন লইয়া চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। চিন্তা যে বাস্তব তাহা উপলব্ধি করিলাম না। তখন প্লেটোর 'আইডিয়া' রাজ্যের কথা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু প্লেটো সেই স্তর অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাই 'আইডিয়াই' বলিয়াছেন। হিন্দু ঋষিরা অন্তরের যে সর্ব্বোচ্চ স্তরে সত্যের রাজ্যে বাস করিতেন, পশ্চিমের কোন দার্শনিক তথায় যাইতে পারে নাই। হেগেল, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টে, নিট্‌জে, প্লটিনাশ, গেটে এত উন্নত হন

নাই। অন্তরমুখীন চরম এক...তা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু পশ্চিমের দার্শনিকদের তাহা ছিল না, তাই তাঁহাদের দর্শন চরম সত্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। হিন্দু সভ্যতার ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহা ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানকে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সত্যের নিকট লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে পাশ্চাত্যেরা কেবল বাহিবটা বিস্তৃত করিয়াছে। ভারতের নিকট আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া কৃতজ্ঞ থাকিব, কারণ তাহারা সর্ব্বোচ্চ সত্য লাভ করিয়া আমাদের সেই পথ দেখাইয়াছে। তাই হিন্দুরা আমাদের মহাগুরু।" "হিন্দু কলা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। উহার সহিত আমাদের আর্টের তুলনা হয় না। আমাদেব আর্ট যেন স্থূল আকৃতির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। আমাদের ক্রাইষ্ট, ম্যাডোনা ও সাধুদেব ছবি যেন এই পৃথিবীর লোক। মান্দ্রাজ মিউজিয়ামে এক শিবমূর্ত্তি দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইয়া যাই। শিল্পী যেন অন্তরেব অসীমকে উপলব্ধি কবিয়া সীমার ভিতর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। চীন ও জাপানেব আর্টিষ্টবা যোগী। যদি তাঁহাদেব কোন মানুষের মুখ, কোন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা জলপ্রপাত আঁকিতে হয়, তাঁহারা এই সব ধ্যান দ্বারা অন্তরে উপলব্ধি করেন ও পরে তাহা চিত্রে প্রকাশ করেন। কোন সম্রাট টাওজে নামক চিত্রকরকে একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আঁকিতে বলেন। তিনি তথায় যাইয়া কোন নোট বা Sketch না লইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজার প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, আমি হৃদয়ে তাহা আঁকিয়া আনিয়াছি। ধ্যানী বুদ্ধের চেয়ে সুন্দর চিত্র আমি আর দেখি নাই। সৌন্দর্য্য যেন আপনার উদ্দেশ্য আপনি সিদ্ধ করিয়াছে—অসীম যেন সীমায় বদ্ধ হইয়াছে। ফুল যেমন আপন সৌন্দর্যে আপনি মুগ্ধ, ঠিক তেমনি।"

কাইসারলিং বলেন, "শরীরের কখনও কখনও এমন অবস্থা হয় যে, কোন উচ্চস্তরে যাইতে হইলে একটা ধাক্কার আবশ্যক হয়। তাই রোগ হয়। সমাজশরীরে বিদ্রোহ বা আদর্শহানি তেমনি রোগ বিশেষ"। "হিন্দুর সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন সব যেন সীমার ঊর্দ্ধে অসীমের ভিত্তিতে অবস্থিত"। "মানুষ সুখ অপেক্ষা দুঃখের মধ্যে বেশী উন্নত হয়। হিন্দু গুরুগণ শিষ্যদের দীক্ষা দিয়া কাছে রাখিতেন, ইহার মধ্যে শিক্ষাবিজ্ঞানের মহাসত্য নিহিত। সুখ অন্তরের জিনিষ, উহা

বাহিরের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। খ্রীষ্টানদের নৈতিক চরিত্র একেবারে বাহিরের জিনিষ। অন্তরে আমরা গ্রীকদের চেয়ে একপাও উপরে উঠিতে পারি নাই। যদি ভগবান কোনও ক্রমে আমাদের সব কলকজা নষ্ট করিয়া দেন, তবে আমরা পুনরায় আদিম অসভ্য হইব। একজন অতি নীচ হিন্দু অপেক্ষা এক সাধারণ ইউরোপীয় অধিকভাবে পশুর জীবন যাপন করে। রাজাদের প্রমোদকানন ছাড়া ভারতের সর্ব্বত্র আমি এক পবিত্র ভাব দেখিলাম। হিন্দুরা যে যোগ সত্যলাভে লাগাইয়াছে, আমরা তাহা জড়বিজ্ঞানে ও ইয়াঙ্কিরা তাহা সমাজে দিয়াছে।"

কাইসারলিং ভাবী সমাজ সম্বন্ধে অতি সুন্দর চিন্তা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তবাণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর সহিত তাহার খুব সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া আমরা তাহা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলেন—"আমাদের প্রত্যেককেই কৃষ্ণ, বা বুদ্ধ হইতে হইবে। মানুষ আজ তাঁহাদিগকে আদর্শ বলিয়া দূরে রাখিয়া সম্মান করিলে চলিবে না। প্রত্যেকের জীবনে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষ যাহা হইতে পারে তাঁহাদের জীবনে তাঁহারা আমাদের তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে কোন ধর্ম্ম, দর্শন বা মহাপুরুষ জগতে একাধিপত্য করিতে পারিবে না। খ্রীষ্টানেরা সমগ্র জগৎকে পাশ্চাত্যভাবান্বিত করার দুরাশা ছাড়িয়া দিক। সমগ্র জগৎ কখনও হিন্দু বা খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, অথচ প্রত্যেক ধর্ম্মই পূর্ণতা লাভ করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে মানুষ কোন ত্রাণকর্ত্তার উপর বিশ্বাস না করিয়া নিজেই নিজের ত্রাণকর্ত্তা হইবে। কারণ মানুষ যত পবিত্র ও উন্নত হইবে, ততই অন্তরে বুদ্ধ খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে। পশ্চিমের সভ্যতা এক সময় এত উন্নত হইবে যে, আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণদের মত জীবন যাপন করিব। আমরা জড়বিজ্ঞানে যেমন উন্নত, হিন্দুরা আধ্যাত্মিকতায় ঠিক তত উন্নত। আমরা বহির্জগতে যেমন স্বাধীন, হিন্দুরা অন্তর্জগতে তেমনি স্বাধীন। ভাবী সমাজ যাহা হইবে, আমেরিকায় তাহার কিছু আভাস পাইলাম। শুধু সামাজিক স্বাধীনতা আদর্শ না করিয়া ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সর্ব্ব বিষয়ে তাহারা স্বাধীনতাকে

মূলমন্ত্র করিয়াছে। প্রত্যেকে, প্রত্যেকের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া অপর সকলকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে ও সম্মান করিবে। কনসার্টে যেমন সব রকম সুর তান মান এক উচ্চ সঙ্গীতের সৃষ্টি করে, তেমনি সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে সমন্বয়, ঐক্য বা অদ্বৈতকে ভবিষ্যৎ আদর্শ করিবে"।

তেইশ

কনফুসিয়াস*

প্রাগোক্ত যুগে যে সকল ধর্মগুরু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কনফুসিয়াস তাঁহাদের অন্যতম। চীনের ধর্মসমাজে ঋষি লাউৎজের পরেই তাঁহার স্থান। কনফুসিয়াস ছিলেন লাউৎজের কনিষ্ঠ সমসাময়িক। উভয় ঋষির মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা চৈনিক সাহিত্যে অদ্যাপি বর্তমান। কনফুসিয়াস কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই। উপাসনা, পূজা, ঈশ্বর বা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মবিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন। নৈতিক জীবন গঠনই তাঁহার প্রধান বাণী। সেইজন্য কনফুসিয়াস শাস্ত্রে এই উপদেশটী ছয় বার উল্লিখিত আছে—"যাহা তোমার প্রতি কেহ করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, তাহা অপরের প্রতি কখনও করিও না।"

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫২ অব্দে কনফুসিয়াস চীনের শাটাং প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন জনৈক বৃদ্ধ সৈনিক। সত্তর বৎসর বয়সেও তাঁহার কোন পুত্রলাভ না হওয়ায় তিনি স্বীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হন। কারণ, ঔরস পুত্র ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার অন্য কেহ উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে না। অবশ্য তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে নয়টী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল

* উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩

এবং একটী উপপত্নীর গর্ভে দুইটী পুত্রও ছিল। কিন্তু শাস্ত্রমতে ইহাদের কেহই পিতার শেষানুষ্ঠান বা পারিবারিক পূজার যোগ্য হইতে পারে না। বৃদ্ধ প্রথমা (বিবাহিতা) পত্নীকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত কুং বংশের সন্তান। তিনি সমানভাবে কোন উচ্চ বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ইয়েন বংশের কোন ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলেন। এই ব্যক্তির তিনটী কন্যা ছিল। পিতা কন্যাত্রয়কে ডাকিয়া সমাগত বৃদ্ধ সৈনিকের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। পিতার নিকট পরিণয়াকাঙ্ক্ষীর দোষগুণ শ্রবণান্তে প্রথম কন্যাদ্বয় মৌন রহিল। তৃতীয় কন্যা চিংশে অগ্রসর হইয়া পিতাকে প্রণামপূর্বক সম্মতিসূচকভাবে বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আমাদের অনুমতি অপেক্ষা করিতেছেন কেন? আপনিই আমাদের একজনকে মনোনীত করুন।" পিতা উত্তর করিলেন, "তুমিই নির্বাচিতা হইলে।" বিবাহের এক বৎসর পরে অষ্টাদশবর্ষীয়া পত্নীর গর্ভে বৃদ্ধ সৈনিকের যে পুত্রলাভ হয় তিনিই জগৎবরেণ্য কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াসের পঞ্চসপ্ততিতম ও ষষ্ঠসপ্ততিতম বংশধরগণ অদ্যাপি একই স্থানে সসম্মানে বাস করিতেছেন।

চিংশের পুত্রের আদি নাম কনফুসিয়াস ছিল না। প্রকৃতপক্ষে কনফুসিয়াস জীবনেও তাঁহার এই নাম শোনেন নাই। তাঁহার আসল নাম ছিল কুং ফুং জে। ষোড়শ শতাব্দীতে চীনে যে জেসুট পাদ্রীগণ ছিলেন তাঁহারা কুং ফুং জে শব্দের লাটিন বানান ও উচ্চারণ করিলেন কনফুসিয়াস। এই নামেই চৈনিক ঋষি বিশ্ববিখ্যাত। উক্ত জেসুট পাদ্রীগণ রোমের পোপের নিকট কনফুসিয়াসের নাম ক্যাথলিক চার্চের সন্ততালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কুং ফুং জে নামের কুং শব্দের অর্থ আচার্য। কিন্তু এই নাম তাঁহাকে জন্মকালে দেওয়া হয় নাই। কিন্ (বা ছোট পাহাড) নামেই কনফুসিয়াস প্রথমে অভিহিত হন। তাঁহার মস্তকটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল অথবা তাঁহার জন্মস্থানে একটী ক্ষুদ্র পাহাড ছিল বলিয়াই হয়ত লোকে তাঁহাকে কিন্ বলিত। বাল্যকালেই তিনি দ্বিতীয় নাম চুং নি প্রাপ্ত হন। চুং নি শব্দের অর্থ দ্বিতীয় পর্বত 'নি'। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম ছিল 'প্রথম পর্বত নি'। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্ম

পিতাব উপপত্নীর গর্ভে। সু.াং বাল্যকালে কনফুসিয়াসের প্রকৃত নাম ছিল চুং নি। পরবর্তীকালে শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, বাল্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হয়। তিনি যখন মাতৃগর্ভে শায়িত, তখন চিংশেব নিকট দেবদূত আবির্ভূত হইয়া বলেন, "তোমাব গর্ভে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহার অলৌকিকী প্রতিভা থাকিবে।" কিলিন নামক দেবপশু আসিয়া এক প্রস্তরখণ্ড চিংশেব সম্মুখে স্থাপন করিলেন। উক্ত প্রস্তরে খোদিত ছিল—"তোমার পুত্র সিংহাসনশূন্য সম্রাট হইবে।" চীনে প্রবাদ আছে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক পর্বতগুহায় তাঁহার জন্ম হয়।

কনফুসিয়াসের জন্মকালে চীনের সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল ছিল। তখন চু রাজবংশ পতনোন্মুখ। দেশেব বিভিন্ন রাজবংশেব মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত। রাজকর আদায়কারী কর্মচারিগণের অত্যাচাবে প্রজাগণ উৎপীড়িত হইতেছিল। শাসনবিভ্রাটে এত অরাজকতা সৃষ্ট হইয়াছিল যে, কনফুসিযাসেব জীবিতাবস্থায় দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। একদা শিষ্য-সমভিব্যাহারে কনফুসিয়াস তাই (Tai) পর্বতের পার্শ্ব দিযা অরণ্যপথে ধীব পদবিক্ষেপে যাইতেছিলেন। এমন সময় অদূরাগত ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শব্দের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলেন, এক শোকাতুরা নারী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। কেন সে এই জনশূন্য স্থানে কাঁদিতেছে— এই প্রশ্নের উত্তরে রোরুদ্যমানা নাবী কহিলেন, "আমার পতি, তাঁহার পিতা এবং আমার একমাত্র পুত্র ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইযাছে। অত্যাচারী শাসকেব ভয়ে এই বিপদসঙ্কুল স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।" ঋষি কনফুসিয়াস শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্বক বলিলেন, "দেখ, ব্যাঘ্র অপেক্ষা অত্যাচারী শাসক অধিকতর ভীতিপ্রদ।" কনফুসিয়াসের বাল্যকালেব বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তাঁহার শিক্ষক যখন দেখিলেন যে, বালক তাঁহাব সকল বিদ্যা অচিরে আয়ত্ত করিয়াছে তখন তিনি ছাত্রকে স্বীয় বিদ্যালয়ে পড়াইতে অনুমতি দিলেন। কনফুসিয়াস নিজমুখেও

বলিয়াছেন, "পনের বৎসর বয়সে আমার মন জ্ঞানার্জনে নিরত ছিল।" কন্‌ফুসিয়াস যৌবনে সুদক্ষ শিকারী, সুনিপুণ সারথি এবং সুপটু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কেহ বলেন—তাঁহার জন্মের পূর্বে, আবার কেহ বলেন জন্মের তিন বৎসর পরে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সেইজন্য স্কুলের ছুটির পর পরিশ্রম করিয়া তিনি অর্থোৎপার্জন করিতেন পরিবার প্রতিপালনের জন্য। ক্ষুদ্র পরিবারের আয়-বৃদ্ধির জন্য মাছ ধরা, শিকার করা প্রভৃতি বৃত্তি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ঋষি কন্‌ফুসিয়াস লু রাজ্যে বাস করিতেন। সেই রাজ্যে সতের বৎসর বয়সে তিনি একটী সরকারী পদ প্রাপ্ত হন। পদটি উচ্চ না হইলেও সম্মানার্হ ছিল। তিনি রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন এবং সরকারী ভূমির তদন্ত করিতেন। কর্তব্যকর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। এই নিষ্ঠার দ্বারা তিনি কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একবার এক ভূমিখণ্ড লইয়া কয়েকটি প্রজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধ মীমাংসা উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের প্রথম বক্তৃতা। বিবাদকারিগণের নিকট বিবাদের অনাবশ্যকতা প্রদর্শনের ছলে তিনি জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। কন্‌ফুসিয়াস জীবনদর্শনের যে উদার নীতি প্রদান করিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। বিবদমান প্রজাদিগকে সময়ে সময়ে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাই জীবননীতির সার্বভৌমিক সূত্ররূপে চীনে পরিগৃহীত। তাঁহার সাত শতাব্দী পূর্বে ইহুদী ধর্ম্মগুরু মুশা এবং ছয় শতাব্দী পরে যীশুখ্রীষ্ট যে নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা কন্‌ফুসিয়ান নীতির ব্যাখ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন তাঁহার বয়স সতের কি আঠার বৎসর মাত্র ছিল। সেই অল্প বয়সেই তিনি জীবনতত্ত্বের যে দিব্যালোক লাভ করিয়াছিলেন তাহাই সামাজিক জীবনের ভিত্তিরূপে এখনও চীনদেশে বর্তমান। তাঁহার উপদেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, যৌবনেই তিনি তাঁহার জীবনের লক্ষ্য অবগত হন। কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তাঁহার আয়বৃদ্ধি হইল এবং সমাজের জনৈক অধিনায়করূপে তিনি পরিগণিত হইলেন।

উনিশ বৎসর বয়সে কন্‌ফুসিয়াস বিবাহিত হন। বিবাহেব এক বৎসর পরে খৃষ্টপূর্ব ৫৩১ অব্দে তাঁহার এক সন্তান লাভ হয়। তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কন্‌ফুসিয়াস সাহিত্যের একটিমাত্র স্থানে উল্লিখিত আছে যে, তৎপুত্র মাতার মৃত্যুতে যখন শোকসন্তপ্ত হন তখন পিতা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছেন। লু ষ্টেটের সরকারী শাসক তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার জন্মোৎসবকালীন ভোজে উক্ত ডিউক তাঁহাকে দুইটি দুষ্প্রাপ্য শুভ মৎস্য উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। শিষ্টাচারে কন্‌ফুসিয়াস অতিশয় কৌশলী ছিলেন। ডিউকের উপহারপ্রাপ্তির স্মৃতিচিহ্নরূপে তিনি স্বীয় পুত্রের নামকরণ করেন লি। চীনা ভাষায় লি শব্দের অর্থ পবিত্র মৎস্য। যে সময়ে কন্‌ফুসিয়াস পুত্রলাভ করেন সেই সময় বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। প্রবাদ আছে, কনফুসিয়াসের দুইটি কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের প্রায় চারি বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে। এই সময়েই তাঁহার মাতা পরলোকে গমন করেন। চৈনিক প্রথা অনুসারে পুত্রকে মাতার বা পিতার মৃত্যুতে দীর্ঘকাল শোক প্রকাশ করিতে হয়। কন্‌ফুসিয়াস প্রায় সাতাইশ মাস মাতার কবরের পার্শ্বে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র চব্বিশ বৎসর। তাঁহার মাতা চিংশে কন্‌ফুসিয়াসের নিকট মাতা ও পিতা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে পিতার লোকান্তর হওয়ায় মাতা পুত্রের অবিচ্ছেদ্য অভিভাবিকা হইয়াছিলেন। মাতার মৃত্যুতে কন্‌ফুসিয়াস জীবন-পথে অন্ধকার দেখিলেন এবং তাহাতে দীর্ঘকাল শোক করার জন্যই সম্ভবতঃ পত্নীর সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ ঘটে।

মাতার মৃত্যুর পরই তাঁহার জীবনের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রচার কার্যের জন্য যৌবনেই তিনি পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করেন। এই সময়ে কয়েকটি শিষ্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়াই তিনি প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের ভ্রমণকাহিনী একেবারে অজ্ঞাত। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করিয়া প্রচার করাই ছিল তাঁহার জীবনব্রত। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সহজ সরল ভাষায়

এমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া স্বদেশের পুরাতন জ্ঞানকে তিনি ব্যাখ্যা করিতেন যে, জনসাধারণ তাহা শুনিবার জন্য দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। চীন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর দৈনিক জীবনে কনফুসিয়াসের নীতিবাক্য বহু শতাব্দী যাবৎ যে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। চীনদেশের অন্য দুই ধর্মগুরু লাউৎজে ও বুদ্ধদেব অবশ্য দেশের সর্বত্র সম্পূজিত হইয়াছেন। তথাপি চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা কনফুসিয়াসের পদানুগ বলিলেই যথার্থ হয়। একুশ কিংবা বাইশ বৎসর বয়সেই তিনি স্বদেশে তাঁহার নীতির প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। সরকারী পদত্যাগ ও পত্নীবিসর্জন করিয়া কেন যে তিনি পরিব্রাজক-আচার্যের অনিশ্চিত জীবন গ্রহণ করিলেন তাহা নিশ্চিতভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। কোন দৈব আদেশ তাঁহাকে ঐ পথে চালিত করিয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে? আচার্য্যের জীবন গ্রহণ করিবার পূর্বে যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি জগৎগুরুগণ যে সাধক-জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহা কনফুসিয়াসের জীবনে মাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সময়ই ঘটিয়াছিল। কখনও পদব্রজে, কখনও বা গরুর গাড়ীতে চড়িয়া তিনি বিশাল চীন দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং জনসাধারণকে নৈতিক আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন। প্রায় তিন সহস্র শিষ্য তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতেন। দুই শতাব্দীর পরে গ্রীস দেশে এ্যারিষ্টটলও এই ভাবে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কনফুসিয়াস শুধু নৈতিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; কবিতা, সঙ্গীত, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন। ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের মত কনফুসিয়াস চীন সমাজে, সম্ভবতঃ মানবসমাজেই, সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করেন। প্রাচীন ধর্মপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি কখনও কোন কথা বলেন নাই। বরং এই সকল প্রথা পরিপালনের দিকেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন, বিদ্রোহসূচক আন্দোলন, অপ্রাকৃতিক ঘটনা ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতেন না। এই চারিটী বিষয় প্রশ্ন করিলে তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অধিক হইলেও প্রত্যেক শিষ্যের সহিত তাঁহার

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু দবিদ্র শিক্ষার্থী গ্রহণে তিনি কখনও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কাছে ধনী ও দরিদ্র শিক্ষার্থী সমান সুবিধা ভোগ করিত। শিক্ষার্থিগণকে তিনি অধ্যয়নশীল ও ধর্মপবায়ণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। যে সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন তন্মধ্যে সমাজবিজ্ঞানই ছিল তাঁহাব অধিকতম প্রিয়। কাবণ, দেশের শাসন ও সমাজের সংস্কাব পদ্ধতির উন্নতিসাধনই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য যে শিক্ষার্থী শাসন বা সংস্কার কার্যে এবং বাগ্মিতা সাধনে আগ্রহান্বিত হইতেন তিনিই তাঁহাব প্রিয় হইতেন।

কন্‌ফুসিয়াসের ব্যক্তিগত উদাহরণই ছিল তাঁহার শিষ্য শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। তিনি রেশমী কাপড পরিতেন না বা দুগ্ধ পান করিতেন না—এমন অনাড়ম্বর ও সরল জীবন তিনি যাপন করিতেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—"তুলার কাপড়ই আমি পরিধান করি। তাহার কাবণ রেশমী কাপড় মূল্যবান ও সাধারণের দুষ্প্রাপ্য এবং উহার গ্রহণে রেশমী পোকার প্রাণনাশ হয়। বাছুরকে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত কবিয়া উহা পান করিতে ইচ্ছা করি না। উভয় কার্যই নীতিবিরুদ্ধ।" এই জন্য তিনি নিজে অতিশয় গর্ব অনুভব করিতেন। শিক্ষকরূপে তিনি কৃতকার্য হইলেও শিক্ষকতা যে তাঁহার জীবনব্রত তাহা তিনি সম্যক ভাবে বুঝিতেন না। তিনি স্বীয় ভাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কখনও কখনও উচ্চ সরকারী পদ অন্বেষণ করিতেন। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে অধিকতর অর্থাগম হইবে—এই চিন্তা তাঁহাব মনে কখনও স্থান পায় নাই। নীতিমূলক শিক্ষা প্রচারোপলক্ষে একবার পার্শ্ববর্তী ষ্টেটে গমন করিয়া তিনি বৃদ্ধ ঋষি লাউৎজের দর্শনলাভ করেন। লাউৎজেও কোন উপদেবতায় বা অলৌকিক ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না। উভয় ঋষি নৈতিক্ আদর্শ প্রচারে একমত। এই জন্যই মনে হয়, কন্‌ফুসিয়াস লাউৎজেকে দর্শন করিতে যান। উভয়ের যখন প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় তখন কন্‌ফুসিয়াসের বয়স চৌত্রিশ বৎসর এবং লাউৎজের বয়স চৌরাশি বৎসর। এই সময়টী ধর্মজগতের পক্ষে অতি শুভ ও দিব্য। কারণ,

লাউৎজে ছিলেন জোরোয়াস্তার, বুদ্ধ, মহাবীর, জেরেমিয়া ও এজাকিয়েলের সমসাময়িক। এতগুলি মহাপুরুষের যুগপৎ আবির্ভাবে মর্ত্যলোক তখন নিশ্চয়ই অমর ধামে পরিণত হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতে অগ্রজ ঋষি অনুজ ঋষিকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন। ইহাতে কনফুসিয়াস স্বীয় দৈন্য অনুভব করিয়া লাউৎজের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব লইয়া প্রত্যাগমন করেন। উভয় আচার্যের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৭ অব্দে পুনরায় সাক্ষাৎ ও বিতর্ক হয়। বিতর্কের কারণ এই যে, উভয়ের বাণীর মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। লাউৎজের মতে ঘৃণা একমাত্র প্রেমের দ্বারা অভিভূত হয় এবং অসৎ সতের দ্বারা পরাস্ত হয়। কিন্তু কনফুসিয়াস বলেন, "অন্যায়ের প্রতিদান করিবে অন্যায়ের দ্বারা, ভদ্রতার প্রতিদানও ভদ্রতা।" লাউৎজের বাণীর সহিত যীশুখ্রীষ্টের এবং কনফুসিয়াসের উপদেশের সহিত মুশার উপদেশের সাদৃশ্য আছে। অবশ্য, কনফুসিয়াস কখনও অন্যায় আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত নীতি সামজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির সহিত সমসুরে বদ্ধ না হইলে রাজকীয় শাসন অসম্ভব হয়। অনিষ্টের পরিবর্তে ইষ্ট করিলে অর্থাৎ সকল অনিষ্ট ক্ষমা করিলে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। অসৎ ব্যক্তিগণই তখন সমাজের সকল সুবিধা উপভোগ করিবে। বিশৃঙ্খল সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনই ছিল কনফুসিয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য তিনি উক্ত আদর্শের অনুকূল নীতি প্রচার করেন। বুদ্ধ, লাউৎজে ও কনফুসিয়াস—চীনের এই ঋষিত্রয় তত ঈশ্বরবিশ্বাস প্রচার করেন নাই; তথাপি তাঁহারা ঈশ্বরবৎ দেশের সর্বত্র পূজিত।

পুরাতন ধর্মপ্রথা ও সামাজিক নীতি প্রবর্তনের দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন কনফুসিয়াস। কিন্তু লাউৎজে এই কার্যের সমর্থক ছিলেন না। সেইজন্য তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সমসাময়িককে ভর্ৎসনা করেন। যুবক সংস্কারক তাহাতে অপ্রতিভ ও অনুৎসাহিত হন। লাউৎজে কনফুসিয়াসকে তাও-তত্ত্বের উপদেশ দেন। তাহাতে কনফুসিয়াস প্রত্যুত্তর করেন যে, বিংশ বৎসর তিনি তাও অন্বেষণ করিয়া সফলকাম হন নাই। গৃহে ফিরিবার পথে কনফুসিয়াস তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন, "পাখী কিরূপে আকাশে উড়ে, মাছ কিরূপে জলে

সাঁতার দেয় এবং পশুরা কিরূপে বনে বিচরণ করে আমি জানি। কিন্তু ড্রাগন (Dragon) কিরূপে হাওয়ায় চড়িয়া মেঘের উপর উঠে এবং স্বর্গে যায় তাহা জানি না। আমি লাউৎজেকে দেখিলাম। তাঁহাকে ড্রাগনের মত অদ্ভুত ও অবোধ্য মনে হইল।" চার্লস ফ্রান্সিস পটার (Potter) তাঁহার The Story of Religions গ্রন্থে কন্‌ফুসিয়াসকে মানব ধর্মের আদি আচার্যরূপে নির্দেশ করেন। এইচ্. এ. গাইল্‌স তাঁহার Confucianism and its Rivals গ্রন্থে কন্‌ফুসিয়াসকে লাউৎজে অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। গাইল্‌সের মতে কন্‌ফুসিয়াস লাউৎজের সত্য ধর্মকে কল্পনালোকে না রাখিয়া ব্যবহারিক জীবনে টানিয়া আনিয়াছেন। সুটহিল (Soothill) তাঁহার Three Religions of China গ্রন্থে এবং ডাঃ আর. ই. হিউম্‌ তাঁহার The Worlds Living Religions গ্রন্থে উভয় ঋষির মতবাদের মূলগত পার্থক্য দেখাইয়াছেন। দৈনিক জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ। আরও সতের বৎসর তিনি পর্য্যটক প্রচারকের জীবন অতিবাহিত করেন। সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন একান্ন বৎসর বয়সে তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ হয়। তিনি এই বৎসর লু ষ্টেটের ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসনপদ্ধতি এত সুন্দর ও সফল হয় যে, অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রথমে মিনিষ্টার অব্ ওয়ার্কস এবং পরে মিনিষ্টার অব্ জাষ্টিস্‌ পদে উন্নীত হয়। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি প্রমাণিত করিলেন, তাঁহার শাসনপ্রণালী কত কার্য্যকরী। শুধু লু ষ্টেটে নহে, অন্যান্য ষ্টেটের সহিত আদানপ্রদানেও তাঁহার মত ও পদ্ধতি পরিগৃহীত ও সফল হইল। তাঁহার শাসনে লু ষ্টেটে এবং অন্যত্র অচিরে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয়। তৎপূর্বে সরকারী কর্মচারিগণের প্রধান কর্তব্য ছিল খাজনা আদায়। তিনি শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখাইলেন, প্রজার ও দেশের হিতসাধনে কর্মচারিগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিলেই শান্তি স্থাপন অবশ্যম্ভাবী এবং দমনের দ্বারা শৃঙ্খলা স্থাপন অসম্ভব। কন্‌ফুসিয়াস শাসন কৌশলে তৎকালীন চীনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লু ষ্টেটের পার্শ্ববর্ত্তী চু ষ্টেটে এক সময় শাসনশৃঙ্খলা ভগ্ন হয়। চু ষ্টেটের ডিউক স্বীয় মন্ত্রিগণের বশবর্ত্তী

হওয়ায় এই বিশৃঙ্খলা ঘটে। এইজন্য ডিউকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে না ভাবিয়া ডিউকের দুশ্চিন্তা হয় এবং তিনি কন্‌ফুসিয়াসের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করেন, 'রাজ্যশাসনের কৌশল কি?' কন্‌ফুসিয়াস বলেন, "যখন রাজা রাজা থাকেন, প্রজা প্রজা থাকেন, মন্ত্রী মন্ত্রী থাকেন, পিতা পিতা থাকেন, এবং পুত্র পুত্র থাকেন তখন রাজ্য সুশাসিত হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি।" অন্য সময়ে একই প্রশ্নের উত্তরে কন্‌ফুসিয়াস বলেন, "অদম্য উৎসাহ এবং কর্তব্যকর্মে একনিষ্ঠতাই রাজধর্ম।" কিন্তু তিনি মাত্র চারি বৎসর তাঁহার রাজনীতি কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। লু ষ্টেটের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া চু ষ্টেটের প্রজাগণ ও কর্মচারীগণ ঈর্ষান্বিত হন। তাঁহারা ডিউক ও কন্‌ফুসিয়াসের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইবার ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা আশিজন সুন্দরী সুগায়িকা ও নৃত্যকুশলা যুবতী লু ষ্টেটের ডিউকের নিকট প্রেরিত হইল। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ডিউক বারবনিতা-গণকে লইয়া রাজকার্য অবহেলা করিলেন। শত্রুগণের ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইল। দীর্ঘ চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রমে কন্‌ফুসিয়াস যে শাসন-সৌধ নির্মাণ করিয়া-ছিলেন তাহার ভিত্তি স্থানচ্যুত হইল। তিন দিন চেষ্টা করিয়াও কন্‌ফুসিয়াস ডিউকের সাক্ষাৎ পাইলেন না। রাজকীয় ক্রিয়াদি তাঁহার অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হইল। তাঁহার পরিশ্রম পণ্ড হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইল এবং তিনি পদত্যাগ করিলেন। অন্য কোন ষ্টেটে ধর্মভীরু শাসকের অধীনে কর্মগ্রহণের চেষ্টায় তিনি দীর্ঘ তের বৎসর বৃথা অপেক্ষা করিলেন। সুশাসনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের যে স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখিয়াছিলেন তাহা চিরতরে নষ্ট হইল। দেশ হইতে মৃত্যুদণ্ড দূর করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এক শতাব্দী সুশাসন চলিলে দেশে আদর্শ সমাজ নিশ্চিতই গড়িয়া উঠিবে। জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি শহর হইতে শহরান্তরে উপযুক্ত শাসকের সন্ধানে ঘুরিলেন; কিন্তু কোন শাসকই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে নিরাশ অন্তঃকরণে তিনি স্বগৃহে আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর। এখন হইতে ৭২ বৎসর বয়সে

মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রন্থপ্রণয়নে অতিবাহিত করেন। তৎপ্রণীত নীতিশাস্ত্রে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার নিহিত।

চীনা সাহিত্যের নয়খানি বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত কন্ফুসিয়াসের নাম বিজড়িত, তন্মধ্যে পাঁচখানির নাম 'কিং' এবং অন্য চারখানি নাম 'শূ'। পঞ্চ কিং গ্রন্থের নাম শূ কিং (ইতিহাস), শি কিং (কবিতা), আই কিং (বিকারতত্ত্ব বা পরিবর্তনরহস্য), লি কি কিং (স্বাধিকার বিজ্ঞান) এবং চুন চিউ কিং (বসন্ত ও শরৎ ঋতুর কথা)। হিয়াও কিং-কে কখনও কখনও ষষ্ঠ কিং বলা হয়। পুত্রের কর্তব্যই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই গ্রন্থ ছয়খানির মধ্যে সম্ভবতঃ পঞ্চমখানিই তাহার রচিত। ইহাতে স্বীয় ষ্টেটের নীরস ইতিবৃত্ত বিবৃত। অন্য কিং পঞ্চকের তিনি বোধ হয় সংগ্রাহক ও সম্পাদক মাত্র। কোন কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থ পঞ্চকের সঙ্গে তাঁহার এইটুকু সম্বন্ধও অস্বীকার করেন। শি-গ্রন্থ-চতুষ্টয় পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত। কিং গ্রন্থাবলীকে চীন দেশের ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট এবং শূ গ্রন্থাবলীকে নিউ টেষ্টামেণ্ট বলা চলে। তাঁহার শিষ্য ও সমসাময়িকগণের সঙ্গে তাঁহার যে কথাবার্তা হইত সেইগুলি এবং অন্যান্য ধর্মনীতি ও রাজনীতি-মূলক বাক্যাবলী শূ গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। প্রথম শূ গ্রন্থের নাম তা সিও। ইহাতে অপরা বিদ্যা বা ধর্মনীতি ব্যাখ্যাত। দ্বিতীয় শূ গ্রন্থের নাম চুং যুং। ইহাতে মধ্যপন্থার সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচিত। এই মতই ভগবান বুদ্ধ প্রচার করেন। লুন্ যুং তৃতীয় গ্রন্থ। ইহাতে কন্ফুসিয়াসের নীতি-উপদেশগুলি সংগৃহীত। এই গ্রন্থখানিই সর্বাপেক্ষা পাঠক-প্রিয় এবং বিদেশে প্রসিদ্ধ। মেংটুজে নামক চতুর্থ গ্রন্থে মেনসিয়াসের রচনাবলী বিদ্যমান। মেনসিয়াস কন্ফুসিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ টীকাকার। এই নয়খানি পুস্তক বহু শতাব্দী যাবৎ চৈনিক জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী পরীক্ষার্থিগণকে চীনের প্রসিদ্ধ পরীক্ষাগৃহে বসিয়া যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহার পাঠ্য পুস্তক এই সকল গ্রন্থ। এই গ্রন্থাবলী রচনায় ও সংগ্রহে চৈনিক ঋষি যে প্রতিভা

প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অসাধারণ। প্রাচীন জ্ঞানরাশি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তিনি সেই রত্নগুলি জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করিয়া চীনদেশে নবযুগ, নবচেতনা, নবজাগরণ আনয়ন করেন। চৈনিক শিক্ষার আদিগুরু ছিলেন কন্‌ফুসিয়াস। অদ্যাপি চীনের সর্বত্র তাঁহার গ্রন্থাবলী সাদরে পঠিত, কণ্ঠস্থ ও উদ্ধৃত হয়। ঐহিক বুদ্ধির প্রখরতা তাঁহার উপদেশের বৈশিষ্ট্য। কয়েকটী উপদেশ এখানে দেওয়া হইল।—"যাহা সমাপ্ত তাহার কথা আমি বলি না। যাহা মীমাংসিত, সেই বিষয় আমি আলোচনা করি না। যাহা অতীত, আমি তাহার দোষ দর্শন করি না।" "প্রাচুর্যহীন উচ্চ পদ, শ্রদ্ধাশূন্য ক্রিয়া, ব্যথাবর্জিত শোক অর্থহীন।" "নিজের মধ্যে যাহা আছে, তাহার অবহেলা, বিদ্যার্জনে ঐকান্তিকতার অভাব, কর্তব্যপালনে অক্ষমতা এবং স্বদোষ দূরীকরণে অসামর্থ্য—এই কয়েকটীতেই আমার দুঃখ হয়।" "অধিক শ্রবণান্তে সদুপদেশগুলি বাছিয়া লইয়া পালন এবং অধিক দর্শনান্তে উহার সার ভাবনা—এই দুইটী জ্ঞান লাভের নিম্নেই অবশ্য কর্তব্য।" "প্রাচীনদিগকে শান্তি দাও, মিত্রগণের বিশ্বাস রক্ষা কর এবং তরুণগণের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হও।" "চিত্তকে কবিতা জাগ্রত করে, সদাচার উন্নত করে, এবং সঙ্গীত প্রফুল্ল করে।" "যিনি ভদ্র তিনি স্বীয় দোষ দেখেন, এবং যিনি অভদ্র তিনি অপরের দোষ দেখেন।" "শঠবাক্যে মন দিশাহারা হয়; সামান্য বিষয়ে অধীর হইলে বৃহৎ সংকল্প নষ্ট হয়।" "অনেকের অবজ্ঞার বা বহুর বন্ধুত্বের কারণানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য।" "সতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও দোষকে জড়াইয়া ধরাই সর্বাপেক্ষা দোষণীয়।" "বিদ্যার উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ নাই।" "সহজবোধ্য হওয়াই বক্তৃতার চরম লক্ষ্য।" "ভদ্র ব্যক্তি এই নয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন—স্পষ্ট ভাবে দেখা, শ্রুত বিষয় নিঃসন্দেহে বোঝা, ব্যবহারে শিষ্টাচার, আচরণে আত্মসম্মান রক্ষা, বাক্যে প্রমাদহীনতা, কর্মে কুশলতা, সন্দেহস্থলে জিজ্ঞাসা, ক্রোধের সময় বিপদের ভাবনা এবং লাভকালে সত্য-নিষ্ঠা।"

নৈতিক উপদেশ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী অনেক বিষয় কন্‌ফুসিয়াস বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত বিকাশের অনুকূল অবস্থা

সৃষ্টি করাই আদর্শ সমাজের উদ্দেশ্য। মানুষকে আত্মবিকাশে উদ্বুদ্ধ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। ইহার জন্য তিনি সঙ্গীত, কবিতা, বাণবিদ্যা ও অনুষ্ঠানাদির উপর যত জোর দিতেন ধর্মের উপর তত নহে। তিনি কবিতার উদ্বোধনী শক্তিতে অসীম বিশ্বাস করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মানুষ্ঠানেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ ইহাতে মানুষের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ হয়। তিনি বলিতেন—সঙ্গীতের দ্বারা উচ্চ চিন্তা জাগ্রত হয়। তাঁহার একটী বাঁশী ছিল। শিক্ষাদান বা গ্রন্থরচনার পূর্বে তিনি সেই বাঁশীটী বাজাইতেন, তাহাতে তাঁহার মন কর্মে একাগ্র হইত। লি কি গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—"যখন সঙ্গীত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, সঙ্গীতের সুরে যখন হৃদয় ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সৎ, মহৎ ও ভদ্র হৃদয় সহজে বিকশিত এবং আনন্দে বিহ্বল হয়। এই আনন্দ হইতে প্রশান্ত ভাব প্রসূত হয়। এই প্রশান্ত ভাবস্রোত নিরবচ্ছিন্ন হয়। তাহার ফলে মানবের অন্তর স্বর্গে পরিণত হয়।" পারলৌকিক জীবনের জন্য চিন্তিত না হইয়া ঐহিক জীবনের উন্নতিসাধনে তৎপর হইতে তিনি শিষ্যগণকে উৎসাহিত করিতেন। বজ্রধ্বনি শুনিলে বা শোক-সূচক পরিচ্ছদ দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। শোনা যায়, তিনি খুব কর্মরত থাকিতেন এবং তাঁহার মুখে ভীতির ভাব লক্ষিত হইত। এত সাবধান ও সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি পদবিক্ষেপ করিতেন যে, তাঁহাকে চলিতে দেখিলে লোকে ভাবিত, তাঁহার পদযুগল যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ। কথিত আছে, তিনি বিচারালয়ে নিম্নপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সরলভাবে মিশিতেন। উচ্চপদস্থ লোকের সহিত সম্মানভরে এবং রাজার সহিত শান্তভাবে তিনি আলাপ করিতেন। লুন্ য়ূ নামক চতুর্থ য়ূগ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে তাঁহার আকৃতি এবং স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—"কনফুসিয়াস অতিশয় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কখনও বেগুনী বা লাল রঙের কাপড় পরিতেন না, এমন কি স্বগৃহেও নহে। গ্রীষ্মকালে তিনি লিনেন-নির্মিত ওভারকোট ব্যবহার করিতেন। ছাগলের চামড়ার সঙ্গে কাল কাপড়, হরিণের চামড়ার সহিত সাদা কাপড় এবং শৃগালচর্মের সহিত পীতবস্ত্র তিনি পছন্দ করিতেন। বাড়ীতে যখন থাকিতেন তখন পশুলোমের একটী লম্বা কোট পরিতেন। তাঁহার নৈশ পোষাক শরীরের অর্দ্ধেক লম্বা ছিল। শীতকালে

শরীরকে গরম রাখিবার জন্য শৃগাল-চর্মের জ্যাকেট ব্যবহার করিতেন। একমাত্র বিচারালয়ে গমন কালে তাঁহার হাতে যষ্টি থাকিত। শোকতপ্ত গৃহে গমন কালে কাল টুপী তাঁহার মাথায় শোভা পাইত না। প্রত্যেক প্রতিপদ তিথিতে সরকারী পোষাকে তিনি কোর্টে যাইতেন। উপবাস-দিবসে অনাহারী না থাকিয়া আহার পরিবর্তন করিতেন। বাসী মাছ, মাংস বা ভাত তিনি কখনও খাইতেন না। যে আহার্য তিনি ভালবাসিতেন না, তাহা যতই সুস্বাদু হউক, তিনি মুখে দিতেন না। মদ্যপানে তাঁহার কোন সংযম ছিল না। সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মদ্য পান করিতেন। তবে তিনি ক্রীত মদ্য বা বাজারে বিক্রীত মাংস খাইতেন না। কিন্তু আহারে তাঁহার অসামান্য সংযম ছিল। শয়নকালে বা আহারকালে তিনি কথা বলিতেন না। মোটা ভাত ও সামান্য তরকারী ছিল তাঁহার নিত্য আহার। মাদুরটী সোজাভাবে না পাতা হইলে তিনি তাহাতে বসিতেন না।"

কনফুসিয়াসের উপরোক্ত বর্ণনা কোন শিষ্য কর্তৃক প্রদত্ত। ইহা হইতে তাঁহার পূর্ণ প্রতিকৃতি পাওয়া অসম্ভব। কোন শিষ্য জীবিতকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। সমগ্র চৈনিক জাতি এবং চৈনিক সাহিত্যে কনফুসিয়াসের প্রভাব আজও সুগভীর। চৈনিক মন কনফুসিয়াসের ভাবে অদ্যাপি ভরপুর। কনফুসিয়াসের প্রচারক ছিলেন মেনসিয়াস। ইঁহার বিষয় চতুর্থ শূ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কনফুসিয়াসের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে মেনসিয়াসের আবির্ভাব হয়। কনফুসিয়াসের বাণী বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও দেশময় প্রচার করাই তাঁহার জীবনব্রত ছিল। মানুষ স্বভাবতঃই সৎ, অসৎ নহে—কনফুসিয়াসের এই প্রধান বাণীই মেনসিয়াস স্বদেশের দ্বারে দ্বারে প্রচার করেন। শিষ্য ছিলেন গুরু অপেক্ষা অধিকতর প্রজাতন্ত্রবাদী (Democratic)। রাজার উপরেই প্রজার স্থান। প্রজা রাজা অপেক্ষা বড়, ছোট নহে। এই মত প্রচার করিয়া মেনসিয়াস অতিশয় জনপ্রিয় হন। তাঁহার মুখ্য মত ছিল—"প্রজা তুষ্ট হইলে ঈশ্বরও তৃপ্ত হন।" মেনসিয়াস গণতন্ত্রবাদ বা সমাজতন্ত্র-বাদের মূলমন্ত্রের দ্রষ্টা। তিনি বলিতেন, "অনাহারী প্রজা কখনও সৎ ও

শান্ত হইতে পারে না। দেশের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে শিক্ষাসমস্যার সমাধান সহজসাধ্য।”

মেন্‌সিয়াস অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ছিলেন চুসিয়াস। চুসিয়াসের প্রকৃত নাম ছিল চু শি। চু শি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন এবং কন্‌ফুসিয়ান সাহিত্যের উপর বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। কন্‌ফুসিয়াসের মতবাদের উপর তিনি এত আলোক সম্পাত করিয়াছেন যে, কন্‌ফুসিয়াসবাদকে কেহ কেহ চুসিয়াসবাদ বলেন। পাপতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা চুসিয়াস করিতেন। অসৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ বা অসৎ সমস্যার সমাধান করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। আধুনিক কন্‌ফুসিয়ানিজম প্রথম প্রবর্ত্তিত নৈতিক মতবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রিয়াবহুল আনুষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হইয়াছে। এই ধর্মে এখন অসংখ্য দেবতা ও দানব স্থান পাইয়াছেন। উক্ত ধর্মে অতীতকে স্বর্ণ যুগরূপে বিশ্বাস করা হয় এবং অতীতের সুখময় স্মৃতি দ্বারা তেমনি জীবনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা হয়।

চব্বিশ

এমার্সন *

(১)

সক্রেটিশকে যেমন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা হয়, তেমনি এমার্সন নব জগৎ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষী। যদি কেহ আমেরিকার একটী মাত্র লেখককে জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার এমার্সনই পড়া উচিত। ডাঃ জে. টি. সাণ্ডার-ল্যাণ্ডের এই মন্তব্য যে কতদূর সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা

* উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৪৫

যায়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে এমার্সনেব সারগর্ভ চিন্তারাশি অতুলনীয়। সেক্সপিয়রের পরেই এমার্সনেব রচনাদি অধিকভাবে ইংরাজি ভাষায় উদ্ধৃত হয়। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলী পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই সাগ্রহে পঠিত হয় এবং জগতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে তাঁহার পুস্তকাবলী স্থান পাইয়াছে। টোকিও এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী পৃথক এমার্সন ক্লাশ আছে। এই প্রবন্ধে এমার্সনেব জীবনী ও বাণী সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

এমার্সন, হেন্‌রি থোরো ও ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান—কংকডেব এই মনীষীত্রয়েব প্রভাব মার্কিন দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু থোরো, হুইট্‌ম্যান্, এলানপো, লংফেলো, হুইটিয়ার প্রভৃতি অপেক্ষা এমার্সনই মার্কিন দেশে বেশী জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে তাঁহার প্রভাব সমধিক কিম্বা অধিকতরও বলা যাইতে পারে। র‍্যালফ ওয়াল্ডো এমার্সন বোষ্টন সহরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রিল প্রায় উনাশি বৎসর বয়সে কংকড়ে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার সাত জন পূর্ব্বপুরুষ নিউ ইংলণ্ডস্থ গির্জাসমূহের মিনিষ্টার ছিলেন। তাঁহার পিতা উইলিয়াম এমার্সন ছিলেন বোষ্টনেব একটি গির্জ্জায় পাদ্রী এবং রাল্‌ফ ওয়াল্ডো তাঁহার আটটী সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। অষ্টম বর্ষ বয়সে ওয়াল্ডোর পিতৃবিয়োগ হয়। স্বামিহীনা মাতা অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে ছেলেমেয়েদেব প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদান করেন। ১৮১৭ খৃঃ তিনি বোষ্টনে স্কুলেব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হার্ভার্ড কলেজে প্রবেশ করেন, এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পাশ করিবার পরেই বোষ্টন সহরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু স্কুলের নিয়মকানুন ও বাঁধাবাঁধির কৃত্রিম জীবন তাঁহার অসহ্য হইল। তাঁহার স্বাধীন ও ধর্ম্মপরায়ণ চিত্ত প্রকৃতির সহবাসে শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। তিন বৎসর পর এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম-প্রচার করিবার মানসে তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই ধর্ম্মভাব তাঁহার মজ্জাগত ছিল এবং ইহা তিনি পুরুষানুক্রমে

পাইয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃঃ তিনি ডাঃ চানিংএর নিকট ধর্ম্মশিক্ষা লাভের জন্য কেম্‌ব্রিজের ডিভিনিটি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে এবং যক্ষ্মারোগের আক্রমণাশঙ্কায় অধ্যয়ন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৎসর খানিক অন্যত্র তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতে হয়। স্বাস্থ্যলাভপূর্ব্বক তিনি বোষ্টনে প্রত্যাগমন করিয়া নানা গির্জ্জায় প্রায় চারি বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৮২৯ খৃঃ কংকডের এলেন টাকার নামক এক ক্ষীণকায় সুন্দরী যুবতীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কিন্তু ১৮৩২ খৃঃ তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং সেই শোকে তিনি এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, গির্জ্জার পাদ্রীপদ (অধ্যক্ষতা) ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন, গ্রন্থরচনা ও বক্তৃতাদি কার্য্যে শেষ জীবন কাটাইতে মনস্থ করিয়া তিনি বোষ্টন সহরের প্রান্তে অদূরে কংকড় নামক প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খৃঃ শরৎকালে প্লাইমাউথের লিডিয়া জাকসন নামক মহিলার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার কয়েকটী সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার নিউ ইংলণ্ডস্থ কংকডের গৃহটী পত্রপুষ্প শোভিত বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করেন। শান্তি-নিকেতন যেমন রবীন্দ্রনাথের এবং রাইডাল মাউণ্ট যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের, তেমনি কংকড় ছিল এমার্সনের সাধনার স্থান। বোষ্টন সহরের জনতা ও কোলাহল হইতে বিশ মাইল দূরে কংকড় পল্লীর নীরবতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমার্সনের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ এই পুণ্য স্থান দর্শনে গমন করেন।

কংকড়স্থ উদ্যানবেষ্টিত গৃহ ক্রয় করিবার পর তিনি এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"জমি ও বাড়ীর মূল্য আমি দিয়াছি বটে কিন্তু এই বাগানের মধ্যে কত রংএর ফুল, কত রকমের পাখী, তাঁহাদের সুমিষ্ট স্বর, এই কুলুকুলু-নিনাদিনী নদী, সুন্দর সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়—এই সকল মূল্যবান বস্তু ত আমি বিনামূল্যে পাইয়াছি।"

এমার্সন এইস্থানে শীতের ৩।৪ মাস নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন এবং বৎসরের বাকী সময় অধ্যয়ন, গভীর চিন্তা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া কাটাইতেন।

ভারতের আশ্রমে আর্য্য ঋষিগণ যেমন অন্তর্মুখীন জীবন অতিবাহিত করিতেন, তেমন ছিল কংকড়ে এমার্সনের জীবন সদা উচ্চচিন্তামগ্ন। তিনি সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্নে গৃহমধ্যে অধ্যয়ন ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং অপরাহ্নে গৃহের বাহিরে বনে বাগানে একাকী, কখনও ক্বচিৎ কোন সঙ্গীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে শিশুর ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গ করিতেন। কখনও বা নদীর ধারে ঘাসের উপর শয়ন করিয়া আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতেন এবং তখন তাঁহার মন প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যে এত তন্ময় হইত যে, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। তিনি লিখিয়াছেন যে, এরূপ শান্তি ও স্বাধীনতা, আনন্দ ও তৃপ্তি তিনি জগতের আর কোন কিছুতে পান নাই। তাঁহার জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রনশন অলকট্ বলেন, 'এমার্সনের সহিত অপরাহ্নে যিনি অন্ততঃ একবার ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি ভাগ্যবান। তখন তিনি যেন অন্য জগতের লোক হইয়া যাইতেন। তাঁহার এই সময়ের আনন্দমূর্ত্তি মানুষের হৃদয়ে নবজীবন ও নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিত। তাঁহাকে তখন দেখিলে বিশ্বাসের অনল-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত।' অন্য একজন (যিনি এমার্সনকে ভালরূপে জানিতেন) বলেন যে, এমার্সনের গৃহে সদাই প্রাতঃকাল। প্রকৃতির শিশুর ন্যায় তাঁহার মন এত সদানন্দ, সরল ও স্বাধীন ছিল যে, তাঁহার গৃহে নিরানন্দ ও অশান্তি স্থান পাইত না এবং লোকে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও সন্তপ্ত প্রাণে আসিয়া এই শান্তিধামে হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়া ফিরিত। তাই এমার্সনের লেখার মধ্যে শোক, দুঃখ ও নিরুৎসাহের কথা নাই। তিনি সকলের নিকট আশা ও উৎসাহের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

কংকড়ের ঋষি প্রথম বার ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কার্লাইল, কলেরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কার্লাইলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ও চিরস্থায়ী হয়। কার্লাইল ও এমার্সনের সাক্ষাতের সময় শোনা যায়, বহুক্ষণ দুইজন মনীষী নিস্তব্ধ ছিলেন। বিদায়ের সময় কার্লাইল এমার্সনকে ভগবদগীতার একখানি ইংরাজি অনুবাদ উপহার দেন। উহা পাঠ করিয়া এমার্সন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ক্রমে অধিকভাবে ভারতীয়ভাবে ভাবান্বিত হইতে থাকেন। কার্লাইল এমার্সনের

প্রবন্ধাদি ইংলণ্ডে প্রচার করেন এবং এমার্সনও কার্লাইলের পুস্তকাদি আমেরিকায় প্রচার করেন। কার্লাইলকে ইংলণ্ডের এমার্সন এবং এমার্সনকে আমেরিকার কার্লাইল বলা হয়। এমার্সনের বহুমুখী প্রতিভাও চিন্তার অসীম মৌলিকতার জন্য তাঁহাকে বেকন, প্লেটো, গেটে প্রভৃতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

১৮৩৩ খ্রীঃ এমার্সন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধা মাতার সহিত কংকর্ডে বাস করেন। সেই সময় বোষ্টন সহরে একটী হল ভাড়া লইয়া প্রত্যেক বৎসর শীতকালে তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে প্রথমতঃ শ্রোতা অল্পই আসিত। বোষ্টনের Society of Natural History এবং Mechanics Institute এ তিনি প্রথম বক্তৃতাবলী প্রদান করেন। অল্প শ্রোতা দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ কিংকিনাটী সহর হইতে একবার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি উদ্যোক্তাকে লিখিয়াছিলেন— "মহাশয, আমার বক্তৃতায় জন্য একটী ছোট হলের বন্দোবস্ত করিলেই ভাল হইত। কারণ আমার বক্তৃতা শুনিতে যতলোক আসিবে তাহাতে এই হলের এক অংশও পূর্ণ হইবে না।" তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা জনসাধারণের বোধগম্য হইত না। একবার মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা দিবার কালে দুই বন্ধু (মেকানিক) তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কাণে কাণে একজন অপরকে বলিতেছিল—"ভাই, তোমার কি মনে হয় না, আমরা যদি মাথার উপর দাঁড়াইতাম, হয়ত বক্তৃতা আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিতাম।" বক্তারূপে তাঁহার খ্যাতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে।

১৮৩৬।৩৭ খ্রীঃ তিনি বোষ্টনের ম্যাসনিক টেম্পলে যে বক্তৃতাগুলি দেন তাহাতে অধিক সংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হয় এবং উহা উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। বক্তৃতার মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব শ্রোতার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত এবং তাহাদের জীবনে জাগরণ আনিত। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি হার্ভার্ড কলেজে "The American Scholar" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি শীঘ্র আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ কেম্ব্রিজের ডিভিনিটি স্কুলে ঐতিহাসিক খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষাবলী প্রদর্শন

করিয়া তিনি যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন তাহাতে পাদ্রীগণের তুমুল প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি প্রতিবাদে নিরুৎসাহ বা পশ্চাৎপদ হইলেন না এবং অন্তরের মধ্যে মুক্তির অন্বেষণ করিতে এবং মানুষের মধ্যে দেবত্বের অধিষ্ঠান দর্শন করিতে সকলকে আহ্বান করেন। তাঁহার চিন্তারাশি এত হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, লোকে তাহা বুঝিতে না পারিলেও বিশ্বাস করিত। ঐহিক জীবনের অপূর্ণতার দ্বারা মানুষের কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় না—এই আশ্বাসের বাণী তিনি প্রচার করিয়া সকলকে নৈতিক পরিপূর্ণতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন এবং নিজেও উহা সাধনার দ্বারা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "উহা লাভ করাই আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ। উহার জন্যই সমাজ হইতে দূরে আছি। উহার অভাবে কত বিনিদ্র রজনীতে যে অশ্রুপাত করিযাছি তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন। অশ্রুপাতে অনেক রাত্রিতে আমার উপাধান সিক্ত হইয়াছে।"

১৮৪৭ খ্রীঃ এমার্সন দ্বিতীয় বার গ্রেট ব্রিটেন পরিভ্রমণে যাইয়া লণ্ডন, লিভারপুল, এডিনবার্গ, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি শহরে বহু শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। এইবার তিনি প্যারিসেও গিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে প্রাচীন জগৎ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। লেখকরূপেও তাঁহার খ্যাতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হন। Nature নামক তাঁহার প্রথম পুস্তকের মাত্র ৫০০ কপি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরে বিক্রয় হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে তাঁহার পুস্তকাবলী পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। সেক্সপিয়রের নাটকাবলী প্রথমতঃ আদৌ বিক্রয় হইত না। প্রবন্ধ ব্যতীত এমার্সন কবিতাও লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রথমজাত সন্তানের মৃত্যুতে Threnody নামক একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি মার্কিন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ হার্ভার্ড কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে 'ডক্টর অব ল' এই ডিগ্রী প্রদান করেন এবং ১৮৭০ খ্রীঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ১৮৭২ খ্রীঃ তাঁহার বাসগৃহ দগ্ধ হয় এবং জনসাধারণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই বৎসর তিনি তৃতীয় বার বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়া মিশরদেশ অবধি গমন

করেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও দৈহিক বলের হ্রাস হয়। কিন্তু তাঁহার চরিত্র সর্ব্বদাই উন্নত এবং মন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্ত ও সৌম্যভাবাপন্ন ছিল। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি ভান্ ডাইক এমার্সনকে বিদ্বান ব্রাহ্মণের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এমার্সন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে যোগ না দিলেও এই সকল ব্যাপারে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি বলেন, 'হয় দাসত্বপ্রথা তুলিয়া দিতে হইবে, নচেৎ আমাদের স্বাধীনতাও ত্যাগ করা উচিত।' তাঁহার বক্তৃতা ও রচনা প্রায় একই রকমের ছিল। তাঁহার লিখিবার প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একটী বিষয় মনে রাখিয়া মন হইতে অন্য চিন্তা সরাইয়া দিতেন এবং এই বিষয়ে যে সকল চিন্তা মনে উদিত হইত তাহা তাঁহার চিন্তাভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, কোন বিষয়ে বলিবার বা লিখিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়ে তাঁহার চিন্তাগুলি অসম্বদ্ধ থাকে কিন্তু মন স্থির করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তারাশি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মনে ভাসিয়া উঠে। এমার্সনের চিন্তার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোনও সমালোচনার বা প্রতিবাদের উত্তর দেন নাই। তিনি সহজ, সুন্দর ও সত্য চিন্তাগুলি পাঠককে উপহার দিয়াই নিশ্চিন্ত। এমন সার্ব্বভৌমিক উদার দৃষ্টিতে তিনি বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর লোক তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তিনি সাধারণ নগণ্য মানুষকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিতেন। কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর নগণ্য মানুষের নিকটও কিছু না কিছু শিখিবার আছে। তিনি বলিতেন, 'ধর্ম্মভাব মানুষের স্বাভাবিক, উহা নষ্ট হইবার নহে। উহাকে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া ভালভাবে পরিচালনা করিলে উহা সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হইবে।' তিনি মহাপুরুষগণের জীবনী ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী পড়িতে ভালবাসিতেন এবং কোন পুস্তক অন্ততঃ এক বৎসর (প্রকাশের পর) পুরাতন না হইলে তাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, অসত্য ও অগভীর কোন চিন্তাই জগতে স্থায়ী হয় না। তাই তিনি চীনের কনফুসিয়াস, পারস্যের হাফিজ, গ্রীসের প্লেটো ও সক্রেটিশ, এবং ভারতের

ঋষিগণ লিখিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমাদের অন্তরে উচ্চ চিন্তাগুলি সুপ্ত আছে, সেগুলি জাগ্রত করিবার জন্যই এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করা উচিত। প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিলে উচ্চ চিন্তা মনে অনায়াসে অধিক জাগ্রত হয়।" কনফুসিয়াস বলিয়াছেন, "অধ্যয়ন ব্যতীত চিন্তা যেমন অর্থহীন, তেমনি চিন্তা ব্যতীত অধ্যয়নও নিষ্ফল। মানব লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা প্রকৃতির পুস্তক অধ্যয়নে উপকার অধিক।"

এমার্সন হিন্দুদের ন্যায় ক্রমবিকাশবাদ ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষ হইবার জন্য একটা পোকা বহু শরীর ধারণ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক যুগের জন্মের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়।" আবার তিনি ক্রমবিকাশ ও ঈশ্বরের সৃষ্টি—এই উভয় মতবাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখেন নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছাশক্তিই ক্রমবিকাশের পথে প্রকাশিত হইতেছে। ভগবানের সূক্ষ্ম ইচ্ছা স্থূল আকার পরিগ্রহ করিবার প্রণালীকে ক্রমবিকাশ বলা যাইতে পারে। তাঁহার "Society and Solitude," "Conduct of Life" প্রভৃতি পুস্তকের ভাব ও ভাষা অতি চমৎকার। এমার্সনকে আমেরিকার আচার্য্য বা রাহস্যিক বলা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "নিজের জীবন সংযত ও উন্নত করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা মানুষের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে। মানুষ একটু অন্তর্মুখীন হইলেই তাহা বুঝিতে পারে, মানুষ নিজেই নিজের ভাল বা মন্দ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে।"

"মানুষ যাহা কিছু জানে বা জগতে যাহা কিছু আছে তাহার সদৃশ সত্তা মানবাত্মার মধ্যেই আছে। কাজেই বহির্জগতের বস্তু অধ্যয়ন না করিয়া মানুষ যদি অন্তর্জগতে আত্মার অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া অন্বেষণ করে, সে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্যই বোধ হয়, নিজেকে নিজের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত করা। The highest revelation is that, God is in every man অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান্ বিরাজমান, ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।"

এমার্সনের কয়েকটী অমূল্য বাণী পাঠককে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।—"যিনি অন্নদান করেন, তিনি অল্প লোকেরই সেবা করেন,

কিন্তু যিনি সত্যপালন করেন, তিনি সকলের সেবা করেন।" "কবি, দার্শনিক ও সাধকের নিকট সকল বস্তুই পবিত্র, সমস্ত কার্য্যই লাভজনক, সবদিনই শুভ, সব মানুষই মহৎ।" "ভগবানকেই চিন্তা কর, তাঁহাকেই ভালবাস, তাহা হইলে তুমি যেখানে যাইবে, তাহাই তীর্থস্বরূপ হইবে, তুমি যেখানে বাস করিবে, তাহাই মন্দিরে পরিণত হইবে।" "তুমি মুখে কিছু বলিও না, তুমি যাহা তাহা তোমার শরীরে ও শিরোদেশে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং তাহা এত উচ্চৈঃস্বরে কথিত হইতেছে যে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কেহই শুনিতে পাইতেছে না"। "প্রত্যেক সমস্যার সমাধানে আমাদের অসন্তোষ স্থায়ীভাবে দূর হয় না। তাহার কারণ এই যে, আত্মা অমর, এই নশ্বর বিশ্বের কোন বস্তুই ইহাকে চিরতৃপ্ত করিতে পারে না।" "সত্যের প্রকৃত সম্মান দিতে হইলে কায়মনোবাক্যে সত্যের সেবা করা কর্ত্তব্য।"

---

(২) *

মার্কিণ দেশের মহামানব র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সনের জীবনচরিত্র লেখক মিঃ ভ্যানব্রুকস্ [১] বলেন, "গির্জ্জার গোঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া এমার্সন প্রাচ্যের দিকে, বিশেষতঃ ভারতের দিকে, লক্ষ্যপাত করেন এবং গীতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থের আধ্যাত্মিক আলোকে স্বীয় জীবন-প্রদীপ প্রজ্বালিত করেন। তাঁহার মতবাদগুলির অধিকাংশ অনুপ্রেরণা তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতেই পাইয়াছিলেন।" ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এমার্সনের সাধনার স্থান (বোষ্টন সহরের নিকটবর্ত্তী) কংকর্ডে গমন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানোপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "তিনি (এমার্সন) এত হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন যে, মার্কিন দেশে তাহার আবির্ভাব ভূগোলের একটা ভুল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ভারতে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ, তাঁহার স্বজাতি মার্কিণগণ অপেক্ষা হিন্দুগণই বোধ হয় তাঁহার অধিকতর আত্মীয়।"

---

* মাসিক বসুমতী, ১৩৪৫।

১। The Life of Emerson by Mr. Van Wyck Brooks.

ডাঃ আর্থার ক্রাইষ্টি [১] বলেন, এমার্সনের বেদান্ত-সাহিত্যের প্রতিই আন্তরিক প্রীতি ছিল এবং বেদান্ত গ্রন্থই তিনি সমধিক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি যে বৌদ্ধশাস্ত্র আদৌ পাঠ করেন নাই, এমন নহে; তবে তৎপঠিত বৌদ্ধ গ্রন্থের সংখ্যা অত্যল্প। কারণ, বৌদ্ধ ধর্মের নৈরাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিত না। তিনি মোক্ষমূলার অনূদিত (ইংরেজিতে) "ধর্ম্মপদ" ও টি. রোজারস্ সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত বুদ্ধ ঘোষের পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই কয়খানি বৌদ্ধগ্রন্থ তখন কংকর্ডে প্রচলিত ছিল। ডাঃ আর্থার ক্রাইষ্ট এমার্সন, থোরো, হুইটিয়ার, ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান প্রভৃতি আমেরিকার মনীষিগণের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব আলোচনা করিয়া এক গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ [২] লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

এমার্সনের কংকর্ডস্থ স্বীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত এবং হার্ভার্ড কলেজ লাইব্রেরী ও বোষ্টন এথেনিউয়াম হইতে আনীত যে সকল বেদান্ত গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ডাঃ ক্রাইষ্টি সংগ্রহ করিয়াছেন। হোরেশ হেম্যান উইলসন অনূদিত 'ঋগ্বেদ' এবং জন ষ্টিভেনশন্ অনূদিত 'সামবেদ' (সংহিতা অংশ) তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তবে খুব সম্ভবতঃ 'ব্রাহ্মণাদি' তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। উপনিষদ্‌গুলি তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল এবং রাজা রামমোহন রায় অনূদিত 'ঈশোপনিষদ্' ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি সযত্নে অধ্যয়ন করেন। এমার্সনের খুড়ীমা মেরী মুডি এমার্সন তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। রামমোহন যখন কংকর্ডে গিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তখন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মেরি মুডি পত্র লিখিয়া যুবক এমার্সনকে রামমোহনের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে উৎসাহিত করেন। এঙ্কোয়েটিল্ ডুপারনের উপনিষদে (Anquetil Duperon's Oupnekhat) বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য

১। "Emerson's Oriental Reading" নামক প্রবন্ধ in Aryan Path, September, 1933.

২। The Orient in American Transcendentalism By Dr. Arthur Christy, Ph. D. (Columbia University Press.)

উপনিষদের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি অনূদিত আছে। উহা পাঠ করিয়া জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এমার্সন উহা সাগ্রহে বারংবার পাঠ করেন। Bibliotheca Indicaতেই রোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত ঈশ, কেন, কঠ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রধান অংশগুলি প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ এই গ্রন্থ ছিল এমার্সনের পাঠ্য এবং এইগুলি অধ্যয়ন করিয়া তিনি 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মার অমরত্ব' প্রভৃতি কবিতা লেখেন। মহাভারত ও রামায়ণের কিয়দংশ তাঁহার অধীত ছিল, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুস্তক ছিল গীতা। চার্লস উইলকিন্‌সের অনূদিত ভগবৎগীতাখানি তাঁহার নিত্য সঙ্গী ছিল এবং ককবার্ণ টমসনের গীতাও তাঁহার লাইব্রেরীতে ছিল। কোন বন্ধুকে এমার্সন গীতা সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন—"প্রিয় বন্ধু, গীতা পাঠ করিয়া অদ্ভুত আনন্দ ও প্রশান্তি পাইয়াছি। উহা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ পুস্তক। উহা পাঠে অন্য জগতের সংবাদ পাইয়াছি। উহাতে ক্ষুদ্র বা অনাবশ্যক কিছুই নাই, উহার ভাব বিরাট, গভীর ও যৌক্তিক। আমাদের সমস্যাগুলিই অন্য যুগ ও অন্য দেশের জ্ঞানিগণ আমাদের জন্য চিরতরে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।"

স্যর উইলিয়ম জোন্সের অনূদিত 'মনুসংহিতা' এমার্সনের লাইব্রেরীতে ছিল এবং গীতার পরে এই পুস্তকখানি আমেরিকার আধ্যাত্মিক চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উইলসনের 'বিষ্ণুপুরাণ' পাঠান্তে 'মায়া,' 'হেমাত্রেয়' প্রভৃতি কবিতা তিনি রচনা করেন। ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ইউজেন বার্ণফের 'ভাগবৎপুরাণ' পাঠান্তে এমার্সন বলিয়াছিলেন, "আহা, নতজানু হইয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত।" হেনরী হার্ট মিলম্যানের অনূদিত 'নলদময়ন্তী' সম্বন্ধে তিনি এই সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—"বোষ্টন নগরীর সংবাদপত্রসমূহের তাজা খবর অপেক্ষা এই বইখানি আমার অধিক অন্তরের বস্তু। ইহাতে আমি সতর্কতা ও সান্ত্বনা উভয়ই পাইতেছি। বইটী অতিশয় চিত্তাকর্ষক।" উইলসনের 'মেঘদূত,' চার্লস উইলকিন্স অনূদিত বিষ্ণুশর্ম্মার 'হিতোপদেশ,' জৈমিনির 'মীমাংসাদর্শন,' ভট্টের 'ভাষাপরিচ্ছেদ,' মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ ও

সার উইলিয়াম জোন্‌স কর্তৃক অনুদিত দুই প্রকারের 'শকুন্তলা' তিনি পাঠ করিযাছিলেন।

ইংরেজী অনুবাদ ব্যতীত ইউজেন বার্ণফেব ও গাশিন টাশি প্রভৃতির ভাবতীয় গ্রন্থেব ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিয়াও তিনি বেদান্ত-জ্ঞানের পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। অনুবাদ-গ্রন্থ ছাড়া ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত পুস্তকও তিনি যথেষ্ট পাঠ করিয়াছিলেন। যথা—উইলসনের "Theatre of the Hindus,' টমাস্‌ আবস্কিন পেরী সাহেবেব "Oriental Life," কোলব্রুকের "Hindu Law" এবং উইলিয়াম জোন্সের গ্রন্থাবলী তাঁহার অধীত ছিল। ইংরাজীতে লিখিত জর্জ্জ স্মলের "সংস্কৃত-সাহিত্য", উইলিয়াম ওয়ার্ডের "হিন্দু-সাহিত্য,' বেলান্টাইনের 'বেদান্ত,' উইলিয়াম ব্রকী সাহেবের 'ভারতীয় দর্শন' এবং ডেভিড আর্ক্‌হাটের 'শ্রদ্ধা' এবং এতদ্ব্যতীত জেমস্‌ মিল, জন মার্শম্যান প্রভৃতি লিখিত ভারতের ইতিহাসও যত্ন সহকারে তিনি পাঠ করিতেন। এত ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বেদান্তেব সহিত তাঁহার চিন্তারাশির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। এমার্সন ছিলেন আজন্ম ভারত-প্রেমিক। হিন্দুদর্শন বা বেদান্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও মজ্জাগত ছিল।

সক্রেটিশের ন্যায় এমার্সন উদারমতাবলম্বী ও একজন বিশ্বনাগরিক ছিলেন। 'আপনি কোন দেশবাসী?' এই প্রশ্ন সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার জন্মস্থান কোরিন্থ বা কর্ম্মক্ষেত্র এথেন্স এ কথা নগরবাসীকে বলিতেন না। তিনি নিজেকে বিশ্বনাগরিক (citizen of the world) বলিতেন। রোমান দার্শনিক এপিকৃটেটাস বলিতেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যখন এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (kinship) বর্ত্তমান, জীবত্বের বীজ (seeds of being) যখন ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, তখন ঈশ্বরজ্ঞ মহাপুরুষকে ঈশ্বর-তনয় (son of God) বলা উচিত, এবং এইরূপ ব্যক্তিকে কোন বিশেষ দেশবাসী না বলিয়া জগদ্বাসী বলাই কর্ত্তব্য। এমার্সন বলিতেন যে, 'মহাপুরুষগণ ও তাঁহাদের অনুভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা দেশের সম্পদ নহে, তাঁহারা ও তাঁহাদের সিদ্ধি-সম্পদ্‌ সর্ব্বদেশের সকল সাধকের ধন। প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব আধ্যাত্মিকতার উপর আরোপ করা

যায় না।' কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভদ্রলোক এমার্সনকে একবার বলিয়াছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, খ্রীষ্টান ধর্মই একমাত্র সত্য। প্রত্যুত্তরে এমার্সন বলিলেন, ইহাতেই প্রমাণিত হয়, আপনি কি সঙ্কীর্ণ মনে এই সকল পাঠ করিয়াছেন।

বেদান্তের ভাবে এমার্সন এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধসমূহে তিনি বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করিতেন। উহাতে খ্রীষ্টান সমাজ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং সেইজন্য তাঁহাকে গির্জ্জার পাদ্রীপদ ত্যাগ করিতে হয়। সমাজের ভয়ে তিনি তাঁহার দৃঢ় ধারণা বর্জ্জন করিলেন না, এমনই সত্যনিষ্ঠ তিনি ছিলেন। রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয়ও উদার মতের জন্য গোঁড়া পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক গির্জাচ্যুত হন। এমার্সন তাই একস্থানে বলিতেছেন, "জনসাধারণের ভাবে চলিলে সমাজে বাস করা সহজ, আর নির্জ্জনে থাকিলে নিজের ভাবে থাকা সম্ভব। কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকিয়াও যিনি শান্ত ও সুমিষ্টভাবে নির্জ্জনতার এবং স্বীয় মতের স্বাধীনতা রক্ষা করেন, তিনিই মহাপুরুষ।" এমার্সন নিজ জীবনে এইরূপ আদর্শ পালন করিয়া হিন্দুর ন্যায় কর্ম্মজীবনে বেদান্ত সাধন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির মধ্যে নানা স্থানে বেদান্তগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদান্তের প্রতি তাঁহার গভীর ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। "Quotations and Originalities" নামক প্রবন্ধে এমার্সন লিখিতেছেন, "খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ যাহা নিজ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রচার করিতেন, জগতের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি তুলনামূলক অধ্যয়ন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। ভারতীয় শাস্ত্র অনূদিত ও পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনীষিগণ পাদ্রীদের গোঁড়ামী বুঝিয়াছেন। নৈতিক জ্ঞান বা নীতিতত্ত্ব খ্রীষ্টানধর্ম্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রচলিত আধ্যাত্মিকাগুলি প্রাচীন ভারত হইতে আনীত। এমার্সন তাঁহার Persian Poetryতে লিখিয়াছেন, "এশিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের হিন্দুগণই অধিকতম প্রাচ্যভাবাপন্ন (oriental)। নীতি-দর্শন উদ্ভাবনায় ও আলোচনায় আর কোন জাতি তাহাদের সমকক্ষ নহে।"

উপনিষদাদি বেদান্তগ্রন্থে যাহাকে পরমাত্মা বলা হয় এমার্সন তাহাকে 'over soul' বলিতেন। তিনি তাঁহার 'Oversoul' নামক প্রবন্ধে মানবাত্মার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বেদান্তানুযায়ী। Worship নামক প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "সত্তাব (Law) প্রকৃত সংজ্ঞার জন্য আমরা হিন্দুশাস্ত্রের নিকট ঋণী। কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে এই ভাবের তুলনা নেই। যাহা নামহীন, বর্ণহীন, যাহার হস্তপদ নাই, যিনি অণু হইতেও অণু ও মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি কর্ণ ব্যতীত শ্রবণ করেন, যিনি চক্ষু ব্যতীত দর্শন করেন, পদ ব্যতীত গমন করেন এবং হস্ত ব্যতীত ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত সত্তা বা আত্মা।" উহার মূল ইংরাজী অংশ পাঠ করিলে মনে হয়, উহা উপনিষদের কোন শ্লোকের অনুবাদ। এমার্সনের "Brahma" নামক একটী কবিতা আছে, পাঠকের অবগতির জন্য তাহার একটী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"If the red slayer thinks he slays,
or if the slain thinks he is slain ;
They know not well the subtle ways,
I keep, and pass, and turn again."

উহার অনুবাদ অনাবশ্যক। ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটী শ্লোকের অনুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। "Immortality" নামক প্রবন্ধে এমার্সন কঠোপনিষদ্ হইতে নচিকেতার সমগ্র উপাখ্যানটী বর্ণনা করিয়া আত্মার অমরত্ব বিবৃত করিয়াছেন। বোষ্টন বেদান্তকেন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দজী[১] বলেন যে, এমার্সনের গ্রন্থাবলীকে বেদান্তের পাশ্চাত্য ভাষ্য বলা উচিত। এমার্সন তাঁহার "Progress of Culture" নামক প্রবন্ধে প্রাচীন কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পদ্ তুলনা করিয়া বলিতেছেন, "প্রাচীন গ্রীস ও রোম তথা প্রাচীন ও মধ্য যুগে ইউরোপের অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার দর্শনে আমরা চমৎকৃত হই এবং তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া গৌরবান্বিত মনে করি। তখন রামায়ণ,

১। Emerson and Vedanta by Swami Paramananda, Boston.

মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা ও বেদ প্রভৃতি অধিকতর প্রাচীন ও উন্নত ভারতীয় শাস্ত্রের কথা আর কি বলিব? এই সকল জ্ঞান-গ্রন্থের সমতুল্য পুস্তক জগতে আর নাই। তাঁহাদের গ্রন্থকারগণের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয়।"

বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ বা বিশ্বমনের ধারণা এমার্সন গ্রহণ করিয়া লিখিতেছেন—"একটী সমষ্টি-মন বিদ্যমান, উহা প্রত্যেক ব্যষ্টি-মনের অন্তর। প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্ব-মনের এক একটী মুখমাত্র। যিনি একবার এই রাজ্যে প্রবেশ করেন, তিনি চিরস্বাধীন হন এবং এই সমগ্র মনোরাজ্যের অধীশ্বর হন। এই প্রদেশে প্রবেশের সৌভাগ্য যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি প্লেটোর মত গভীর চিন্তা করিতে পারেন, ঋষির মত অলৌকিক অনুভব করিতে পারেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-শক্তিমান্ হন। প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্বমনের এক একটী মূর্ত বিগ্রহ এবং ব্যষ্টি মনে সমষ্টি-মনের সমস্ত গুণ ও শক্তি সদা নিহিত থাকে। মুসা ও মনু, জরাথুস্ত্র ও সক্রেটিশ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সাম্রাজ্যে চির নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন।" সাধনার দ্বারা ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির পথে মানুষ যখন ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার উপাধি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশেষে বিশ্বমনের সহিত চিরতরে যুক্ত ও একীভূত হয়, তখন বিশ্বমন তাঁহার শরীর-মন অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে এবং মানুষ স্বীয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয়। বেদান্তের এই ভাবটী এমার্সন তাঁহার "Immortality" নামক প্রবন্ধের নীম্নোদ্ধৃত অংশে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি সামান্য একটী গৃহের বা স্বীয় জীবনে শৃঙ্খলা আনিতে পারে না তাহাকে রাজ্য পরিচালনার ভার দেওয়া বিপজ্জনক। এমন লোক অনেক আছে যাহাদের কাছে এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করা শক্ত। একটী দিন যাহাদের কাটে না, তাহাদিগকে অনন্ত যুগ দিলে কি হইবে? আত্মার অমরত্ব বা কালের অসীমতা তাহারা ধারণা করিবে কিরূপে? কিন্তু পরমাত্মার পূর্ণতার অধিকারী হইতে হইলে ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ধীরে ধীরে উচ্চ চিন্তা করিতে করিতে মানুষ ক্রমবিকাশের পথে আত্মার অজত্ব অজরত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী হয়। মনের প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে একটি সূক্ষ্মতর চিন্তা

লুক্কায়িত, প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে একটি গভীরতর চরিত্র নিহিত, উহা প্রথমে ধারণা করিতে হয়। যুবক শিশুসুলভ সারল্য ও চাঞ্চল্য অনায়াসে ত্যাগ করে, মানুষ যৌবনের কল্পনা ও কুশলতা বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করে না, সর্ব্বশেষে বিশ্বমনের সহিত সংযুক্ত হইলে মানুষ অবলীলাক্রমে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবত্বের অধিকারী হয়। এই অবস্থায়ই মানুষ ঈশ্বরের নরনারায়ণ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।"

এমার্সনের মতে বেদান্তের সার্ব্বজনীন ও সার্বকালীন সত্যসমূহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শনগ্রন্থে সমান ভাবে বিগুমান। তবে সামাজিক সংস্কার ও অজ্ঞ ধাবণার বশীভূত হইয়াই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তিনি বলেন, "স্বর্গের ভাষা দেবদূতগণের এত প্রিয় যে, উহা ব্যতীত মানুষের ভাষায় তাঁহারা কথা বলিতে চায় না। লোকে বুঝুক আব নাই বুঝুক, জ্ঞানী দেবভাষায় তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন।" সত্যান্বেষণ যদি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে সত্য যথাকালে প্রকাশিত হইবে। সত্য লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম করা আবশ্যক। মানুষ যতই ব্যক্তিগত ধাবণার অধীন হন, ততই তিনি দৈবী সম্পদ হইতে দূরে চলিয়া যান। এমার্সন বলেন, "Every personal consideration we allow costs us heavenly state." এমার্সন বেদান্তের কর্মবাদে বা জন্মান্তরবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইহাকে Law of Compensation বলিতেন। তিনি তাঁহার Compensation নামক সারগর্ভ প্রবন্ধে কর্ম্মবাদের একটী সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপরি উক্ত প্রবন্ধে বলিতেছেন—"বাল্যকাল হইতেই এই কর্ম্মবাদের বিষয়ে কিছু লিখিবার খুব আগ্রহ ছিল। যৌবনে দেখিলাম যে, পাদ্রীগণ গির্জ্জার বেদী হইতে যাহা প্রচার করেন, তাহা অপেক্ষা আমি ও অন্যান্য শ্রোতারা অধিক জানি। কর্ম্মবাদ উত্তমরূপে অবগত হইলে উহা জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল দুর্গমপথে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় সহায়ক হইবে। সারমর্ম্ম এই যে, মানবতার মধ্যে দেবত্বের রশ্মিকণা আচ্ছাদিত আছে। বাইবেলে কথিত Last Judgement এর গূঢ় রহস্য এই কর্ম্মবাদের আলোকে

বুঝিলে উহার প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি জানা যাইবে।" এমার্সনের মতে কর্ম্ম দুইপ্রকারে ফল প্রসব করে; প্রথমতঃ আত্মাতে, দ্বিতীয়তঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে। অবস্থার অলক্ষ্যনীয় পরিবর্ত্তনকে আমরা কর্ম্মফল বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও প্রধানভাবে কর্ম্মফল আত্মার উপর গভীর মসীরেখা পাত করে। অপরাধ ও তাহার ফল এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী কুসুম। অপরাধজাত আনন্দ-কুসুমের মধ্যেই শাস্তি-কীট লুক্কায়িত থাকে। কর্ম্মফল ভাল হউক, মন্দ হউক, মানুষ তাহা এড়াইতে পারে না। এমার্সনের ভাষায়—

"Curses always recoil on the head of him who imprecates them. If you put a chain around the neck of a slave, the other end fastens itself around your own. Love for love, blood for blood." তিনি বলেন—"একটী ছুরিকা ধার দেওয়া হইতে নগরনির্মাণ বা কাব্য-প্রণয়ণ পর্য্যন্ত মানুষের পরিশ্রম সর্ব্ব আকারে কর্ম্মরহস্যই উদ্‌ঘাটন করিতেছে।" আবার তিনিই বলিতেছেন, 'কর্ম্মই জীবনরহস্যের সবখানি নহে। আত্মা কর্ম্ম নহে, কর্ম্ম আত্মার অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। আত্মার অস্তিত্বে ও আনন্দস্বরূপে বিশ্বাসী হইলে কর্ম্মের কুহেলিকা অচিরে অপসৃত হয়। অবস্থার বৈচিত্র্য ভেদ করিয়া আত্মবিশ্বাসী, প্রেমের দ্বারা সব বস্তু ও ব্যক্তিকে নিজের বিভিন্ন মূর্ত্তি মনে করিয়া চির শান্তির অধিকারী হন।' এমার্সন বলেন—

"Love reduces mountainous inequalities, as the sun melts the ice berg in the sea. The heart and soul of all men being one, this bittereness of His and Mine ceases. His is mine. I am my brother and my brother is me." আত্মার সর্বভূতে অনুভূতি হইলে যে দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ হয় এইরূপ বর্ণনা উপনিষদ্ ও গীতার অনেক শ্লোকে আছে।

এমার্সন বলেন, "We are idolaters of the old." অর্থাৎ আমরা অতীতের ভ্রান্ত পূজারী। আত্মার স্বর্গীয় সম্পদে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়াই আমরা দুঃখে দৈন্যে এত অভিভূত হই। আত্মা মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদিগকে নবজীবনে

সঞ্জীবিত করিতে, ও নবীন সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পারেন। আত্মানন্দের একটী তরঙ্গ জীবনের দুঃখসমুদ্র শুকাইয়া দিতে পারে।" "পাশ্চাত্যদর্শন সহস্র সহস্র বৎসর আত্মার সন্ধান না পাইয়া অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়াছে। মানুষেব মধ্যেই বিরাট আত্মা, অনন্ত সত্বা নিহিত।"

কেন উপনিষদে আত্মার বর্ণনাক্রমে বলা হইয়াছে যে, আত্মা চক্ষুব চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যেব বাক্য এবং প্রাণের প্রাণ। এমার্সন আত্মার সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন—

"The soul in man is not an organ, but animates and exercises all the organs; is not a function or faculty like memory but a light; is not the intellect or the will but the master of the intellect and will; is the background of our being."

এমার্সন আরও বলেন যে, "মানুষ একটী জীবন্ত মন্দির। এই মন্দিরের গভীরতম প্রদেশে অসীম জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ নিহিত। মানুষের বাহ্য অংশ (apparent) হচ্ছে মানুষ কর্ত্তা, ভোক্তা, পাতা ইত্যাদি। আত্মাই প্রকৃত মানুষ (the real man), এই প্রকৃত মানুষ কর্মের পর্দার পশ্চাতে অবস্থিত।" একটী প্রবাদ আছে যে, 'God often comes to us without bell?' মানুষেব নিকট ঈশ্বর কখন কি ভাবে উপস্থিত হন্ তাহা জানা যায় না। তাঁহাব আগমনের কোন বিশেষ পূর্ব্বচিহ্নও সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। এমার্সন বলেন, "ঈশ্বরই মানুষরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। মানুষকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করিলেই তাহা ঈশ্বরকে করা হয়। এমার্সন জনৈক বৈদান্তিকের ন্যায় বলেন যে, দেশ ও কালের পরিচ্ছেদে আত্মা আবৃত। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রভাব মনের এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, দেশকালের প্রাচীরকে অভেদ্য ও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশ ও কাল আত্মার অস্থায়ী আবরণ মাত্র। আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও কালের দূরত্ব অন্তর্হিত হয়। শত শতাব্দী ও সহস্র মাইলের দূরত্ব ক্ষণমাত্রে অতিক্রম করিয়া আত্মদর্শন উপস্থিত হয়।" এমার্সন বলেন, "We are wiser than our soul." অর্থাৎ অন্তর্নিহিত

জ্ঞানের সংবাদ আমরা রাখি না বলিয়াই আমরা নিজেকে এত অজ্ঞ মনে করি।”

এমার্সন স্বীকার করেন, আত্মদ্রষ্টা মানব সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অন্যভাবে বিচরণ করেন। এইজন্য সমাজ তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। 'Blasted with excess of light' এই ভাষায় তিনি আত্মানুভূতি বাক্যে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বেদান্তের আলোকে মহাপুরুষগণের অনুভূতিসমূহের দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সক্রেটিশ, প্লটিনাশ, পুরফাইরি, পল, প্লেটো, বোহেম, জর্জ্জ ফক্স, শোয়েডেনবুর্গ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণের অনুভূতি (trance) প্রভৃতিকে তিনি আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন বিকাশ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দূর শ্রবণ, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি বিভূতিকে তিনি আত্মজ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া মনে করেন না। তিনি পণ্ডিত, মনীষি ও আত্মজ্ঞ মুনির মধ্যে সুন্দর প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া বলেন, 'কবি ও দার্শনিকগণ বাহ্য অভিজ্ঞতা (from without) বা বুদ্ধির ভূমি হইতে কথা বলেন, আর সক্রেটিশ ও যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি জ্ঞানিগণ আত্মভূমি হইতে (from within) কথা বলেন'। তাই জ্ঞানিগণের বাক্য এত হৃদয়স্পর্শ করে এবং শত শত বৎসর অতীত হইলেও শক্তিহীন হয় না। এমার্সন বলেন যে, ভক্ত ও ভগবানের মিলন হইলে 'The simplest person becomes God.' আত্মজ্ঞ পুরুষদের সম্বন্ধে উপনিষদে আছে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' আত্মজ্ঞ মানুষের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা অসাধারণ। এইরূপ ব্যক্তি অজ্ঞ বা উন্মত্তের মত থাকিলেও তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে ও কার্য্যে ভাগবত ভাব বিকশিত হয়। তুলা যেমন অগ্নিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না, অজ্ঞান তেমন জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না।

— —

পঁচিশ

ক্রীষ্টিন

স্বামী বিবেকানন্দের যে সকল পাশ্চাত্য শিষ্যা ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতা, ভগ্নী ক্রীষ্টিন এবং মাতাজী সেভিয়ারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রীষ্টিন নিবেদিতার সহকর্মিনী ছিলেন এবং নিবেদিতা বিদ্যালয়ে দ্বাদশ বৎসর কাজ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের উৎপত্তি ও উন্নতির সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরতরে বিজড়িত। হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত দানে তিনি ভগ্নী নিবেদিতার সহিত এই বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানে যত্নশীলা ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক নিবেদিতা উহার পরিচালনার ভার ক্রীষ্টিনের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনায় মনোনিবেশ করেন।*

ভগ্নী ক্রীষ্টিনের পূর্ব নাম ছিল কুমারী ক্রিষ্টিনা গ্রীনষ্টিডেল। তিনি ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৭ই আগষ্ট জার্মেনীর অন্তর্গত ন্যুরেমবার্গ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফ্রেডারিক গ্রীনষ্টিডেল একজন সদাশয় স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় জার্মান পণ্ডিত ছিলেন। ক্রিষ্টিনার বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর তখন ফ্রেডারিক মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্তঃপাতী ডেট্রয়েট সহরে যাইয়া বসবাস করেন। তাঁহার ছয়টী কন্যা ছিল, কোন পুত্র ছিল না। ক্রিষ্টিনা ছিলেন তাঁহার প্রথম সন্তান। ফ্রেডারিকের ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না। তাই তিনি ব্যবসাতে পিতৃদত্ত এবং স্বসঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন। ক্রিষ্টিনা পিতাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহার শৈশব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সতের বৎসর বয়সে বিধবা মাতা ও পাঁচটী কনিষ্ঠা ভগ্নীর ভরণপোষণের গুরু দায়ীত্ব তাঁহার তরুণ স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অল্পবয়সে ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

---

* 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭) ভগ্নী ক্রীষ্টিন শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এখন হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৭ বৎসর তাঁহার জীবন ছিল বীরোচিত সংগ্রাম ও অসামান্ত আত্মত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

যৌবনের প্রারম্ভেই ক্রিষ্টিনা গির্জার সংকীর্ণ ধর্মমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উদার মতাবলম্বী ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিষ্ট সম্প্রদায়ের সভ্য হন। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের মতবাদও তাঁহার প্রাণে প্রকৃত তৃপ্তি দিতে পারিল না। আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি এইভাবে তাঁহাকে প্রায় দশ বৎসর অস্থির করিয়া রাখিল। উক্ত কালের মানসিক অতৃপ্তির বর্ণনা তিনি এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।—"অনেক সময়ে জীবনপ্রবাহ ধীর, স্থির ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে। তখন খাওয়া, শোয়া, ও কথা:বলা গতানুগতিক ভাবে চলে। সাধারণ চিন্তা, সাধারণ ভাবের চক্র চলিতে থাকে। হঠাৎ বিপদ, বিষাদ আসে ও মুহূর্তের জন্ত আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। সুখ বা দুঃখের জন্য জীবনস্রোত বন্ধ হয় না, মন্দীভূত হয় মাত্র। নিশ্চয়ই ইহা জীবনের উৎকর্ষ বা উদ্দেশ্য নয়। অস্থিরতা আসে। আমরা কিসের জন্ত অপেক্ষা করছি? হঠাৎ একদিন আমাদের ইপ্সিত বস্তু লাভ হয়। তখন মনের একঘেয়ে ভাব কেটে যায়, জীবনের গতি নবীন পথে প্রবাহিত হয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন বুদ্ধিগত হয়, অস্থিরতা চিরতরে অন্তর্হিত হয়।" ক্রীষ্টিনা এই সময় সম্ভবত: ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস মনে মনে পেয়েছিলেন। আন্তরিক আকুলতা কখনও অপূর্ণ থাকে না। ক্রিষ্টিনার জীবনের শুভ লগ্ন শীঘ্র সমুপস্থিত হইল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্থানীয় ইউনিটারিয়ান চার্চে তিনি তাঁহার বন্ধু মিসেস মেরী সি. ফান্কির সহিত ভারতাগত বিবেকানন্দ নামক এক সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতা শ্রবণান্তে ক্রিষ্টিনা বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই পূর্ব পূর্ব অসংখ্য জন্মে আমরা কখনও এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হই নাই। কারণ, মাত্র পাঁচ মিনিটকাল স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিলাম, যে স্পর্শমণির সন্ধান এতকাল ধরিয়া করিতেছিলাম তাহা আমরা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ আমরা বলিয়া উঠিলাম, 'হায়! যদি আমরা না

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১) প্রকাশিত তাঁহার 'স্মৃতিকথা' দেখুন।

আসিতাম!' স্বামিজীর অদ্ভুত মানসিক শক্তিই আমাদিগকে সর্বাগ্রে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু তিনি যাহা বলিতে ছিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য হইলেও আমাদের কাছে তাহা চিরপরিচিত মনে হইতেছিল। আমি স্বতঃই বলিয়া উঠিলাম, 'এ যেন পূর্বপরিচিত!' স্বামীজী ছয় সপ্তাহ কাল ডেট্রয়েটে থাকিয়া বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। আমরা তথায় তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিবার কোন সুযোগই হারাই নি। তখন গুরু কাহাকে বলে জানিতাম না। কিন্তু আমরা তাঁহাকে মনে মনে গুরুরূপেই বরণ করিয়াছিলাম। তখনও তাঁহার সহিত আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হই নাই। কিন্তু আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, অচিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং তিনি আমাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন।" *

বেলুড়মঠের কোন সন্ন্যাসীকে ভগ্নী ক্রীষ্টিনা বলেছিলেন, 'স্বামীজীর দিব্য কণ্ঠস্বরে' উচ্চারিত 'ভারত' শব্দটী যখন প্রথম আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখনই আমার হৃদয়ে ভারত-প্রেম জন্মিল। একটী ছোট পঞ্চাক্ষর শব্দে এত ভাব থাকিতে পারে ইহা যেন বিশ্বাসই হয় না। স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম আমাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে, আমি ভারত সম্বন্ধে পুস্তক সংগ্রহপূর্বক উহার মহত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম।' † ইহা গভীরার্থপূর্ণ কারণ, তিনি ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভূমিরূপে বরণ করিবেন। স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে যাইবার সময় তিনি ভাবিতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইবে। বক্তৃতা শ্রবণান্তে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন। স্বামিজীর আকৃতি অপেক্ষা ব্যক্তিত্বই তাঁহাকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি বলেন, "স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব হইতে যে দিব্য শক্তি নিঃসৃত হইতেছিল তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আবিষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার সেই শক্তি অপ্রতিরোধনীয়।

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) শ্রীঈশ্বর সেন লিখিত 'ভগ্নী ক্রিষ্টিন' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। উক্ত ইংরেজি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'উদ্বোধন' (পৌষ, ১৩৩৭) প্রকাশিত হইয়াছে।

† 'প্রবুদ্ধ ভারত' (মে, ১৯৩০) পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখুন।

সেই শক্তি সকলকে অভিভূত করিল বক্তৃতার প্রারম্ভেই।······আমার মনে হইতে লাগিল, এই ভাবধারা আমি অবগত আছি। স্বামীজীর বয়স তখন মাত্র ত্রিশ। জরাশূন্য যৌবন এবং প্রাচীন প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি স্বামীজীকে দেবদূতের মত দেখাইতেছিল।······স্বামিজী যখন ভারত শব্দটী উচ্চারণ করিতেন তখন উহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রেম, শ্রদ্ধা, গৌরব, সাহস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই প্রকাশিত হইত। তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়ের ভাব এই শব্দ দ্বারা অপরের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চারিত হইত যে, ভারত সম্বন্ধে বড় বড় বই পড়িলেও এমনটী হয় না। শ্রোতার হৃদয়ে ভারতপ্রেম জাগাইবার যাদু-শক্তি ছিল এই শব্দটীর। অতঃপর ভারতসম্বন্ধীয় সব কিছুই আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিল। ভারতের মানুষ, ইতিহাস, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, আচারব্যবহার, শিক্ষাসভ্যতা, নদীপর্বত, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা ও শাস্ত্র আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। আমাদের নব জীবন, নব অধ্যয়ন ও নব অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। আমাদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তিত হইল।”

প্রায় এক বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ক্রীষ্টিনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডেট্রয়েটে ক্রীষ্টিনা স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পান নাই। এত শীঘ্র তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন ইহা ক্রীষ্টিনা ভাবিতেও পারেন নাই। প্রিয়া বান্ধবী মিসেস ফাঙ্কির সহিত ক্রীষ্টিনা ১৮৯৫ খ্রীঃ ৬ই জুলাই সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষে অবস্থিত সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্বামীজী অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া গ্রীষ্মের তিন মাস বিশ্রাম লাভার্থ তথায় গিয়াছিলেন। স্বামীজী ওখানে যে কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহাতে সম্প্রতি বিবেকানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গভীর অন্ধকারময় রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাঁহারা একমাত্র পথপ্রদর্শকের সাহায্যে স্বামীজীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর দর্শন না করিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে চাহিলেন না। ‘স্বামীজী কি আমাদিগকে কৃপা করিবেন? যদি না করেন তবে আমাদের কি উপায় হইবে?’ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহারা স্বামীজীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী আসিতেই ক্রীষ্টিনা বলিয়া উঠিলেন, 'যিশুখ্রীষ্ট আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষা লাভের জন্ত আমরা যে ভাবে যাইতাম সেই ভাবে আপনার নিকট আমরা এসেছি।' স্বামীজী তাহাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাতপূর্বক মধুর স্বরে বলিলেন, 'অবশ্যই তোমাদিগকে ভগবান যিশুখ্রীষ্টের স্তায় মুক্তিদানের শক্তি যদি আমার থাকিত?' ক্রীষ্টিনা ও ফাঙ্কি সেই রাত্রিতে অনেকক্ষণ স্বামীজীর কাছে থাকিয়া তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে ধন্সা হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া ক্রীষ্টিনা নিজেকে অতিশয় সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন। স্বামীজী এই শিষ্যাদ্বয়ের কথা মনে করিয়া বলিতেন, 'আমার এই শিষ্যদ্বয় শত শত মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক অতি দুর্যোগের বাত্রিতে আমার নিকট এসেছিল।' গ্রীষ্মাবকাশের তিনমাস ক্রীষ্টিনা এখানে স্বামীজীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যকে এখানে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ফাঙ্কি লিখিয়া রাখেন এবং পরে 'দেববাণী' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। স্বামীজী এখানেই তাঁহার 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা করেন এবং সদা দিব্যভাবে আরূঢ় থাকিতেন।

স্বামিজী যোগদৃষ্টিতে ক্রীষ্টিনার মানসিক অবস্থা জানিয়া দীক্ষাদানকালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি হিমতুষারবৎ বিশুদ্ধ। তোমার জ্ঞানলাভের পরিপন্থী তিনটী মাত্র আবরণ আছে। এই জীবনেই তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে।' এই সময়ের উল্লেখ করিয়া ক্রীষ্টিনা একদিন তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিবুর্দ্ধিতাবশতঃ তখন স্বামিজীকে কোন প্রশ্নাদি করি নাই। সকলে প্রশ্নাদি করিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে।' তাঁহার বন্ধু বলিলেন, 'তোমার কোন প্রশ্ন করিয়া কাজ নাই।' উত্তরে ক্রীষ্টিনা বলিলেন 'তুমি ঠিক বলেছ। সেই জ্ঞান-সূর্য্যের সমীপে আসিলে স্বতঃই মনের সকল সন্দেহ তিরোহিত হয়। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম কয়েকটী বাক্য মনোযোগ সহকারে শুনিবার পর আমার মনে হয়, তাঁহার কথাগুলি যে কেবল শুনিতেছি তাহা নহে, অধিকন্তু সেগুলি সত্যসত্যই উপলব্ধ হইতেছে।' ধর্মজীবনের শুভ প্রভাতে তিনি গুরুকৃপায় একবার সর্বোচ্চ অনুভূতির অধিকারিণী হইয়া লিখিয়াছিলেন, 'এই

অসীম বিমল আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। ইহা বাক্য ও মনের অতীত, ইহা অপার্থিব। ইহা মায়াশূন্য, প্রশান্ত, মনোবৃত্তিরহিত অবস্থা। ইহাই কি চরম শান্তি? জীবনের সকল কোলাহল মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়াছে। এখানে ভাবুকতা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, নাই নাই, নেতি নেতি। আমি জীবনে কখনও এমন প্রশান্তি পাই নি। পরম শান্তির আবেশে আমি নিদ্রিত হইলাম, আমার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হইল।"*

সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থাকালে এবং তৎপরে বহুবার স্বামিজী ক্রীষ্টিনার সহিত ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ভারতের নারীদিগের সম্বন্ধে স্বামীজীর আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিবার উপায়াদি শুনিয়া ক্রীষ্টিনা ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে মনঃস্থ করেন। স্বামিজী ক্রীষ্টিনার চিত্তের নির্মলতা, সংসারে অনাসক্তি, আধ্যাত্মিকভাব ও কর্মকুশলতা সম্বন্ধে কী উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত পত্র হইতে বুঝা যায়। পত্রখানি * বেলুড়মঠ হইতে ১৯০১ খ্রীঃ ৬ই জুলাই তারিখে ক্রীষ্টিনাকে লিখিত। "কাজের ভাবগুলি আমার কাছে মূর্চ্ছার মত আসে। আজ আমি পত্রলেখার ভাবে আছি। তাই প্রথমেই তোমাকে একখানি ছোট পত্র লিখছি। লোকে বলে, আমার স্নায়ুগুলি দুর্বল, বিনা কারণে আমি চিন্তিত হই। কিন্তু আমার মনে হয়, স্নেহের ক্রীষ্টিন, তুমিও এই বিষয়ে আমাপেক্ষা খুব পশ্চাতে নও! আমাদের দেশের এক কবি বলেছেন, 'পর্বত অন্যত্র যেতে পারে, অগ্নিও শীতল হ'তে পারে; কিন্তু মহতের হৃদয় কখনও পরিবর্তিত হয় না। আমি ক্ষুদ্র হতে পারি। আমি নিশ্চিত জানি, তুমি মহৎ, অতি মহৎ এবং তোমার মহৎ হৃদয়ের প্রতি আমার অচল বিশ্বাস আছে। আমি অন্য সব বিষয়ে চিন্তিত হই বটে, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আমি তোমাকে জগন্মাতার চরণে উৎসর্গ করেছি। তিনিই তোমার রক্ষয়িত্রী ও পরিচালিকা। আমি জানি—তোমার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না, কিছুই মুহূর্তের জন্য তোমার জীবনের গতি রোধ করিতে পারে না।"

---

* 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পত্রিকায় মে, ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত।

স্বামীজী ক্রীষ্টিনার নামটী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া ক্রীষ্টিন নাম রাখেন এবং তাঁহাকে তাঁহার ভারতীয় কর্মের জন্য মনোনীত করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিতা করেন। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাগণের মধ্যে ভগ্নী ক্রীষ্টিনের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার চিত্ত ছিল শুভ্র কুসুমের মত বিশুদ্ধ, তাঁহার দেহ সুগঠিত ও সুন্দর, পার্থিব মলিনতা তাঁহার হৃদয়মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রিয়া শিষ্যার অলৌকিক পবিত্রতা ও দেবী চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৯৬ খ্রীঃ স্বামীজী ক্রীষ্টিনকে লিখিয়াছিলেন—

What though thy bed be frozen earth
Thy cloak the chilling blast,
What though no mate to cheer thy path
Thy sky with gloom overcast.
What though if love itself doth fail
Thy fragrance strewn in vain
What though if bad over good prevail
And vice over virtue reign.
Change not thy nature gentle bloom
Thou violet sweet and pure
But ever pour thy sweet perfume
Unasked unstinted sure.

অনুবাদ—"যদি তুষারাবৃত ভূমি তোমার শয্যা এবং তুষারময় শীতল বায়ু তোমার পোষাক হয় তাতে তোমার কি আসে যায়? যদি জীবন-পথে তুমি নিঃসঙ্গিনী হও এবং তোমার জীবনাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন হয় তাতেই বা তোমার কি? যদি প্রেম নিষ্ফল এবং তোমার সৌরভ বৃথা বিচ্ছুরিত হয় তাতেই বা কি? যদি অসৎ সতের উপর এবং অধর্ম ধর্মের উপর আধিপত্য করে তাতে তোমার কি? হে কোমল কুসুম, তোমার প্রকৃতি পরিবর্তিত করিও না। হে বিশুদ্ধ, সুগন্ধি নীল পুষ্প, অযাচিত অবাধিত ও সুনিশ্চিত ভাবে তোমার স্বর্গীয় সৌরভ মলয়বৎ

বিতরণ কর।" উক্ত গুরুবাক্য ছিল ক্রীষ্টিনের জীবনের মূল মন্ত্র। গুরুকৃপায় এই বাক্য তাঁহার জীবনে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কনিষ্ঠা ভগ্নী চতুষ্টয় স্ব স্ব ভার বহনে সমর্থা হইলে ক্রীষ্টিন ১৯০২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় আগমন করেন। তখন অল্প কিছু দিন মাত্র শ্রীগুরুর পূত সঙ্গে থাকিবার সুযোগ ঘটে। কলিকাতায় অত্যধিক গ্রীষ্মহেতু স্বামিজী তাঁহাকে মায়াবতী পাঠাইয়া দেন। ঐ বৎসর ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর মহাপ্রয়াণ হয়। গুরুশোকে মুহ্যমানা হইলেও তিনি ভারতে থাকিয়া গুরুর আদেশ পালনার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। নিবেদিতা ও ক্রীষ্টিন উভয়ে মিলিয়া কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে একটী মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া বিবেকানন্দ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তাঁহার সহকর্মিণী ও গুরুভগ্নী নিবেদিতা ১৯১০ খ্রীঃ লিখিয়াছিলেন, "১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ভারতীয় নারীদিগের জন্য বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত কার্যের ভার ভগ্নী ক্রীষ্টিন গ্রহণ করেন। একমাত্র তাঁহার প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়ের কার্য সাফল্যমণ্ডিত হয়। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় বিদ্যালয় ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। যুগসন্ধিক্ষণে কতকগুলি হিন্দু নারীকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের উপায় শিক্ষা এবং বিদ্যা দানপূর্বক তাহাদিগকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্বুদ্ধ ও উপযুক্ত করাই এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয় উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে অনেক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে।" নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন, "ক্রীষ্টিনের একাগ্রতা, দৃঢ় সংকল্প ও উদ্দেশ্যের একতানতা এবং অসাধারণ আত্মত্যাগের ফলেই এই বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমি পূর্বে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী সহায়ে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতাম। তাহাতে কিছু কিছু ফল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগ্নী ক্রীষ্টিন বিধবা ও বিবাহিতা নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম হইতেই বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি এই কার্যেই অধিকতর আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহাতে ইহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইল। পর্দানসিন ভদ্রমহিলাগণ দুইজন পাশ্চাত্য রমণীর গৃহে আসিয়া কোন শিক্ষা লইবেন কিনা, সেই বিষয়ে

আমরা প্রারম্ভ হইতেই সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের চেষ্টা প্রথম হইতে ফলবতী হইল। অতিশয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণও তাহাদের ভগ্নী, পুত্রবধূ ও আত্মীয়দের সহিত আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। উক্ত সফলতার জন্য প্রধানতঃ ক্রীষ্টিন দায়ী ছিলেন।"

বাগবাজারের ১৭, বোসপাড়া গলিতে ভগ্নীদ্বয় অতি সামান্য ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজের অনেক অতি গোঁড়া নরনারীগণও এই পাশ্চাত্য মহিলাদ্বয়কে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ ছিলেন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে ভারত মাতার অনেক সুযোগ্য সন্তানগণ পদার্পণপূর্বক তাঁহাদের সহিত মিশিতেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, ও তাঁহার পত্নী অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাদের কাছে আসিতেন। শ্রীযুক্তা অবলা বসুর প্রচেষ্টায় তাঁহাদের অর্থকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। মিসেস ওলি বুল আমেরিকা হইতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইতেন। ১৯১১ খ্রীঃ ভগ্নী নিবেদিতার দেহত্যাগের পর ভগ্নী ক্রীষ্টিনের উপর বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার অর্পিত হয়। তখন প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে উহার নাম হইল নিবেদিতা বিদ্যালয়। তিনি অতি দক্ষতার সহিত তিন চার বৎসর বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ পৃথিবীব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হয়। দ্বাদশ বর্ষ ভারতের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর তাঁহাকে ডেট্রয়েটে বাস করিতে হয়। ভারতে যেমন ছিলেন সেখানেও তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতেন এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতেন। মিসেস্ এলিজাবেথ তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং প্রাচীন মন্দিরের কোন পুরোহিতের ন্যায় তাঁহার দেবীতুল্য আকৃতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে অসীম আনন্দ প্রদান করিত। কতকগুলি বক্তৃতায় তিনি আমেরিকার নরনারীগণকে ভারত সম্বন্ধে জানিবার ও এই পুণ্যভূমিকে

ভালবাসিবার জন্ত উৎসাহিত করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্ত সমস্ত অভিভাষণের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল গীতার সেই শ্লোক যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্যক্তরূপে এই বিশাল বিশ্বে পরিব্যপ্ত আছি, আমি একাংশ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট করিয়া অবস্থান করিতেছি।'' তিনি উপাখ্যান ও উপপত্তির সাহায্যে বেদান্তের মূল তত্ত্বটী সবল ভাষায় শ্রোতার অন্তঃকরণে এমনভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতেন যে, উহা শ্রোতার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় তাঁহার সঙ্গে সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার পর লিখিয়াছেন, 'একদিনও তাঁহার মুখ হইতে ভারতের নিন্দা শুনি নাই বা জানিতে পারি নাই যে, তিনি তাঁহার অন্তরে ভারত সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র নিন্দাভাব স্থান দিয়াছেন।' এমনি সুগভীর ও সুবিমল ছিল তাঁহার ভারতপ্রেম।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভগ্নী ক্রৌষ্টিন পুনবায় ভারতে আগমন করেন। পূর্বে যে গৃহে বাস করিতেন তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় বোসপাড়া গলির ৮ সংখ্যক বাড়ীতে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্ত কারণের জন্ত তিনি বিদ্যালয়ের ভার আর লইতে পারিলেন না। আকৃসা বার্লো ভ্রাতার ক্রৌষ্টিনের শেষ জীবনে ভারতে অবস্থানের এই সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।—"যে স্বর-লহরী দ্বারা তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন সেই স্বর এত স্পষ্ট, এত মৃদু, এত মধুর ও এত কম্পনযুক্ত এবং তৎসঙ্গে এত পবিত্র ও এত পূর্ণ যে, প্রথম উচ্চারিত শব্দ দ্বারাই তাঁহার আত্মার পবিত্রতা ও পূর্ণতা প্রকাশিত হইত। তাঁহার সমুন্নত কৃশ দেহ, তাঁহার সুগঠিত মস্তকের উন্নত শীর্ষদেশ দ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষবৎ বা দেবদূতবৎ দেখাইত। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই এই ভাবব্যঞ্জক ছিল। অভিজাত বংশসুলভ পক্ষীচঞ্চুর ন্যায় সুবক্র নাসিকা এবং সূক্ষ্ম ঘ্রাণ-গ্রহণক্ষম কম্পমান নাসিকা বিবরদ্বয়, সমুজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট ও বক্ররাগযুক্ত মুখমণ্ডল যাহা একাধারে মধুর, গম্ভীর ও শক্তিমান্, যাহা পরদুঃখসহনে অক্ষম এবং রাজপুত শিল্পী চিত্রিত সর্বজনপ্রিয় সীতার বদনমণ্ডলের ন্যায় সুগঠিত ও সুশ্রী, তাঁহার উচ্চ গণ্ডদেশ এবং তদুপরি দোদুল্যমান সোনালী কেশগুচ্ছ এবং প্রাচ্যদেশীয় ঋষিতুল্য নয়নযুগল যাহা ইচ্ছামাত্রেই বহির্জগত হইতে অন্তর্জগতে

প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরের আলোক দর্শনে সমর্থ এবং যাহা পদ্মপলাশলোচন নামে কথিত এই সমস্তই উপরোক্ত দিব্য ভাবদ্যোতক ছিল।” স্বর্গাগত দেবীর ন্যায় আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল ক্রীষ্টিনের। এমন দেবীমূর্তি ও দেবী চরিত্র জগতে বিরল।

ভারতের শেষ গ্রীষ্মকালদ্বয় ক্রীষ্টিন আলমোড়ায় অতিবাহিত করেন। ১৯২৭ খ্রীঃ তিনি স্বীয় জীবনস্মৃতি* লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৯২৮ খ্রীঃ ভগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি পুনরায় আমেরিকায় গমন করেন। তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসর স্বদেশে অতিবাহিত হয়। মাঝে মাঝে তিনি ডেট্রয়েটে যেতেন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের জন্য। কয়েক মাস আলিগণের মিনার্ভা হ্রদের তীরে অবস্থিত তাঁহার অতিপ্রিয় গ্যাল কোয়ারটন দম্পতীর মনোরম গৃহে বাস করেন। ১৯২২ খ্রীঃ তিনি কিছুদিন উক্ত গৃহে বাস করিয়া উহাকে ‘আশ্রম’ নামে অভিহিত করেন। অধিকাংশ সময় তাঁহার প্রিয়বন্ধু মিসেস্ এলিম ফুলার লিয়রের গৃহে থাকিতেন। মিসেস এলিম ফুলাব লিয়র তাঁহার অশেষ যত্ন লইতেন এবং তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও চিকিৎসাদির সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ভারতে যাইবার জন্য জাহাজের টিকিট পর্য্যন্ত কিনিয়াছিলেন। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সংঘগুরু স্বামী শিবানন্দজী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ভারতে আসিয়া পুনরায় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য। কিন্তু তিনি আর ভারতে আসিতে পারেন নাই।

১৯২৯-৩০ খ্রীঃ নিউইয়র্কে অবস্থানকালে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিনি নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতেন এবং বক্তৃতাদি দিতেন। অন্তিম জীবনের বৎসরাধিক কাল নানা রোগে ভুগিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও মলিন হইয়াছিল। শেষ রোগে তিনি মাত্র সাত দিন ভুগিয়াছিলেন। মৃত্যুর একদিন

* ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বারটী সংখ্যায় উহার অধিকাংশ প্রকাশিত।

পূর্বে বাক্য বন্ধ হইলেও তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। এই সময়ে কেহ তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলে তিনি নির্নিমেষ নয়নে আনন্দোজ্জ্বল মুখে তাহা শ্রবণ করিতেন। শেষ মুহূর্তে তাঁহার মুখের বিষণ্ণ ভাব অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। স্বর্গীয় শান্তির স্রোত তাঁহার মুক্ত আত্মা হইতে চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া সকলকে শান্তিপূর্ণ করিল। তিনি বিদায়ের শেষ দিব্য হাস্ত দ্বারা পারিপার্শ্বিক জগতের সুখদুঃখ অপনোদন করিতে চেষ্টা করিলেন। গুরুকৃপায় ধর্মজীবনের প্রভাতে তিনি যে দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন জীবনসন্ধ্যায় নিশ্চয়ই তাহা পুনরায় লাভ করিয়া পরম পদে বিলীন হইলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে তিনি নিউইয়র্ক নগরীতে তাঁহার বন্ধু পিয়রের গৃহে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুর চির সান্নিধ্য লাভ করিলেন। স্বর্গের সুষমা স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

ভগ্নী ক্রীষ্টিন তাঁহার গুরু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "মাঝে মাঝে দীর্ঘকালের ব্যবধানে দিব্যধাম হইতে কোন কোন মুক্ত আত্মা শরীর ধারণপূর্বক পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি ইহধামের পর্যটক মাত্র, স্থায়ী বাসিন্দা নহেন। তিনি যে দিব্যধাম হইতে অবতরণ করেন তাহার কিঞ্চিৎ শক্তি, মহিমা ও জ্যোতিঃ এই দুঃখপূর্ণ জগতে লইয়া আসেন। যদিও তিনি মর্ত্যবাসীগণের মধ্যে বিচরণ করেন, তথাপি ইহজগৎকে তিনি বিদেশ বলিয়াই মনে করেন। এই পৃথিবীতে তিনি যেন তীর্থযাত্রী এবং অতিথি, অল্পকাল মাত্র তিনি ইহধামে বাস করেন। তিনি তাঁহার সহযাত্রী ও অনুগামীগণের সহিত সদা সহানুভূতি সম্পন্ন হন এবং তাহাদের সুখ ও দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের কারণ বা স্বভূমির কথা তিনি কদাপি বিস্মৃত হন না। তিনি তাঁহার দেবত্ব সদা স্মরণ করেন। তিনি মহামহিমময় অমর আত্মা—এই স্মৃতি তাঁহার মনে সাদা জাগরূক থাকে। তিনি জানেন, যে দেবলোক হইতে তিনি আগমন করিয়াছেন সেখানে সূর্য বা চন্দ্রের প্রয়োজন নাই; কারণ উহা জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মার আলোকে আলোকিত। তিনি জানেন, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও তাঁহার আত্মার অস্তিত্ব ছিল।

এমন এক দেবমানবকে আমি দেখিয়াছি, তাঁহার বাণী শুনিয়াছি, তাঁহাকে গুরুরূপে পাইয়াছি, তাঁহার চরণে আমার হৃদয়ের সমগ্র ভক্তি নিবেদন করিয়াছি।

এমন মহাপুরুষের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না, কারণ তিনি সকল সাধারণ আদর্শের এবং সকল উদাহরণের অতীত। অপরে উচ্চ উজ্জ্বল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জীবন জ্যোতির্ময়। কারণ তিনি ইচ্ছামাত্র সকল জ্ঞানের আদি উৎসের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন। সাধারণ মানুষের স্থায় তাঁহাকে কোন সদগুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। অপরে মহৎ হইতে পারে এবং তাহাদের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত লোকের তুলনা হয়। অপবে সৎ, শক্তিমান ও প্রতিভাশালী হইতে পারেন এবং অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা তাঁহাদের অধিকতর সদ্‌ভাব, শক্তি ও প্রতিভা থাকিতে পারে। একজন সাধু সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা পবিত্র, শুদ্ধ এবং একাগ্রমনা হইতে পারেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কোন সিদ্ধ পুরুষ বা মহৎ ব্যক্তির সহিত তুলনা হয় না। তিনি একাকীই ছিলেন এক অলৌকিক শ্রেণীর লোক। তাঁহাকে ইহজগতের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তিনি অন্তর্জগতের লোক ছিলেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কোন উর্দ্ধলোক হইতে এই মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেই বুঝা যাইত, তিনি বেশী দিন ইহলোকে থাকিবেন না। ইহা কি তবে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন দেবমানবের আবির্ভাবে প্রকৃতি আনন্দিতা হইবেন, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং দেবদূতগণ আনন্দে সঙ্গীত গাহিবেন? যে দেশে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে দেশ ধন্য। যাঁহারা তাঁহার সময়ে ইহধামবাসী ছিলেন তাঁহারাও ভাগ্যবান। এবং যাঁহারা তাঁহার পদতলে বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা ধন্য, ধন্য, ধন্য।"*

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯৩১, জানুয়ারী সংখ্যায় ইহার মূল ইংরাজি প্রকাশিত।

ছাব্বিশ

* রামমোহন

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। নবযুগের সন্ধিক্ষণে, ভারতের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সাম্রাজ্য যখন ছিন্ন-ভিন্ন, ইসলাম সংস্কৃতি ক্রমশঃ অপম্রিয়মাণ, নব বৈদেশিক শক্তির অভ্যুদয়ে দিগন্ত সন্ত্রস্ত, আমাদের মাতৃভূমি বিশৃঙ্খল ঘটনাবর্ত্তে তখন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। তাই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। রোমঁ্যা রোলাঁ বলেন, এই প্রাচীন মহাদেশে নবযুগের উদ্বোধনকারী রাজা রামমোহন ছিলেন অসাধারণ পুরুষ। ষাট বৎসরেরও কম, (১৭৭৪-১৮৩৩) অল্প পরিসর জীবনের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মবাদ হইতে নবীন ইউরোপের বিজ্ঞান পর্য্যন্ত অধিগত করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন এক সম্ভ্রান্ত ধনবান, গোঁড়া ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কেহ কেহ বাংলার নবাবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার পিতামহ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কোনও নবাব কর্ত্তৃক 'রায়' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। তদবধি কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে 'রায়' ব্যবহৃত হইত। রামমোহনের পিতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব, এবং মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন গোঁড়া শাক্ত। তাঁহার পিতা পুত্রকে অতি যত্নের সহিত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন। মাতা তারিণী দেবীর সুনির্ম্মল পবিত্র চরিত্র রামমোহনও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। স্বগৃহে রামমোহন তৎকালীন রাজভাষা ফারসী শিক্ষা করিতেন। তিনি আরবী ভাষাও অধিগত করেন। উক্ত ভাষায় তিনি ইউক্লিড ও এরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া কোরাণ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন

---

* প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৫

করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে ফারসী ভাষায় এক পুস্তক লিখিয়া তিনি উহাতে হিন্দু পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন এবং হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার সমালোচনা করেন। ইহার ফলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করেন।

তৎকালীন প্রথা অনুসারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী লোকান্তরিতা হইলে তিনি পর পর দুই বার দারপরিগ্রহ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রচুর ধনসম্পদ সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন স্থলে কালেক্টর জন ডিগবীর অধীনে কাজ করেন। অতঃপর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় তিনি সতীদাহ-প্রথার বিলোপসাধন করিতে সমর্থ হন।

দিল্লীর সম্রাট রামমোহনকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাবে সম্রাট রাজা রামমোহনকে রাজদূতরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। হাউস অফ্ কমন্সের যে চার্টারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়-সঙ্ঘ হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় সেই চার্টার প্রণয়ন কালের বিতর্কে যোগদানের জন্যই তিনি তথায় গমন করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রাজা চতুর্থ জর্জের রাজ্যাভিষেক দিবসে রামমোহনকে বৈদেশিক রাজদূতের আসন দান করিয়া সম্মানিত করা হয়। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সভাসদ্গণের নিকটেও তাঁহার পরিচয় প্রদান করা হয় এবং রাজ-পুরুষগণ কর্ত্তৃক অতীব সম্মানের সহিত তিনি গৃহীত হন। তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক সসম্মানে অভ্যর্থিত হন।

ইংলণ্ডযাত্রার পথে রামমোহন দুই-এক ঘণ্টার জন্য উত্তমাশা অন্তরীপে অবতরণ করেন। জাহাজে ফিরিবার কালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। জাহাজের সিঁড়িটি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ছিল না। সেইজন্য উঠিবার সময় তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যান এবং আঠার মাস তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। জীবনে আর কখনও

তিনি সম্পূর্ণভাবে সারিয়া উঠিতে পারেন নাই—একটু খোঁড়া হইয়া যান। বেন্থাম প্রভৃতি ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। কলিকাতায় ইতঃপূর্ব্বেই উইলসন, কোলব্রুক এবং আরো অন্যান্য ইউরোপীয় মনীষীগণ তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহনের ইংরেজী জীবনীকার মিস্ এস. ডি. কোলেটের মতে রামমোহন প্রাচীন ইংলণ্ডের হৃদয় হইতে নবীন ইংলণ্ডের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করেন। নবীন ইংলণ্ড তাঁহাব মধ্য দিয়া নব্য ভারতের সহিত পরিচিতি লাভ করে।

রাজা রামমোহনের ইংলণ্ড-গমনের ফল হইয়াছিল সুদূর-প্রসারী। ম্যাক্স-মূলারের কথায়, "বিদগ্ধ এবং তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বিশ্বের মিলনবৃত্তটি সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যে আগমন করেন। অতঃপর এই বৃত্ত হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় প্রাচ্য ভাবধারা প্রতীচ্যে এবং প্রতীচ্যের ভাবধারা প্রাচ্যে গমনাগমন করিতে লাগিল। আমাদিগকে ইহা পুনরায় সেই সনাতন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিল। তথাকথিত প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতির স্থলে ইহা আমাদিগকে সহজ এবং পবিত্র ভাবধারায় নূতন আশার আলোকে উদ্বুদ্ধ করিল। অতীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ যে-কোন প্রাচীন কাহিনী হইতে ইহা আমাদিগকে অত্যধিক পরিমাণে সত্যলাভের দুঃসাহসিক পথের দিকে চালিত করিল।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আজিকার ভারতবর্ষে যে এতটুকু জীবন, এতটুকু প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়, এই স্পন্দন সেই দিন সঞ্চারিত হইয়াছিল, যেদিন রাজা রামমোহন অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ভারতের এই একাকিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমুদ্রপারে যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি নানাভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে তিনি এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন।" রাজা রামমোহন ফ্রান্স পরিদর্শন করিয়াছিলেন। আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু সহসা মস্তিষ্ক-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন। ইংলণ্ডগামী ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিষ্টল তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। ব্রিষ্টলের আর্ণসভেল সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার একটি

স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত সমাধিক্ষেত্র ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভ হাউসে।

স্মৃতিফলকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহনের জীবনী ও কার্য্যাবলী অতি সুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে—"ইহার নীচে আজীবন ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী এবং বিবেকবান এক ব্যক্তির দেহাবশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে। আন্তরিক ভক্তির সহিত তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সহজাত বিপুল মেধাশক্তির বলে তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম ছিলেন। সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং ইহলৌকিক দিক দিয়া ভারতের উন্নতিকল্পে সতীদাহপ্রথা এবং পৌত্তলিকতা নিবারণ করিবার জন্য, ভগবানের মহিমা প্রচার এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁহার অবিরত চেষ্টার কথা তাঁহার দেশবাসী সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছে।"

দীনবন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রুজ তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে * যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন তাঁহার সমসাময়িকদিগের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুনর্মিলনের তিনি ছিলেন প্রথম উদ্গাতা। রামমোহন বাংলা গদ্যের জনকস্বরূপ। ভারতবর্ষে তিনিই দেশীয় সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদপত্রকে তিনি স্বাধীনতার সংরক্ষকরূপে বিশ্বাস করিতেন। তাই যখন সরকারী লাইসেন্স ব্যতীত সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া আইন জারী হইল, তখন রামমোহন সুপ্রীম কোর্টে এই আইনের প্রত্যাহার দাবী করিয়া একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অন্যতম আদি প্রণেতা। ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতও তিনি গভীর ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। প্রধানতঃ রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াই মেরী কার্পেন্টার ভারতে আগমন করতঃ ভারতীয় নারীগণের কল্যাণার্থে আপনার কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করেন।

**Rise and Growth of the Congress* by C. F. Andrews.

রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। তাঁহার বন্ধু ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী উইলিয়ম এডাম তাঁহার এই স্বাধীনতা-স্পৃহা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নচেৎ কিছুই হইবেন না। শুধু কর্মের স্বাধীনতা নহে, চিন্তার স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ছিল তাঁহার অন্তরের এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য এই আন্তরিক কামনা, আপনার মানসিক স্বাধীনতায় অপরের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই অসহনীয় মনোভাবের ফলেই অপরের স্বাধীনতা রক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি, যাঁহাদের সহিত তাঁহার প্রবল মতভেদ ছিল, তাঁহাদের প্রতিও তাঁহার এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাচারী নৃপতির নিকট হইতে নেপল্‌সের অধিবাসিগণ যখন অভীপ্সিত শাসনতন্ত্র আদায় করিতে ব্যর্থমনোরথ হইল, আয়ার্লণ্ডের জনসাধারণ যখন ব্রিটিশ সরকারের অবিচারে অত্যাচারে পর্যুদস্ত তখন রামমোহনের সহানুভূতি সর্ব্বদা তাহাদের জন্য উৎসারিত হইত। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যে তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তিনি উহা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করিতে বা আলোচনা করিতে পারিতেন না। স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সংবাদ শ্রবণে তিনি উল্লাসিত হৃদয়ে কলিকাতার টাউনহলে এক ভোজ-সভা আহ্বান করেন। রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, অপরাপর সভ্য জাতির ন্যায় ভারতবাসীরও উন্নতির সুনিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। জাতি হিসাবে এশিয়াবাসীরা যে হীনতর এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এশিয়াবাসীদের নারীসুলভ ভাবধারার ফলে মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে, কোনও খ্রীষ্টান এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। তাহার সহিত তর্কপ্রসঙ্গে রামমোহন স্মরণ করাইয়া দেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের সকল প্রাচীন সাধু ও মহাপুরুষগণ, এমন কি, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট পর্য্যন্ত এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগের প্রধান প্রধান প্রগতিশীল আন্দোলনের মূলে ছিলেন রাজা রামমোহন। তৎকালীন বহু সমস্যা তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার জীবনের প্রধানতম কৃত্য ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার জীবনের অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ উহার পূর্ণতাসাধন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য ছিল গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও

অনুকরণ-প্রবৃত্তি হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া উদার জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

ধর্ম্মের দিক দিয়া রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবাদী হিন্দু। তথাপি সকল ধর্ম্মের সত্যকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মত ছিল উদার, সার্ব্বজনীন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতির ধর্ম্মবিশ্বাস সেই সার্ব্বজনীন বিশ্বাসেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। কাউন্ট গবলেট ডি আলভিয়েলা তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে * বলিয়াছেন, "রামমোহন হিন্দুদের মধ্যে বৈদান্তিক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্টবিশ্বাসী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে আল্লাবিশ্বাসী হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এই উদারতা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মতই গভীর ও সত্য ছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা ব্রাহ্ম সমাজের দান।" অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ বলেন, "তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজা রামমোহনই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু সকল সিদ্ধির ঊর্দ্ধে ছিল রাজার অসাধারণ ধর্ম্মাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁহার জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম।" রোঁমা রোঁলা বলেন, "প্রাত্যহিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিয়াই রাজা অধ্যাত্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। দৈহিক এবং মানসিক গঠনে তিনি রাজকীয় ভাবে মণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন ছিলেন একাধারে আদর্শবাদী ও কর্ম্মবীর, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী, তেজস্বী অশ্বের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন।"

ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া তাঁহার ইংরেজী পুস্তকে † লিখিয়াছেন, "ভারতের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় জাগরণ রাজা রামমোহনের প্রভাবেই হইয়াছিল।" টম্‌সন্ এবং গ্যারেট তাঁহাদের ইংরেজী গ্রন্থে ‡ রাজা রামমোহনকে দুইটি বিদেশী জাতির (ভারতবাসী ও ব্রিটিশের) মিলন সংস্থাপকরূপে বর্ণনা করিয়াছিয়লন। এই

---

* *Contemporary Evolution in Religious Thought* by Court Goblett D'Alviella.

† *History of Indian National Congress* by Dr. Pattavi Sitaramyya.

‡ Rise and Fulfilment of British Rule in India by Thompson and Garret.

মিলনের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন সজ্ঘটিত হইয়াছিল। রামমোহনের জীবনচরিত লেখক কোলেট তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলেন, "ইতিহাসে রামমোহন যেন একটি জীবন্ত সেতু। এই সেতুর উপর দিয়া ভারতবর্ষ তাঁহার অপরিমেয় অতীত হইতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীন জাতিবিচার ও বর্ত্তমান মানবতাবাদ, কুসংস্কার এবং বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাচারিতা ও গণতন্ত্র, অচল বিধিপ্রথা এবং প্রগতি, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস ও অস্পষ্ট অথচ পবিত্র সত্য ধর্ম্মানুরাগ ইহাদের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী দুস্তর ব্যবধানের উপরে রামমোহন ছিলেন খিলানস্বরূপ। স্বজাতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যস্থস্বরূপ। বহুপ্রাচীন সংস্কার ও নবযুগের আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে তিনি একাকী দুঃসহ সাধনার দ্বারা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন।" "বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মিলনের ফলে যে নবজাগরণ আসিয়াছিল তিনি ছিলেন তাহার প্রতীকস্বরূপ। এই নবজাগরণের অনুসন্ধিৎসা প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি সমালোচনামূলক অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি এবং বিপ্লবের প্রতি বিক্ষোভিত, এমন কি, ভীরুতাপ্রণোদিত অনিচ্ছার তিনি ছিলেন প্রতিমূর্ত্তি।" কিন্তু রামমোহনের জীবনে আমরা ভারতে যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তৎপ্রবর্ত্তিত সমগ্র আন্দোলনটির মূল শক্তি ধর্ম্ম। বহুস্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু চিন্তাধারার পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন ভাবধারার সিঞ্চনে এক নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহার জীবন সেই প্রাচীন সংস্কৃতি অবলম্বন করিয়াই পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। "রাজা শুধু একজন পাশ্চাত্ত্যমনা ভারতবাসী অথবা ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত কৃত্রিম হিন্দু ছিলেন না। আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তিনি ছিলেন একজন ইউরেশিয়ান। আমরা যদি তাঁহার জীবনধারার ক্রমবিবর্ত্তন লক্ষ্য করি, তবে দেখিতে পাইব যে, প্রাচ্য চিন্তাধারা হইতে তাঁহার মানস পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়া এমন এক স্থলে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অপেক্ষাও বৃহত্তর ও মহত্তর ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে। আপনার অন্তরধর্ম্মের সহায়তায় সর্ব্বত্র তিনি ঐক্য রক্ষা করিয়াছেন এবং ঐক্যই তাঁহার প্রগতিবাদী

আন্দোলনের মূল শক্তি যোগাইয়াছে। ধর্ম্মই তাঁহাকে সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল, সেই সঙ্গে সংযতও করিয়াছিল এবং তাঁহার আন্দোলনের প্রেরণা ও প্রসার সাধন করিয়াছিল। রামমোহনের জীবন নব্যভারতের নিকট উৎসাহ ও শিক্ষার উৎসস্থল এবং আদর্শ-স্বরূপ।"

"ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তাহার ভবিষ্যৎ রামমোহনের জীবন ও কার্য্যাবলী দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইবে। শুধু ভারতের ভবিষ্যৎই নহে, আমরা আজ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব মিলনতীর্থে দণ্ডায়মান। ইউরোপ এবং এশিয়ার উন্নতিশীল মানবসমাজ পূর্ব্বে প্রায়ই বিবদমান ছিল। উভয়েই আজ ধীরে ধীরে সংযত হইয়া মানবকল্যাণের সাগরে মিলিত হইবার জন্য একসঙ্গে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচ্যের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্যাবলীর সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব এই অনন্ত সমস্যাগুলির সম্মুখে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। ভবিষ্যদ্বক্তা না হইলেও তিনি ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া গিয়াছেন।"

সমাপ্ত